সঞ্চিতা

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীকে লিখিত।

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর, পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তাঁর পুত্র অরুণচন্দ্র সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১১। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত।

চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ও রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রাবলী

চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবী, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণলাল ঘোষকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী। রাণু দেবীকে লিখিত

সাহিত্যিকবর্গসহ রবীন্দ্রনাথ

চতুর্দশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

চিঠিপত্র ।। চতুর্দশ খণ্ড

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের
পত্রাবলী ও আনুষঙ্গিক পত্র/প্রবন্ধ/কবিতা

প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ ১৪০৭

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় -কর্তৃক
সংকলিত ও সম্পাদিত

ISBN-81-7522-255-7 (V.14)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক কল্যাণ মৈত্র
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক সার্ভিস প্রিন্টার্স
৫৫/৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড। কলকাতা ৫০

মুদ্রক প্রিন্ট ও গ্রাফ
৯সি ভবানী দত্ত লেন। কলকাতা ৭৩

সূচীপত্র

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত ১

প্রাসঙ্গিক পত্র ও রচনা ১৪৯

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত ১৫১

প্রাসঙ্গিক পত্র ও রচনা ১৫৯

পরিশিষ্ট ১

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -লিখিত পত্র
ও প্রাসঙ্গিক রচনা ১৬৭

পরিশিষ্ট ২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত -লিখিত পত্র
ও প্রাসঙ্গিক রচনা ২৩৫

পরিশিষ্ট ৩

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের পক্ষে সংস্থার ম্যানেজার
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
গ্রন্থপ্রকাশের চুক্তিপত্র ১৯০৯ ২৭৫

...চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
গ্রন্থপ্রকাশের চুক্তিপত্র ১৯১৪ ২৭৮

চিন্তামণি ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৮৮

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বিশ্বভারতীকে গ্রন্থস্বত্ব দান
প্রসঙ্গে অ্যাটর্নি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র ২৮৯

চিন্তামণি ঘোষের পক্ষে হরিকিশোর ঘোষের পত্র ২৯১

চিন্তামণি ঘোষকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি পত্র :

২০ অক্টোবর ১৯২২ ২৯২

২৪ নভেম্বর ১৯২২ ২৯৪

৫ ডিসেম্বর ১৯২২ ২৯৫

পরিশিষ্ট ৪
চিন্তামণি ঘোষ ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
মধ্যে চুক্তিপত্র : ১ জানুয়ারি ১৯১০ ২৯৬

পত্র পরিচয় ৩০৫

চিত্রসূচী

	সম্মুখীন পৃষ্ঠা
সাহিত্যিকবর্গ সহ রবীন্দ্রনাথ	প্রবেশক
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্রের প্রতিলিপিচিত্র	২৪

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

১

১৪ জানুয়ারি ১৯০৪

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আপনার গল্প পড়িয়া যে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা স্থির করিয়া দিতে চেষ্টা করিব। ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত আমি শিলাইদহে থাকিব তাহার পরে কলিকাতায় যাইব। সেই সময়ে মুখে আপনাকে সবিস্তারে আলোচনা করিয়া জানাইবার সুবিধা হইবে। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। ইতি ৩০শে পৌষ ১৩১০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

* ১৮ জানুয়ারি ১৯০৪

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
[১৩১০]

সবিনয় নমস্কার

১১ই মাঘ প্রাতে ১০টার সময় জোড়াসাঁকোর বাটিতে

অথবা তাহার পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজে আসিলে আমার সঙ্গে দেখা হইবে। ইতি সোমবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

* ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. R.
[মাঘ ১৩১০]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

বিদ্যালয়ের একটি অধ্যাপক সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি সম্প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে আছি। কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেই আপনার লেখায় হাত দিব।

আপনি বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে যে দশটাকা দান করিয়াছেন সে জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন।

শিলাইদহে কিছুদিনের জন্য বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইতেছে তাহা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। ইতি সোমবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪
৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪

ওঁ

সবিনয় নমস্কার

চিঠিতে একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। আমার অনুরোধের জোর যতটা আপনি ও অন্যেরা মনে করেন ততটা নহে— এটুকু আমি ইঙ্গিতে জানাইলাম। ইতি ২০শে মাঘ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৪

ওঁ

গিরিডি

সবিনয় নমস্কার

বীণায় ওয়াড় পরাইয়া দেয়ালে লট্‌কাইয়া রাখিয়াছি এখন গানের প্রস্তাব করিবেন না— দোহাই আপনার। একটি সরস্বতীর বন্দনা গান আমার গীতসংগ্রহে দেখিতে পাইবেন—

“মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়কমলবনমাঝে।”

সেটাতেই যদি কাজ চালাইতে পারেন তবে উত্তম হয়। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

॥ ৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৯

ওঁ

প্রিয়বরেষু

উপনিষৎসংগ্রহ সম্বন্ধে তোমরা যেরূপ সর্ত্ত করিতে ইচ্ছা কর তাহাতেই রাজি আছি। আমার ইচ্ছা এই যে শান্তি-নিকেতন গ্রন্থাবলীতে ধর্ম্মপিপাসু লোকদের জন্য একত্রে নানা ব্যঞ্জনের ভোজের সৃষ্টি করিব। উপনিষৎ অংশ না থাকিলে অসম্পূর্ণ হইবে। ইহার স্বত্ব বোলপুর বিদ্যালয়ের। কিঞ্চিৎ যৎসামান্য কিছু দিলেও আপত্তি করিব না। এক কাজ করিতে পার। আগে তোমাদের খরচ তুলিয়া তাহার পরে লাভের অংশ দিয়ো। আমার বিশ্বাস, যাহারা আমার শান্তিনিকেতন কিনিতেছে তাহারা এ বইও পড়িবে।

গানের ভূমিকার ত কোনো প্রয়োজন দেখি না— কারণ ইহা পুরাতন সামগ্রী। এইটুকু মাত্র লিখিয়া দিতে পারেন ইহাতে অনেকগুলি নূতন গান দেওয়া হইয়াছে।

“সখি প্রতিদিন হায়” গানটির জন্য এত খোঁজাখুঁজি করিতেছে কেন? এ গান ত আমার কাব্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছেই। সে বই কাছে না যদি থাকে তবে যোগীন সরকারের গানের মধ্যে নিশ্চয় পাইবে।

আগামীকাল কলিকাতায় যাইব। রথী পরশু আসিবে।

কবীর শীঘ্র ক্ষিতিমোহনবাবুকে পাঠাইবে। ইতি
বৃহস্পতিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ সেপ্টেম্বর ১৯০৯

ওঁ

প্রিয়বরেষু

"ঋদ্ধি" জিনিষটাতে প্রশংসা করবার বিষয় যদি বিশেষ কিছু থাক্‌ত তাহলে সানন্দে লিখে পাঠাতুম। নিতান্তই platitude।

অজিত বোলপুরে। সেখানেই প্রুফ পাঠালুম।

তোমাদের বইগুলি এখনো ছাপাখানার জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হচ্চে না দেখে সকলেই বিস্মিত। কিন্তু প্রকাশক নামক প্রাণীর চালচলন আমি জানি বলেই আমি বিস্ময় বোধ করচি নে। আজ সত্যেন্দ্র এসেছিলেন—তিনি চয়নিকার জন্যে উৎসুক। শৈলেশ বলছিল তোমাদের বিজ্ঞাপন পড়ে অনেকে বই কিন্‌তে এসে ফিরে যাচ্চে—সেটা ক্ষতিজনক। শুনচি তোমরা মণিলালের কাছে, বিতরণের জন্য, কতকগুলি বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছ—কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞাপন বিলি করা আমি শ্রেয় বোধ করি নে।

আমার নূতন গানগুলি অজিত তোমাদের কাছে কি

পর্য্যন্ত পাঠিয়েছে জানি নে সুতরাং কোন্‌গুলো আমাকে কপি করে পাঠাতে হবে বুঝতে পারচি নে।

রথী এসেছে। তাকে নিয়ে ব্যস্ত আছি। ইতি ২৬শে ভাদ্র ১৩১৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৯

ওঁ

প্রিয়বরেষু

চয়নিকা পেয়েছি। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। কবিতা ভাল কিনা তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে প্রকাশ পাব তখন জানাব।

কিন্তু ছবি ভাল হয় নি সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এই ছবিগুলোর জন্যই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম কারণ এগুলি আমার রচনা নয়।

নন্দলালের পটে যেরকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না বরঞ্চ একটু খারাপই লাগল।

নিজের প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে নিজের কোনো মত প্রকাশ করা শিষ্টাচার নয়। কিন্তু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যে কেউ দেখ্‌চেন সকলেই অত্যন্ত রাগ করচেন। মূল ফোটো খুব ভাল হয় নি কিন্তু তার ছাপা মূলকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। সকলেই একবাক্যে বলচে এখনো যদি বাঁধা না হয়ে থাকে এই

ছবি বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্তত আমাকে যে আরো ৯খানা বই দেবে তাতে আমার ছবি দিয়ো না। কারণ যাঁদের বই দেব তাঁরা সকলেই আমাকে স্বচক্ষে দেখেছেন— ছবি দেখে শেষে আমাকে ভুলে যাবেন।

দেদার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্চি। প্রাণ বেরিয়ে গেল। এখনি এক বক্তৃতা অভিযানে চলেছি। অতএব ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

১২ অক্টোবর ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

প্রিয়বরেষু

আবার সেই পদ্মাতটে আশ্রয় নিয়েছি। এখন এর শারদ মুখশ্রী প্রসন্ন সুন্দর।

ভক্তবাণী ২য় খণ্ড পেয়েছি। তোমাদের ছাপার খরচ উঠে গেলে যে রকম ভাবে দিতে চেয়েছ সেই কথাই রইল।

উপনিষৎ সংগ্রহের মূল্যও সেই নিয়মেই দিয়ো তবে কিনা বিদ্যালয়কে না দিয়ে শাস্ত্রীমহাশয়কেই দিয়ো।

চয়নিকার ছবি নিয়ে আবার হাঙ্গামা কেন করচ? ওটা পরিত্যাগ করলেই আনন্দের বিষয় হত। আমার প্রত্যেক বইয়েতেই ছবি দেখে দেখে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছি—

এমনি হয়েছে যে আয়নাতে নিজের মুখ দেখা বন্ধ করতে ইচ্ছা হয়।

একটা শস্তা দামের চয়নিকা ছাপিয়ে যদি কেবল ১০০ খণ্ড বেশি দামের বই স্বতন্ত্র রাখ্‌তে তাহলে পাঠকদেরও উপকার হত, ব্যবসায়ীরও লাভ হত। অনেকেরই ইচ্ছা কেনে কিন্তু সাধ্যে কুলচ্চে না। আমি যদি পাঠক হতুম তবে চার টাকা দিয়ে চয়নিকা কিনতুম না।

অবনদের সঙ্গে প্রয়াগে বোধহয় তোমার মাঝে মাঝে মিলন হচ্চে। কলারসের সঙ্গে কলারসজ্ঞের জমেছে কেমন? ইতি ২৬শে আশ্বিন ১৩১৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

১৯ অক্টোবর ১৯০৯

ওঁ

তোমার রাখী সাদরে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করলুম।

ছবির নূতন প্রুফ আত্মীয়বর্গ পছন্দ করেছেন।

মণিলাল আজ যাচ্চেন—বোধ হয় তোমার সঙ্গে খুব একচোট ঝগড়া করে নেবেন।

আমার বরোদায় নিমন্ত্রণ আছে। যাব কিনা সন্দেহ।

বাংলার উপর দিয়ে মস্ত একটা ঝড় গেছে। এখনো সমস্ত খবর পাই নি। আমাদের চাষাদের ধান যদি কাৎ হয়ে থাকে

তবে আমাদেরও সেই সঙ্গে ভূমিসাৎ হতে হবে।

শিশু বের হয় নি বলে অনেকের নিকট হতে লাঞ্ছনা পাওয়া যাচ্চে। অত আগে থাকতে ঘোষণা করলে কেন? সাধারণের কাছে সত্যরক্ষা না করলে তাদের শ্রদ্ধা হারাবে।

কোথাও পালাতে ইচ্ছা করচে। কিন্তু পথ পাচ্চি নে— পাথেয়েরও অভাব। ঈশ্বর যদি ডানা দিতেন তাহলে রেলোয়ে কম্পানি ছাড়া আর সকলেরই সুবিধা হত। ডানা যদি না দিলেন তাহলে মনটাকে অচল করলে কোনো নালিশের কারণ থাক্‌ত না। ইতি ২রা কার্ত্তিক ১৩১৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

২৩ অক্টোবর ১৯০৯

UTTARAYAN
Santiniketan. Bengal

সঙ্কলনে মন দিতে পারিয়াছ কি? ছুটির সময়ে যদি নির্জ্জন শান্তি প্রয়োজন বলিয়া বোধ কর তবে শান্তিনিকেতনের মতো এমন জায়গা আর পাইবে না—আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করো তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। লুপ মেলের লৌহ উচ্চৈঃশ্রবায় যদি আরোহণ করো তবে তিন ঘণ্টার মধ্যে আমার কথা সপ্রমাণ হইবে। ইতি ৯ই কার্ত্তিক ১৩১৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ নভেম্বর ১৯০৯

ওঁ

সুহৃদ্বরেষু

তোমাকেই চিঠি লিখ্‌ব বলে স্থির ছিল এমন সময় মণিলালকে প্রবাসী সংকলনের জন্য একটা চিঠি লেখা জরুরি হয়ে উঠ্‌ল তাই নিতান্ত অলসপ্রকৃতি বশত সব কথা এক-চিঠিতে লিখে শ্রমলাঘবের কৌশল উদ্ভাবন করেছিলুম। এমনি করেই মানুষ অপরাধের সৃষ্টি করে—এবং যেটিকে লাঘব করবার জন্যে এত ফন্দী করে সেইটেকেই দশগুণ বাড়িয়ে তোলে। তোমাকেই লেখা আমার কর্ত্তব্য ছিল তাতে সন্দেহ-মাত্র নেই—তুমি মনে যে বেদনা পেয়েছ বিধাতা সেইটেকেই আমার সকলের চেয়ে গুরুদণ্ডস্বরূপ বিধান করেচেন—আমি অত্যন্ত অনুতাপ ভোগ করচি তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।

গানের বই সংশোধন করা যদি সম্ভব হয় তাহলে ভালই হয়—এ জন্যে যতগুলি পারি নূতন গান তোমাকে পাঠানো যাবে।

কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি আমার কোনো কথায় উত্তেজিত হয়ে নিজেদের কোনো ক্ষতির কারণ ঘটিয়ো না। তাহলে সেটাও আমাকে দণ্ড দেওয়া হবে। গোরা তোমরা সময়মত এবং সুচারুরূপে ছাপিয়ে দিলেই আমার কোনো ক্ষোভ থাক্‌বে না। আমার মনে এই ছিল যে, ধীরে ধীরে

ছাপালে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল থাকবার আশঙ্কা থাক্‌বে না সেই জন্যেই তাগিদ দিয়েছি। নিজের বই সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বভাবতই অধীর ও অসহিষ্ণু— প্রকাশক হয়ে আজও যদি সেটা সহ্য করবার শক্তি তোমার না হয়ে থাকে তাহলে তোমার কি দশা হবে আমি তাই ভাব্‌চি। চিত্তকে পর্ব্বতের মত কঠিন করতে না পারলে গ্রন্থকার সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গের আঘাতে তুমি টিঁক্‌তে পারবে না। আমার কথায় বিচলিত হোয়ো না— আমি তোমার উপরে রাগ করে একেবারে আগুন হয়ে থাকব আমার এমন রুদ্রতা তুমি কল্পনা কোরো না। এই পবিত্র কাগজখণ্ডে পবিত্র কালী দিয়ে আমি স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিচ্চি তোমার উপরে আমার শিকি পয়সার রাগ নেই। বিশেষত তুমি ভ্রমক্রমে একটা গলদ্‌ করে ফেলেছ সেটাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট দণ্ড তার উপরে এই সুযোগে আমি যদি তোমার প্রতি চক্ষুরক্তবর্ণ করে দাঁড়াই তাহলে ঈশ্বর আমাকেই বা ক্ষমা করবেন কেন? তোমার দুঃখে তুমি আমাকে ব্যথিত বলেই জেনো ক্রুদ্ধ বলে মনে কোরো না।

যদি মণিলালকে ছাপতে দেওয়ায় কোনো সুবিধা থাকে তাহলেই দিয়ো নতুবা যদি বিরক্ত হয়ে দাও তাহলে আমার প্রতি নির্দ্দয়তা করা হবে— কখনো তা কোরো না। দেখ, এই সমস্ত বই ছাপানো প্রভৃতি যে জঞ্জাল নিয়ে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কাটিয়ে দেওয়া গেল তা আর বেশি দিন পর্য্যন্ত চল্‌বেনা —এই জন্যেই যা লিখেছি তা যথাসম্ভব নির্ভুল করে ছাপিয়ে দিয়ে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন ব্যগ্র হয়েছে। যখন

দ্বিতীয় সংস্করণ হবে তখন আমারও দ্বিতীয় সংস্করণের সময় হবে। ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল যদি ছাপিয়ে যাই তাহলে পাছে আমার প্রেতাত্মা সেই ভুলগুলোতে জড়িয়ে পড়ে দিনরাত্রি ইণ্ডিয়ান্ পব্লিশিং হৌসকে ঘিরে ঘিরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফেলে বেড়ায় এই আমার একটা মস্ত ভয় আছে—অতএব ভুল সংশোধন না হলে আমার গয়ায় পিণ্ডদান হবে না! কিন্তু, হায়, হায়, কত-শত পিণ্ডেরই যে প্রয়োজন হবে!

আমার নমস্কার ও আলিঙ্গন গ্রহণ করে আমাকে ক্ষমা কর। ইতি ১৬ই কার্ত্তিক ১৩১৬

তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩
১৭ জুন ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

লেখা ত কিছু নেই। শীঘ্র যে কিছু আশা আছে তাও বল্‌তে পারি নে।

যতীন বাগচি একটি লেখা আমাকে দেখ্‌তে পাঠিয়েছে—এটা খুব interesting। প্রবাসীর জন্যে অত্রসহ পাঠিয়ে দিচ্চি।

গানগুলো সাময়িকে ছাপ্‌তে দিতে আমার প্রবৃত্তি নেই—ওর প্রতি লোভ দিয়ো না।

ছাগলের জন্যে চিন্তামণিবাবুকে কিছু লিখেছ কি? ও আমাদের চাই। এক ট্রাক্ নিতেও আমাদের আপত্তি নেই। তুমি এর একটু ব্যবস্থা করে দিয়ো। ইতি ৩রা আষাঢ় ১৩১৭

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪
২৪ জুন ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

তথাস্তু। কিন্তু নমুনার বইগুলি পাঠিয়ে দিয়ো। আমি সুদ্ধ লেগে একটা তার কিনারা করে তুলতে পারব এই ভরসা আমার আছে।

রামানন্দবাবুকে আমাদের এই আশ্রমে আবদ্ধ করে ফেলবার জন্যে অনেকদিন থেকে সাধনা করচি। এবার যখন তিনি ব্যাধির তাড়নায় কাজ ছেড়েই দিয়েছেন তখন একবার সপরিজনে এই প্রান্তরের শুশ্রূষা গ্রহণ করে দেখুন না— হয়ত সুস্থ হতে পারেন। এলাহাবাদে তাঁর যাবার কথা ছিল। আগে নিকটের পরীক্ষা সমাধা করে দূরে গেলে হয় না? তাঁকে কোনো কাজ করতে হবে না। কেবল তিনি

দর্শক হয়ে বসে থাক্‌বেন। এখানে থাক্‌লে তাঁর পত্রিকা চালনার কোনো অসুবিধা হবে না। তুমিও মাঝে মাঝে এখানে এসে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যেতে পারবে। ইতি ১০ই আষাঢ় ১৩১৭

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫
২৫ জুন ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার চিঠি বোধহয় পাইয়াছ। তোমার কাছ হইতে বইগুলা আসিয়া পৌঁছিলেই তোমার suggestion মত লেখা আরম্ভ করিয়া দিব। চলিত কথার রীতি সম্বন্ধে তুমি যে পরামর্শ দিয়াছ তাহা কাজে লাগানো শক্ত হইবেনা।

কল্যরাত্রে আশ্রমে সন্তোষের ভাই ভোলার মৃত্যু হইয়াছে। সন্তোষ কলিকাতায় গেছেন— দেখা হইয়াছে কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

* ২ জুলাই ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

সঙ্কলন সমালোচন শিরোনামা তুলে দিতে চাও দিয়ো— What is in a name? তবে শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধগুলি পরে পরে একত্রে ছাপিয়ো — চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ো না।

বইগুলি পেয়েছি। যতই ভেবে দেখ্‌চি ততই বুঝ্‌চি অজিতের কর্ম্ম নয়। আমাকেই করতে হবে তার পরে কোনো ইংরিজি ব্যাকরণ-মুদ্রারাক্ষসকে দিয়ে তর্জ্জমা করিয়ে নিতে হবে। বাংলা ভাষাকে ত analyse করে এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নি— অতএব অনেক চিন্তা করতে হবে। এ পথে চিন্তা করা অজিতের অভ্যস্ত নয়। তৈরি করে তুল্‌তে সময় লাগ্‌বে নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে চল্‌বেনা।

ছাগলগুলি কবে আমাদের শান্তিনিকেতনের তৃণরাজি কবলিত করতে আস্‌বে?

যুষ্মদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

জুলাই ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

Myron Phelpsকে যে ইংরাজি চিঠিখানা বৎসরখানেক

হল লিখেছিলুম তার একটা type written copy পেয়েছি। এটা রামানন্দবাবুকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কোরো Modern Reviewতে এর স্থান হতে পারে। এর ভাষা, বানান, punctuation সমস্তই তাঁকে দেখে দিতে হবে। Copyistও কিছু কিছু ভুল করেছিল—যতটা পারলুম সংশোধন করে দিলুম। ইংরাজি ভাষার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করে এবং দুই একজন আত্মীয় বন্ধুর সাহায্য নিয়ে এটা আমাকে লিখ্‌তে হয়েছিল—মনের ভাব একরকম ব্যক্ত করেছি—যদি ছাপা সম্ভব হয় ত ছাপতে দিয়ো নইলে আমি যেন অবিলম্বে ফিরৎ পাই। যদি কোনো অংশ পরিত্যাগ বা বিশেষভাবে পরিবর্ত্তন করলে ভাল হয় তাহলে রামানন্দবাবু নির্ম্মমভাবে তা করবেন—আমি তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি—কিন্তু ছাপার পূর্ব্বে সংশোধনটা আমি দেখ্‌তে পাই যেন।

প্রবাসীর জন্যে এই সঙ্গে একটি কবিতা পাঠাই। অনেকদিন পরে গান লিখ্‌তে গিয়ে সামলাতে না পেরে কবিতা লিখে ফেলেছি সে জন্যে সকল পাঠকের ক্ষমা প্রার্থনা করি—এ রকম অপরাধ এখন আর বেশি হবেনা।—এই মাসেই যেন কবিতা বাহির হয়।

রামানন্দবাবুর মত আমাকে শীঘ্র জানাবে।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

২৮ জুলাই ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তোমার গল্পটি ভালই হয়েছে। সামান্য কিছু কাটাকুটি করেছি। শেষ অংশটি বাদ দেওয়াই কর্ত্তব্য—পাঠকদের ধর্ম্মনীতির প্রতি লক্ষ্য করে নয়, সাহিত্যকলার খাতিরে। লঙ্কাকাণ্ডে সীতা উদ্ধারের পর আবার উত্তরকাণ্ডে দুর্ম্মুখের দুর্য্যোগে তাকে বনবাস দেওয়া যেমন বাড়াবাড়ি তোমার উপসংহার অংশটিও তদ্রূপ—এরকম উপসংহার অপঘাত মৃত্যু। এইটুকু বাদ দিলে তোমার গল্পটি বিশেষ উপাদেয় হবে সন্দেহ নেই। ইতি ১২ই শ্রাবণ ১৩১৭

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখাটি অদ্যকার ডাকেই ফেরৎ পাঠাচ্চি।

১৯

* ৯ অগস্ট ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কাল সকালের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি। দেখা কোরো। ইতি মঙ্গলবার

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

নিম্নলিখিত গানটি এইবারকার প্রবাসীর প্রান্তে স্থান পাবে কি? গীতাঞ্জলিতে এ গান অত্যন্ত অশুদ্ধ আকারে বেরিয়েছে —গীতাঞ্জলি এখনো প্রকাশ হয় নি—অর্থাৎ আশ্বিনের পূর্ব্বে মণিলাল তাকে বাজারে দেবে না। বিশুদ্ধ পাঠটিকে কোথাও রক্ষা করবার জন্যেই আমার এই ব্যাকুলতা।

জীবনে যত পূজা
হল না সারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।
জীবনে আজো যাহা
রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও
হয় নি মিছে।

আমার অনাগত
আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে
বাজিছে তারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা॥

নাম কি দিতে হবে জানি নে। কবিতার নাম দেওয়া শক্ত। বস্তুত নাম না দেওয়াই উচিত— কারণ নামে কবিতার পরিচয় নয়।

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১
৬ সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আজ রেজেষ্ট্রি ডাকে তোমাকে দুটো সংকলন পাঠানো গেল। যদি পছন্দ না হয় ফেলে রেখে দিয়ো না— আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ো। মনে কোরো না আমি রাগ করে বলছি— আমিও এককালে সম্পাদকি করেছি— সম্পাদকের কর্ত্তব্য পালন করতে দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিতে হয়। তোমার বিচার ও অভিরুচি অনুসারে নিঃসঙ্কোচে তোমার কাজ করে যেয়ো —কিছুতেই আমি লেশমাত্র ক্ষুব্ধ হব না। বিষয়টা হয়ত

উপাদেয় নয়— তার উপরে লম্বা— লেখিকারাও কাঁচা অতএব যদি এই রচনাগুলি বর্জ্জন কর তবে আমরা গর্জ্জন করব না— আবার অন্য লেখাও পাঠাব।

এখানে কবে আসৃচ? ২১শে ভাদ্র

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ মণিলালকে বোলো ত আমার নামে একটা চোখের বালি ও নৌকাডুবি যেন V. P. ডাকে সত্বর পাঠিয়ে দেয়।

২২

১২ সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আজ রেজেষ্ট্রি ডাকে দুটি সঙ্কলন পাঠাচ্ছি এবং ঐ সঙ্গে আমার একটি "মৌলিক" যাচ্চেন। সঙ্কলনদুটির একটি হেমলতা বৌমা ও অন্যটি আমার কন্যার ভাগে পড়েছিল— কিন্তু শোধন করতে করতে তাদের নিজস্ব এতই যৎসামান্য বাকি রয়ে গেল যে এই দুটি সঙ্কলনে তাদের নাম দেওয়া নিতান্ত অন্যায় হবে মনে করে এ দুটিকে বিনা নামেই চালাতে ইচ্ছা করি। মীরার যে দুটি সংকলন পূর্ব্বে পাঠিয়েছি তাতে প্রায় কিছুই বদলাতে হয় নি এই জন্যে নিঃসঙ্কোচে তার নাম ব্যবহার করা গেছে— হেমলতা বৌমার লেখায় কতকটা অধিক পরিমাণে কাটাকুটি করতে ও মাঝে মাঝে নূতন কথা যোজনা

করতে হয়েছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেগুলিতে তার নামের অধিকার ছিল— কিন্তু এবারে আর চল্‌ল না। এই সঙ্কলন যদি মনোনীত হয় তবে বোধ করি অগ্রহায়ণে যাবে। তার পর-মাসের জন্যও লেখা চল্‌চে। যদি সঙ্কলন দুটি পছন্দ না হয় তবে অবিলম্বে মণিলালের হাতে দিয়ো— কার্ত্তিকের ভারতীতে বের করে দেবে।

আমার নিজের লেখাটার নাম মাতৃশ্রাদ্ধ— বোধহয় পছন্দ না হলেও দেবে কেননা আমার নাম আছে— যদি সম্ভব হয় তবে কার্ত্তিক মাসে যাবে কি?

এখানে দুটো অভিনয়ের আয়োজন সুরু হয়েছে— এক শারদোৎসব দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠের খাতা। দেখ্‌তে আস্‌বে ত? সত্যেন্দ্রকে টেনে আন্‌তে পারবে? ইতি ২৭শে ভাদ্র ১৩১৭

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভাল করতে। প্রবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের গুণগান ঠিক সুশ্রাব্য হবে না।

সে জন্যেও না— আসল কথা অনেকদিন ধরে লিখে আসৃচি। বয়সও কম হয় নি— আর অল্প কাল অপেক্ষা করলেই আমার রচনার সমালোচনার দিন উপস্থিত হবে— আমি যখন রঙ্গমঞ্চ থেকে একেবারে আলো নিবিয়ে সরে যাব তখন সকল প্রকার ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের বাইরে গিয়ে পড়ব— তখন আমাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে আমার লেখাগুলোকে বিচার করতে পারবে। তোমরা আমার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর তবে একদল লোককে আঘাত দেবে— অথচ সে আঘাত দেবার কোনো দরকার নেই কেননা আমার কবিতা তো রয়েইচে— যদি ভাল হয় ত ভালই, যদি ভাল না হয় ত ও আবর্জ্জনা দূর করবার জন্যে ঢোলাই খরচা লাগ্‌বেনা— আপনি নিঃশব্দে সরে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম নিয়ে আর ধুলো ওড়াতে ইচ্ছা করি নে। তোমরা আমার লেখা ভাল বল্‌লে আমার ভাল লাগে না এমন কথা বল্লে মিথ্যা বলা হয়— প্রশংসা শুনলে মনের ভিতরটা বেশ একটু নেচে ওঠে— সেই জন্যেই ঐ নেশাটাকে প্রশ্রয় দিতে কোনোমতে ইচ্ছা হয় না— কারণ ঐ জিনিষটার মধ্যে অনেকটা আছে যা মিথ্যা— অর্থাৎ সত্যকে জানবার ইচ্ছা নয় নিজের প্রশংসাবাদ শোনবার ইচ্ছা— সেই ইচ্ছা এ সম্বন্ধে মিথ্যাকেও কামনা করে, অত্যুক্তিকে ভালবাসে— নিজের নাম নামক জিনিষ এমনি একটা বিশ্রী জিনিষ। যখন আমার নিজের নাম আর আমার নিজের কানে পৌঁছবে না তখন তোমরা সেটাকে বর্জ্জয়িসেই হোক্ আর ইংলিশ অক্ষরেই

বোলপুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার লেখার সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভাল করতে। প্রবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের উল্লেখ ঠিক সুসংগত হবেনা। সে কথাও না — আসল কথা, অনেকদিন ধরে লিখে আসছি, এখনও শেষ হয় নি — আর একটা কাল আসবার সময়েই আমার লেখার সমালোচনার দিন উপস্থিত হবে — আমি যখন জীবিত লোক একেবারে আলো নিবিয়ে সরে যাব তখন সকল প্রকার ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের বাইরে গিয়ে পড়ব তখন আমাকে দেখা-

সম্পূর্ণ তাই দিয়ে আমার লেখাগুলোকে
বিচার করতে পারবে। তোমরা আমার
লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা
কর তবে একদল লোককে আঘাত দেবে —
অথচ সে আঘাত দেবার কোনো দরকার.
নেই কেননা আমার কবিতা ও গল্পের —
যদি ভাল হয় ত ভালই, যদি ভাল না হয়
ত ও আবর্জনা দূর করবার কাজ তোমাদের
করতে হবে না — আপনি নিঃশব্দে সরে
যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম
নিয়ে আর ধুলো ওড়াতে ইচ্ছা করিনে। তোমরা
আমার লেখা ভাল বললে আমার ভাল
লাগে না এমন কথা বল্লে মিথ্যা বলা হয় —
প্রশংসা শুনলে মনের ভিতরটা বেশ
একটু নেচে ওঠে — সেইজন্যই ঐ নেশাটাকে
প্রশ্রয় দিতে কোনোমতে ইচ্ছা হয় না —
কারণ, ঐ জিনিষটার মধ্যে অনেকটা আছে
যা মিথ্যা — অর্থাৎ সত্যকে জানবার ইচ্ছায়
নয় নিজের প্রশংসাবাদ শোনবার ইচ্ছায় —

হোক ছাপিয়ো—এখন ওটাকে ঢাকা দিয়ে আড়াল করে রাখ যথাসম্ভব ওটাকে ভুল্‌তে দাও—ঐটেকে সর্ব্বদা নাড়া দিয়ে চতুর্দ্দিকে বিদ্বেষের বিষ মথিত করে তুলো না।

কাল থেকে জ্বরে পড়েছি। ইতি ২৯শে ভাদ্র ১৩১৭

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আর একবার জ্বরে পড়ে পুনর্ব্বার আবার কাল সেরে উঠেছি, আর পড়বার ইচ্ছা নেই।

আমাদের অভিনয় বোধহয় আশ্বিনের ১৪/১৫ই নাগাদ হবে—তোমরা দলে বলে স্বজন পরিজনে পরিবৃত হয়ে এসো। ইতি ২রা আশ্বিন

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

নভেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আগামী বৎসরেও সঙ্কলনের ভার কি আমাদের উপর

দেবে? বোধহয় তোমাদের প্রয়োজন হবে না। মিথ্যা তোমাদের খরচ বিস্তর হয়। মাসিক কাগজ গত বৎসরে যতগুলো পেয়েছি তার মধ্যে থেকে কেবল Brodar International Review (ঠিক নামটা লিখলুম কিনা জানি নে), Humanitarian Review, Literary Digest এবং ঐ রকমের আর একটা American Weekly (নামটা ভুলে যাচ্ছি) ও Twentieth Century থেকে সঙ্কলন করা গেছে। বাকি সমস্ত পুরাতন কাগজের বোঝা ঘেঁটে বের করতে হয়েছে। Hibbert Journal থেকেও অজিত অনেকগুলো সঙ্কলন করেছে—এবারেও মীরাকে দিয়ে সঙ্কলন করিয়েছিলুম সে তোমার কাছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য কাগজ থেকে একটাও পাওয়া যায় নি।

যদি অজিত ফেরে (তার শরীর অসুস্থ বলে ফেরবার কথা হয়েছে) তাহলে Hibbert Journal প্রভৃতি Philosophical পত্রিকা থেকে লেখা পাওয়া যাবে—অন্য কাউকে দিয়ে ও সব লেখা লেখানো যায় না। তাহলে The Quest নামক একখানি Theological Magazine subscribe করা ভাল হবে। এবং Nation কাগজের বদলে The Public Opinion কাগজটা নিলে হয়ত ব্যবহারে লাগতে পারে—কারণ এই কাগজে নানা লোকের নানা মত ও নূতন বিখ্যাত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর subscription বার্ষিক ১৩ শিলিং।

যাই হোক্ সঙ্কলন সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে একবার

আলোচনা করে তার পরে কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত। Chambers, Strand, Pearson, Windsor, Pall Mall এগুলো এখনি বন্ধ করে দিয়ো। Nationও কাজ নেই। The Questটা যদি আনাও তাহলে গত October মাসের সংখ্যা থেকে আনিয়ো— কারণ তার মধ্যে আলোচ্য জিনিষ আছে। ইতি

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

৩ নভেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমি এখানে একটা লেখাতে হাত দিয়েছি বটে কিন্তু সেটার উপর তোমরা চোখ দিলে চল্‌বে না। জিনিষটি ছোট নাটক— শারদোৎসবের স্বজাতীয়— আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের অনুরোধে পড়ে লিখ্‌তে বসেছি। তাকে টুক্‌রো করে তোমাদের কাগজে দিলে কারো ভাল লাগ্‌বে না। জিনিষটাও একটু অদ্ভুত রকমের হবে— কেউ বল্‌বে ভাল কেউ বা বল্‌বে মন্দ এবং অনেকে হয়ত ভেবেই পাবে না ভাল বল্‌বে কি মন্দ বল্‌বে। মোটের উপর বারো আনা লোক বল্‌বে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবুর সাহিত্যিক শক্তির হ্রাস হচ্চে। আমি সে কথা অস্বীকার করি নে— শক্তির

রূপান্তর ঘটে—সেই রূপান্তর ঘটবার সজীবতা ঈশ্বর যদি শেষ পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে রক্ষা করেন তাহলেই শক্তির সার্থকতা ঘটে। যাই হোক্ হঠাৎ যে জিনিষটাকে ঠিক ধরা যাবে না তাকে মাসিকে দিলে তার আর দুর্গতির সীমা থাক্‌বে না। তুমি ত দেখেইছ শারদোৎসবটাতে পাঠকদের কিরকম পীড়া উৎপাদন করেছে।

গোটাকতক সংকলন জমেছে ফিরে গিয়ে দেওয়া যাবে। ইতি বৃহস্পতিবার

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

১১ নভেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তুমি বোধহয় জাননা বিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থা সম্প্রতি সম্পূর্ণই আমার আয়ত্তের অতীত—কারণ আমার দ্বারা অনর্থই ঘট্‌ছিল। যা হোক্ আমি যথাস্থানে আবেদন জানিয়েছি আশা করি বাধা ঘট্‌বে না।

আমার কলকাতায় যাবার সময় আসন্ন হয়ে এল, কারণ ছুটি শেষের আর দেরি নেই। তখন সঙ্কলন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। অজিতের ফিরে আসাই স্থির হয়েছে—সুতরাং তার দ্বারা হয়ত তোমাদের সঙ্কলনের সাহায্য হতে পারবে।

আমার নাটকটা আজ শেষ করেছি। আর একবার তুলি বুলতে হবে। ২৫শে কার্ত্তিক ১৩১৭

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

১৫ নভেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তোমার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে। অতএব যথাসময়ে ছেলেদের পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো। বিদ্যালয়ের বেতন মাসিক দশ টাকা স্থির হয়েছে।

আমি সম্ভবত সপ্তাহখানেক পরেই কলকাতায় ফিরব। ইতি ২৯শে কার্ত্তিক ১৩১৭

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

২ ফেব্রুয়ারি ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তুমি কাল এসে ফিরে গেছ সেজন্য আমি দুঃখিত আছি। আজ যদি আর একবার চেষ্টা কর তাহলে ফিরতে

হবে না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ১৯শে মাঘ ১৩১৭

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

ফেব্রুয়ারি ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তোমার পাণ্ডুলিপি পেয়েছি— কিন্তু এখনো হাত দিতে পারিনি। ব্যস্ত আছি। গোড়ার পরিচ্ছেদটা একটু আমি ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

নানাবিধ লেখায় ব্যস্ত আছি। তার মধ্যে একটা ব্যাকরণও আছে।

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

১০ মার্চ ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আমার বিবাহের সংকল্প কাগজে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তখন সেই শুভসংবাদে আমার বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। কিন্তু নরেন্দ্র

সেন মশায়ের কাগজে আমি প্রবন্ধ লিখব কিনা এ সংবাদে তোমাদের এত কৌতূহল উদ্রেক হল কেন? এই কাগজের সঙ্গে কোম্পানির কাগজের সম্বন্ধ আছে শুনেছি বটে— কিন্তু ভবসমুদ্রে এই কোম্পানির কাগজের নৌকোটার উপরে আমি ত আজকাল তেমন ভরসা রাখিনে।

নরেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে গত কল্য অনুরোধ পেয়েছি— আমি সম্মতি দান করি নি। না দেবার প্রধান কারণ এই যে, এতদিন ধরে কলমের মুখে অনেক কালী মাখিয়েছি এখন তার কলঙ্ক ক্ষালন করে ভালমানুষটি হয়ে চুপ করে বসে থাকব এই আমার সঙ্কল্প। কিন্তু গবর্মেণ্টের এই কাগজের জয়ঢাকটাকে অবলম্বন করে পলিটিক্‌স্ বাদ দিয়ে অন্যান্য ভাল ভাল প্রয়োজনীয় তথ্য দেশময় প্রচার করবার সুযোগ অবলম্বন করলে দোষ কি? কোন দীনপ্রাণ প্রাইভেট কাগজের দ্বারা ত এ সুবিধা ঘটতে পারে না। বস্তুত আমাদের বাংলা খবরের কাগজগুলো ত লোকশিক্ষার পক্ষে উপযোগী হচ্চে না—হলেও তার গ্রাহক হওয়া শক্ত হয় এমন স্থলে এ রকম কাগজের দ্বারা কাজ পাওয়া যেতে পারে। ইতি ২৬শে ফাল্গুন ১৩১৭

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগামী রবিবারের পর রবিবারে "রাজা" অভিনয়ের নিমন্ত্রণ রইল। ব্যাকরণ লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি।

৩২

* ৪ এপ্রিল ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমাকে Modern Review প্রতিবারেই পাঠাবার গোল হয়। বোধ করি তোমাদের আপিসে একটা কোনো ভুল আছি [আছে]। গত জানুয়ারিতে যখন V. P.তে Modern Review আমার কাছে যায় তখন আমি শিলাইদহে ছিলুম—হয়ত সেখানকার ঠিকানা তোমাদের আপিসে রয়ে গেছে। এটা সংশোধন করে নিয়ে যাতে আমি নিয়মমত কাগজটা পাই সে ব্যবস্থা করে দিয়ো। আজ ৪ঠা তারিখেও যখন পেলুম না তখন অন্য তারিখেও না পেতে পারি এই আশঙ্কায় তোমাকে লিখ্‌তে হল। আমার নাম কি subscriberদের তালিকায় নেই? আমি কিন্তু subscription দিয়ে খালাস হয়েছি।

বর্ষশেষের দিনে তোমরা আস্‌তে পারবে ত? সেদিন মেয়েরা কেউ আস্‌বেন কিনা আজও জানতে পারা গেল না। ইতিমধ্যে জগদীশ দুই দিন এখানে যাপন করে গেছেন। এই জেলার প্রতি যতদিন থেকে রাম সদয় হয়েছেন ততদিন হনুমানের উপদ্রবটা বড় বেড়ে গিয়েছে— মাঝে মাঝে একটা দুটো প্রায়ই যাতায়াত করচে।

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

১৭ এপ্রিল ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

"নববর্ষ" লেখাটা ছাপিয়ে তার প্রুফ তত্ত্ববোধিনীতে পাঠাতে বিলম্ব কোরো না।

সত্যেন্দ্রের নওরোজি তর্জ্জমাটি ভারি আশ্চর্য্য হয়েছে।

তোমার কাছে মীরার একটা সঙ্কলন আছে— Hibbert Journal থেকে— সেটা প্রবাসীর পক্ষে অতিমাত্রায় Theological এবং *From the bottom up* নামক মিসনারি লিখিত বই থেকে আরো দুটো সঙ্কলন দিয়েছিলুম— এগুলি তত্ত্ববোধিনীর উপযুক্ত অতএব যদি মায়া ত্যাগ করে পাঠাতে পার তাহলে আমার কাজে লাগ্‌বে।

অনেকদিন তোমাদের কোনো খবর নেই কেন?

উলুউলু মাদারের ফুল
তোমার গল্প এল কতদূর?

ইতি ৪ঠা চৈত্র [বৈশাখ ১৩১৮]

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

* ১৬ মে ১৯১১

ওঁ

প্রিয়সম্ভাষণমেতৎ—

বাঃ তুমি ত বেশ লোক! একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাও! এতদিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে—এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছে[ছিঁ]ড়ি করতে হবে! সম্পাদক হলে মানুষের দয়ামায়া একেবারে তিরোহিত হয় তুমি তারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে উঠ্‌চ।

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জীবনটা থাক্‌ তার বদলে ব্যাকরণের একটা কিস্তি এবার পাঠাই এবং বড়দাদার লেখাটাও পাঠানো যাচ্চে। বড়দাদার লেখা ও প্রুফ আমাকে পাঠিয়ো।

কই—প্রবাসী ত পাইনি। বোলপুরে পাঠিয়েছ বুঝি? এখানে একখানা পাঠিয়ে দিয়ো।

একটা নূতন নাটক লেখবার চেষ্টায় আছি। দুইএক দিনের মধ্যেই সুরু করব।

বড়দাদার লেখার দুই কিস্তিই এবার একসঙ্গে ছাপিয়ো।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ মে ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

প্রিয়বরেষু

আমার জীবনের প্রতি দাবি করে তুমি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সেটা সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ "আপনার জীবনটা চাই"—এর পিছনে যদি কামান বন্দুক বা অন্তত Halliday সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাক্‌ত তাহলে তোমার যুক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাক্‌ত না—তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধিকারে থাক্‌বে এইটেই সঙ্গত।

আসল কথা হচ্চে এই যে, তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটি করেছ, না, সম্পাদকীয় দুর্জ্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এই দুঃসাহকিতায় প্রবৃত্ত হচ্চ তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারচি নে বলে কিছু স্থির করতে পারচিনে। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন; অতএব এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কি, তা না জেনে তোমাদের মাসিকপত্রের black and white-এ আমার জীবনটার একগালে চুন ও একগালে কালী লেপন করতে পারব না। পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগল্‌ভ হবার অধিকার লাভ করে কিন্তু তবুও শাদাচুল ও শ্বেতশ্মশ্রুতেও

অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র করে তুল্‌তে পারে না।

মাতা সীতাকে জানিয়ো যে, উৎসব হলে তবে তাঁরা বোলপুরে যাবেন এ কথাটা গ্রাহ্যই নয়—তাঁরা গেলেই আমাদের উৎসব হবে এইটেই আসল কথা। আর মাতা শান্তাকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো—তিনি আমাদের আশ্রমে গিয়ে পীড়াভোগ করেছিলেন সেই দুঃখস্মৃতিই যেন আমাদের স্মরণকে আচ্ছন্ন করে না রাখে।

এইমাত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তারকনাথ রায় মহাশয়ের এক তীব্র চিঠি পেলুম। তাতে তোমার প্রতি তিনি সৌহৃদ্য প্রকাশ করেননি। তাঁর "গোরা"র সমালোচনাটা "বঙ্গদর্শনে"ই পাঠিয়ে দিয়ো। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস সেটা বেরয়নি দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

ক্ষিতিমোহনবাবু সপরিজনে এখানে আসবেন কথা ছিল—কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর কোনো সাড়াশব্দ পাইনি। তুমি তাঁর কোনো সংবাদ রাখ কি? ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬

২১ মে ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

টুর্গেনেভের "মুমু" নামক একটি করুণ গল্প দিনুকে দিয়ে

তর্জ্জমা করিয়েছিলুম— সেইটি তোমাকে বুকপোষ্টে পাঠালুম— যদি পছন্দ না কর তাহলে ভারতীর হাতে পাঠাতে কিছুমাত্র বিলম্ব কোরো না— কারণ ওরা নবীন লেখক, বাধায় বা বিলম্বে অধীর হয়ে পড়ে। এখানে ছুটিতে আছে ওকে দিয়ে আরো কতকগুলো জর্ম্মান ফরাসী ও রাসিয়ান গল্প তর্জ্জমা করাব। তাহলেই ওর হাত তৈরি হয়ে যাবে— ওর তর্জ্জমায় হাত খেলে ভাল।

হিবর্ট্ জার্নাল থেকে মীরা একটা ধর্ম্মতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধ তর্জ্জমা করেছিল। নিশ্চয়ই সেটা তোমাদের মাসিকের পছন্দসই জিনিষ নয়— কিন্তু সেটা তত্ত্ববোধিনীতে ঠিক খাপ খায়— সেটা তোমাদের দেরাজের মধ্যে বন্ধ করে রেখে কোনো ফল হবে না। মনে কোরো না তোমরা ছাপ্তে দেরি করচ বলে লেখিকা বা তার বাবা অধীর হয়েছে। কিছু মাত্র নয়। মীরার নাম করবার নেশা নেই— আমারও সে সম্বন্ধে কোনো তাগিদ নেই। কিন্তু আমি সম্পাদক, সম্পাদক হয়ে সে কথাটা তোমার বোঝা উচিত। *From the Bottom Up* নামক বই থেকেও তার গোটা তুয়েক সঙ্কলন আছে— সেগুলোও তত্ত্ববোধিনীতে বার করে দিতে পারলে তাকে দিয়ে আর কতকগুলো লিখিয়ে নিতে পারি।

মোহিতবাবুর স্ত্রী আমাকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা লিখেছেন— বোধ করি তিনি সেটা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। আমার বিশ্বাস এটা তোমাদের কাগজে দেবার যোগ্য হয়েছে। এই সঙ্গে বলে রাখি এমন অনেক কবিতা তোমরা

বের কর যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমন গল্প প্রবন্ধও দুই একটা দেখা যাচ্চে।

ক্ষিতিমোহনবাবুর গতিবিধি তুমি কিছু লক্ষ্য করতে পেরেছ? শিলাইদহে আমি আসা অবধি তিনি আমার কক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে আমি হাতছাড়া করতে চাইনে। ইতি ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

২৩ মে ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কবিকে তুমি যেমন করে পার এখানে রওনা করে দাও। তার পরে আমার এলাকার মধ্যে এসে পড়লে আমি তাকে সুস্থ না করে ছাড়ব না। কিছুতে সত্যেন্দ্রের মনে যেন দ্বিধা উপস্থিত না হয়। এখানে তার কিছুমাত্র অসুবিধা হবেনা— তার প্রধান কারণ এটা হচ্চে গৃহস্থঘর, এ আশ্রম নয়। এখানে দিনু আছে—তাছাড়া আমি আছি—ছুটির দিনগুলো সুরে বেসুরে গল্পে গুজবে বেশ জমে যাবে। যে কোনো উপায়ে তুমি তাকে এখানে পৌঁছে দিয়ো। তুমি নিজে যদি তাকে সঙ্গে করে আনতে পার তাহলে আরো ভালো হয়। তাহলে সম্পাদকের কাজও কিছু গুছিয়ে যেতে পার। কিন্তু একদিন

আগে পরিষ্কার খবর পাঠিয়ে দিয়ো। কারণ যথাসময়ে কুষ্টিয়ায় পাল্কি রাখ্‌তে হবে— নইলে মুস্কিল হবে। তোমরা কে কে আসচ, কখন আসচ একেবারে নিশ্চয় নির্দ্দিষ্ট করে লিখো।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী সম্বন্ধে আমার অভিমত। "জীবন বৈচিত্র্য" লেখাটি ভাল হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হয় নি— অনেকস্থলেই নিরর্থক ও অদ্ভুত হয়েছে। প্রথমেই ঐটে পড়ে ভাবছিলুম এটা কেন দিয়েছ। "বুদ্ধদেব" কবিতায় চিন্তা ও ভাব দুইই অগভীর। "নববর্ষ" প্রবাসীতে দেবার কোনো দরকার ছিল না। "প্রকৃতিসুন্দরী" কবিতাটি কাকে লক্ষ্য করে বলা হচ্চে? যদি প্রকৃতিকে হয় তবে শেষ দুই ছত্রের অর্থ কি? "গোপন হৃদয়পটে" কল্পনা তাকে আঁক্‌তে যায় কেন? বোধ হচ্চে, লেখাটির ভিতরকার মানে হচ্চে প্রেমের আবেগে সমস্ত প্রকৃতি আজ মাধুর্য্যের নিবিড়তা লাভ করেছে। কিন্তু সেটা কিছুই স্পষ্ট হয় নি। "ফুল আজি তব গন্ধে হয়েছে সুরভি"—এ কি প্রকৃতির গন্ধে? "তব লজ্জা আঁকিয়াছে" ইত্যাদি, এ কি প্রকৃতির লজ্জা? কেন লজ্জা? আবার "নদী আজি গাহে" এ কি প্রকৃতির গান? প্রকৃতির গন্ধে প্রকৃতির ফুল সুরভি হবে, প্রকৃতির লজ্জায় প্রকৃতির রবি রাঙা হবে, প্রকৃতির গানে প্রকৃতির নদী গান করবে এ কথা বিশেষ করে বলবার দরকার কি? তার পরে "লভিয়াছে নবপ্রাণ সকল জগৎ"—কেন? "মোর দগ্ধ তপ্ত হিয়া তোমার চরণপ্রান্তে পড়িছে লুটিয়া বিফল বেদনাভরে।" এ কি প্রকৃতির পায়ে? সমস্ত কবিতাটা পড়ে দেখো— প্রকৃতিসুন্দরীর সঙ্গে খাপ খায় না। যদি

অন্য কোনো সুন্দরীর কথা হয় তবে মেয়ে লিখ্‌চে কেন? এ যে গীতিকাব্য— এ ত ড্রামাটিক্ নয়। সব সময়ে কবি কোনো উপস্থিত সত্যকে অবলম্বন করে লেখে না— কিন্তু পুরুষের কল্পনা পুরুষের যোগ্য এবং মেয়ের কল্পনা মেয়ের যোগ্য হওয়া চাইনে কি?— হেমেন্দ্র সিংহের লেখা নিতান্ত চক্‌মকি ঠোকা— যতটা স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয় তার চেয়ে ঠক্‌ঠক্ ঢের বেশি— বাক্যগুলো এরকম ক্রমাগত ঘাড়ের উপর এসে পড়তে গেলে ভারি শ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। "যযাতির স্বর্গপ্রাপ্তি" এমন একটি জিনিষ যাকে প্রশংসাও করা যায় না, নিন্দাও করা যায় না। লাভ কবিতাটি সনেট—(সনেট জিনিষটি তীরের মত— তার শেষ প্রান্তে একটি ঝক্‌ঝকে ও তীক্ষ্ণ ফলা থাকা উচিত সেইটে বুকে এসে বিঁধ্‌বে।) এ কবিতার ভাবটি পুরাতন ও তার প্রকাশটিও বিশেষত্বহীন। ইনি আমার নামে একটি কবিতা রচনা করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন সেটি প্রশংসার যোগ্য— তার প্রধান কারণ সেটি আমার নামে, দ্বিতীয় কারণ, মন্দ হয় নি। "মহাকর্ষণ" লেখাটা স্কুলপাঠ্য। "চন্দ্রসূর্য্য" কবিতাকণাটি, কণামাত্র কিন্তু কবিতা নয়— এ সব জিনিষ হীরের মত কঠিন ও উজ্জ্বল হলে তবেই এদের কণিকতা আদরণীয় —বালুর কণা দিয়ে কেউ হার গাঁথে না। "তুই বন্ধু" কবিতা সম্বন্ধেও এই কথা। তোমার সমালোচনা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তারকনাথ রায়কে তুমি লাঠির বাড়ি মেরেছ, খড়্গাঘাত করনি— তাতে করে মানুষকে কেবল আধমরা করা হয় সেটা ভাল নয়— একেবারে এক কোপে সেরে দিলেই তুই পক্ষে

ভাল। সত্যেন্দ্রের কবিতা ও গদ্য দুইই আমার ভাল লেগেছে। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ত্বদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ— সত্যেন্দ্রকে শিলাইদহে নিশ্চয় পৌঁছিয়ে দিয়ো।

৩৮

২৭ মে ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল। রামানন্দবাবুকে লিখেছি। কিন্তু অজিতের প্রবন্ধ শেষ হয়ে গেলে এটা আরম্ভ হলেই ভাল হয়। লোকের তখন জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য একটু বাড়তে পারে।

সত্যেন্দ্রকে কবে এখানে পাঠাবার উদ্যোগ করলে আমাকে সত্বর জানিয়ো। এখানে তার কোনো অসুবিধা হবেনা। তুমি যদি না আস্‌তে পার মণিলাল কি তাকে পথ দেখিয়ে আন্‌তে পারবে না?

বড়দাদার লেখার প্রুফ দেখে পাঠিয়েছি— সংশোধিত প্রুফটি তুমি অবিলম্বে তত্ত্ববোধিনীতে পাঠাতে ভুলো না।

তোমার গল্প কতদূর? একবার এখানে এসে আসর জমিয়ে শুনিয়ে দিয়ে যাও না? ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

১২ জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

জ্ঞানের হাত দিয়ে জীবনীটা পাঠিয়েছি— পেলে কিনা কোনো খবর দাওনি কেন? সবটা পড়ে দেখো— যদি কোথাও কোনো খট্‌কা বাধে তবে সেটা সাফ করে ফেলো।

শ্রাবণে তোমরা আমার বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেছ লিখেছ— তা যদি হয় তবে সেইটে চুকে গেলে ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে আমার জীবনস্মৃতি বের করলে কেমন হয়? তাহলে একটা প্রসঙ্গক্রমে ওটা বের হতে পারে।

সাময়িকপত্রাদি তোমরা যা পাও— ব্যবহারের অতীত হয়ে গেলে আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতে পার? রামানন্দবাবু দিতে সম্মত হয়েছেন। চেষ্টা করা যাবে যাতে প্রবাসীরও কাজে লাগে। ইতি সোমবার

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ শান্তার শরীর কেমন আছে?

৪০

জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার ব্যাকরণ এবং বড়দাদার গীতাপাঠ এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। গীতাপাঠের প্রুফটা একবার কাপির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার একটা প্রুফ তত্ত্ববোধিনীতে ও অন্যটা আমার কাছে পাঠিয়ো। জীবনস্মৃতি তোমাদের হাতে পূর্ব্বেই সমর্পণ করেছি। ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধহয় দেখেছ—জিনিষটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি—অর্থাৎ আমার জীবন বলে একটা বিশেষ গন্ধ যাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তার জন্যে আমার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি—আমার ত বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে কিন্তু আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ইত্যাদি।

ব্যাকরণটা কি তোমরা ধারাবাহিক প্রকাশ করতে রাজি আছো? ওটা যে খুব রসালো জিনিষ এমন কথা আমার শত্রুপক্ষেরাও বল্‌বে না—ওর মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে যুবক পাঠকের চরিত্র বিকার ঘট্‌তে পারে। তির্য্যক্‌রূপের মধ্যে যে রূপ আছে তাতে মুনিগণের তপস্যার বিঘ্ন হবে না অতএব এরকম জিনিষ কি মাসিকে চল্‌তে পারবে?

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাদের এবারকার প্রবাসী মোটের উপর ভাল হয়েছে।

বিশেষত এবারকার কষ্টিপাথর নামের উপযুক্ত হয়েছে। অনাবশ্যক লোককে আঘাত কোরো না— অনাবশ্যক এই জন্যে বলচি যাদের মরণদশা তারা মরবেই— মাঝের থেকে গো-হত্যার পাপে লিপ্ত হও কেন? যারা সাহিত্যের গুণ্ডাগিরি ব্যবসায়ে পাকা হয়ে উঠেছে খুনজখমের খ্যাতিটা তাদেরি হোক্ তোমরা ভদ্রলোক, দয়ামায়া আছে বলেই যেন সকলে তোমাদের স্মরণ করে। যারা লিখতে অক্ষম তারা সহজেই হতভাগ্য— বিধাতাই তাদের দণ্ড দেন, তার উপরে তোমরা কেন তাদের দুঃখের বোঝা বাড়াও? যারা তোমাদের প্রতি দ্বেষ বহন করে তারা নিজের অন্তরতাপে নিজে দগ্ধ হয়, তাদের উপর আর অগ্নিবাণ বর্ষণ কোরো না— শান্ত হয়ে হাস্য মুখে প্রফুল্ল চিত্তে সম্পাদকের আসন আলো করে থাক এই আমি আশীর্ব্বাদ করি— ললাটে ভ্রূকুটির চিহ্ন দূর হয়ে যাক্। রামানন্দবাবুর চিহ্নিত একটি প্রবন্ধ শরৎবাবুকে দিয়ে সঙ্কলন করিয়েছি সেটা পাঠাই— সংশোধন তুমি করে নিয়ো— আমার সময় আদবে নেই— আরো কতকগুলো পরে পরে পাঠাব।

৪১

জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বড়দাদার গীতাপাঠের কাপি আজ পাওয়া গেল। বোধ

হচ্চে বড়দাদার কাছ থেকে প্রুফ সংশোধন করিয়ে আনিয়েছ। তবে কেন সেই সংশোধিত প্রুফ তুমি তত্ত্ববোধিনীতে পাঠিয়ে দিলে না? গতবারে আমি শেষ প্রুফের উপর লিখে দিয়েছিলুম যে সংশোধিত প্রুফ যেন তত্ত্ববোধিনী প্রেসে পাঠানো হয়— কিন্তু শেষে দেখা গেল তোমাদের ছাপাখানা তা করে নি। মাঝের থেকে আমাকে দুবার প্রুফ সংশোধনের বৃথা দুঃখ দেওয়া হল। আমার প্রতি এ রকম নিষ্ঠুরতা কোরো না। তোমাদের সংশোধন-করা একটা প্রুফের ফাইল অতি সত্বর সমাজে পাঠিয়ে দিয়ো।

সেই নাটকটা এতদিন পরে একটু মন দিয়ে লেখবার অবকাশ পাওয়া গেছে। এ পর্য্যন্ত এখানে অতিথির অভাব ছিল না সেইজন্য লেখায় সম্পূর্ণ মন লাগেনি, খাপছাড়াভাবে চলছিল। এখন নিভৃতে বেশ একটু হাঁকিয়ে কলম চালানো যাচ্চে। ভীড় থাক্‌লে মোটর গাড়ি পূরা দমে চালানো যায় না— কলম সম্বন্ধেও ঠিক তাই। এখন বোধ করি আর দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যে আমার এ লেখাটা শেষ হয়ে যাবে।

সত্যেন্দ্রর খবর কি? তাকে বিচলিত করতে পারা গেল না— যাকে বলে ধ্রুব সত্য।

এই নাটকটা নিয়ে আটকে পড়া গেছে নইলে বেরিয়ে পড়তুম— ওদিকে বোলপুর থেকে কাজের ডাক পড়চে। ইতি মঙ্গলবার

ত্বদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২

৮ জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বিলাতী গল্প বাংলায় আর বাকি নাই দেখিতেছি। Tourgenevএর Triumphant Love নামক একটি সুবিখ্যাত গল্প আছে— সেটিও আমি দিনুকে দিয়া তর্জ্জমা করাইয়াছিলাম—হয়ত বা তাহাও পূর্ব্বে কোথাও বাহির হইয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু এত খবর রাখাও ত কম কথা নয়। যেখানে যত গল্প বাহির হইতেছে চুম্বকসহ তাহার কি একটা রেজিষ্টার তোমরা রাখিয়া থাক? অনেক "মৌলিক" নামধারী গল্পও ত তর্জ্জমা।

কবিকে আমার কবিজীবনীটা পড়িতে দিয়ো। সে ত সম্পাদক শ্রেণীর নহে সুতরাং তাহার হৃদয় কোমল— অতএব সে ওটা পড়িয়া কিরূপ বিচার করে জানিতে ইচ্ছা করি। সত্যেন্দ্রের শরীর ত ভাল আছে? আজও বুঝি সংসারে তাহার পথপ্রদর্শক জুটিল না? ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনুর "প্রেমের জয়জয়ন্তী"টা কি পাঠাইব? তাহার মূলটি য়ুরোপীয় সাহিত্যে একটি প্রথমশ্রেণীর গল্প বলিয়া খ্যাত।

৪৩
১৬ জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

নাটকখানা লিখ্‌তে সুরু করেছি। কিন্তু আকাশে ঘন মেঘের ঘটা, চারিদিকে ঘন সবুজ ক্ষেত, আমার তিনতলার ঘরের জানালা দরজা সমস্ত খোলা— কলম এগতে পারচে না —একেবারে রাজকীয় আলস্যে ভরপূর হয়ে বসে আছি। তবু একটা অঙ্ক শেষ হয়েছে।— গীতাপাঠের শ্রাবণ কিস্তির পাণ্ডুলিপি অজিতের কাছে আছে— তাকে লিখে দিয়ো যেন রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেয়। ছাপবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রুফ তত্ত্ববোধিনীতে পাঠিয়ে দিয়ো। আমার লেখা পরে দেব এখন। ইতি আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪
২৯ জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বোলপুর থেকে বিষম তাড়া আস্‌চে। আর স্থির থাকতে দিলে [না।] শুক্রবার চাঁদপুর মেলে কলকাতায় পৌঁছব। শনিবার সকালে দেখা হবে কি ? সত্যেন্দ্রকে খবর দিয়ো। নাটকটা শেষ করেছি। যদি ইচ্ছা কর শনিবার মধ্যাহ্ন বা

অপরাহ্নে ওটা শোনাবার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রবিবারে আমাকে বোলপুরে দৌড়তেই হবে। ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩১৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫
১৪ জুলাই ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

শেষকালে নাটকটা প্রবাসীর কবলের মধ্যেই পড়ল। অনেক লোকের চক্ষে পড়বে এবং এই নিয়ে কাগজে পত্রে বিস্তর মারামারি কাটাকাটি চল্‌বে এই আমার একটা মস্ত সান্ত্বনা। তোমাদের সম্বর্দ্ধনাটা শেষ হয়ে গেলে সেটা নিঃশেষে হজম করবার যোগ্য যথেষ্ট পরিমাণে গাল খেয়ে নেবার সুযোগ হবে। সমস্ত জিনিষটা আর একবার মেজে ঘসে বাড়িয়ে কমিয়ে এবারে বেশ আমার মনের মত করে নিয়েছি।

জীবনস্মৃতিটা নিয়ে পড়েছি— ওটাও সাফসোফ করে দিচ্চি —খুব মনোযোগ করে দেখলুম এ রচনাটা সাহিত্যে চলবার মত হয়েছে— নইলে কিছুতেই আমি দিতুম না। ২/৩ দিনের মধ্যে ওর ১ম কিস্তিটা পাঠিয়ে দেব।

তোমাকে নিয়ে ভারি একটা মুস্কিলে পড়েছি। তোমার কাছ থেকে পুরাতন সঙ্কলন চাইতে গেলেই তুমি মনে কর আমি রাগ করেছি— সেই জন্যে তুমিও দিতে পার না আমিও চাইতে

পারিনে। কিন্তু আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলচি কিছুমাত্র রাগ করি নি। হেমলতাকে দিয়ে আমি সুফী ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড বড় বই তর্জ্জমা করাচ্চি। তারই প্রথম অংশ তোমাদের হাতে পড়েছে। কিন্তু এরকম ধারাবাহিক জিনিষ প্রবাসীতে বেরবার যোগ্য নয় অথচ এই রকম জিনিষই তত্ত্ববোধিনীতে বের করা উচিত। এই সুযুক্তিটি তোমার সম্পাদকীয় মস্তিষ্কে খুব করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে সেই লেখাটি অবিলম্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমার এই প্রস্তাবের মধ্যে যদি ষড়রিপুর কোনোটা থাকে তবে সেটা ক্রোধ নয়, সেটা লোভ। লেখা ত তোমরা যথেষ্ট পাচ্ছ— এমন কি, তত্ত্ববোধিনীর মুখের গ্রাসে অংশ বসাচ্চ তবু সামান্য ছুটকো লেখাতেও তোমাদের লোলুপতা ঘুচল না! নিবৃত্তিস্তু মহাফলা— এই কথা স্মরণ করে, প্রবৃত্তি দমন করে সেই ক্ষুদ্র তর্জ্জমাটি যথাস্থানে ফেরৎ পাঠাবে। ইতি শুক্রবার

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬

২৬ জুলাই ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

"রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি" প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনীর। অন্নদা ওটা নিতান্ত বোঝবার ভুলে তোমার হাতে দিয়ে

এসেছে। ওটা জ্ঞানকে সমর্পণ কোরো— পরের ধনে লোভ কোরোনা। অচলায়তনের কাপিটা দখল করবার জন্যে নেপালবাবু সেটা নকল করিয়ে নিচ্চেন— তোমরা সেই নকলটি পাবে— আসলটি পাচ্চ না। জীবনস্মৃতির প্রুফ পাঠিয়েছ লিখেছ কিন্তু এখনো পাই নি। তোমাদের প্রবাসীতে লেখা দিয়ে আমাকে অনেক দুঃখ পরিপাক করতে হচ্চে— ফল হবে এই যে আমাকে নিজের প্রতি অত্যাচারপূর্ব্বক আরো কিছু লিখ্‌তে হবে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭
সেপ্টেম্বর ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

প্রবাসীর জন্য রেজেষ্ট্রি ডাকে আজ আমার "বাংলা নির্দ্দেশক" সন্তোষের "অশ্বের মনস্তত্ত্ব" এবং শরৎবাবুর একটা সংকলন পাঠাই। অশ্বের মনস্তত্ত্বটি বেশ ভাল লেখা হয়েছে, একবার ভেবেছিলুম তত্ত্ববোধিনীতেই নেব— তার পরে লোভ সম্বরণ করা গেল।

সোনার তরীর ইংরেজি তর্জ্জমা অজিত করেছিল— বিলাতে তার এক ইংরেজ মহিলা বন্ধুকে দিয়ে সংশোধিত করিয়েছিল তার পরে বিখ্যাত কবি ও ঋষি Edward Carpenterকে

দেখিয়ে সেই মহিলা ওটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। Carpenter অজিতের কতকগুলি ইংরেজি অনুবাদের খুব প্রশংসা করেছেন। আমার ত বোধ হয় তার মধ্যে কতকগুলি এর চেয়েও অনেক ভাল—সেইগুলির দিকে আমার ঝোঁক ছিল কিন্তু অজিতের ঝোঁক এইটের উপরেই তাই পাঠিয়ে দিলুম। দুজন ইংরেজের হাতের মধ্যে দিয়ে ফিল্‌টার হয়ে নিশ্চয়ই এর বাঙালিত্ব দোষ ঘুচে গিয়েছে, রামানন্দবাবুকে দেখিয়ো—যদি পছন্দ করেন Modern Reviewতে ছাপ্‌তে পারেন।

তোমরা প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে আমার ছবি বের করে আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত করেছ। এই রকম বারবার নিজের ছবি কাগজে দেখার মত শাস্তি নেই। ঐ পাতগুলোর উপর আমি চোখ ফেল্‌তে পারি নে। দোহাই তোমাদের—আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আর আমার ছবি বের কোরো না।

ভারতীর জন্যে গল্প লিখ্‌তে বসেছি কিন্তু কাজের ভিড় এবং শরীরের অপটুতার জন্যে এগতে পারচিনে। মুষ্কিলে পড়েছি, পাতা ষোলো লিখেছি এখনো অন্তত ১২/১৩ পাতা বাকি।

তোমাদের খবর সব ভাল ত? রামানন্দবাবুকে বোলো ২০০ টাকা হস্তগত হয়েছে।

তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তোমার "সওগাদ" পেয়ে খুসি হলুম। অত্যন্ত কাজের ভিড়ে পড়ে এখন এটি ভোগ করবার সময় পাওয়া চাওয়া যাবে না। তুমি শারদোৎসবে এসো— তখন সব আলাপ আলোচনা করা যাবে। শরীরটা একান্ত ক্লান্ত হয়ে আছে। আজই তোমার কাপি (জীবনস্মৃতি) পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯

৬ নভেম্বর ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

যেখানে ডাঙ্গার প্রান্তে জলের প্রান্তে আকাশের প্রান্তে পৃথিবীর প্রান্তে আসিয়া কোলাকুলি করিতেছে সেই নির্জ্জনে ফুলের মধ্যেকার ভ্রমরটির মত একেবারে চুপ করিয়া পড়িয়া আছি।

"নিবেদিতা" প্রবন্ধটা বোধ করি পাইয়াছ। তাহার প্রুফ চাই কিছু কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে কি তোমাদের অসুবিধা হইবে? এখান হইতে প্রুফ যাতায়াতে

ঠিক চারদিন লাগিবে। যদি নিতান্ত অসম্ভব হয় তবে যেমন আছে তেমনিই থাক্।

জগদীশের নিকট হইতে কাবুলিওয়ালার ইংরেজিটা সংগ্রহ করা হইয়াছে কি? তিনি সেটা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ইতি ২০শে কার্ত্তিক ১৩১৮

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০
১৩ জুন ১৯১২

ওঁ

চারু

আজ মার্সেলসে পদার্পণ করব। যাত্রাটা নির্ব্বিঘ্নে কেটেছে। এত দিন শান্তির পরে কাল সমুদ্রে ঝড় দেখা দিয়েছিল তাতে ভূমধ্যসাগর উতলা হয়ে উঠেছিল কিন্তু আমার অন্তরাত্মাকে ক্ষুব্ধ করতে পারে নি। ইতিপূর্ব্বেই প্রবাসীর জন্যে দুটো লেখা বোলপুরে পাঠিয়েছি— পেয়েছ বোধ করি। কাগজগুলো কুকের কেয়ারে আমার নামে পাঠিয়ে দিয়ো। দেশের খবর কি? ৩১ জ্যৈষ্ঠ

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

* ৭ অগস্ট ১৯১২

TELEGRAM
"WHITMORE"

Butterton Vicarage,
New Castle,
Staffs.

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। দেশ থেকে যাত্রা করবার সময় মনে করেছিলুম কিছুকালের জন্যে মানুষের ঘূর্ণির মধ্যে থেকে পরিত্রাণ পাব। এ দেশে মানুষের অভাব আছে এমন কথা আমার মনে ছিলনা— কিন্তু অপরিচিত জায়গার সুবিধা এই যে ভিড়ের মাঝখানেই নিরালা পাওয়া যায় তাই ভেবেছিলুম অপরিচয়ের তটভূমিতে একলা দাঁড়িয়ে এখানকার জনসমুদ্রের তরঙ্গলীলা দেখ্‌তে পাব। কিন্তু বুঝতে পারা গেল আমার কুষ্ঠিতে ওটা লেখে না। লণ্ডনের পাকের মধ্যে খুব এক চোট ঘুর খেয়ে কয়েকদিন হল পাড়াগাঁয়ে একটি পাদ্রির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমার পক্ষে এও ঠিক উল্টো ব্যবস্থা হয়েছে। কারণ ভিড়ের মধ্যে থাকৃতে গেলে অপরিচিত হওয়ার সুবিধা আছে, ফাঁকা পাওয়া যায়— কিন্তু দুই একজনের সঙ্গে বাস করতে গেলে রীতিমত বন্ধুত্ব না থাক্‌লে মনের ভিতরটাতে বিশ্রাম পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা লোক খুব ভাল সন্দেহ নেই।

মনে আশা ছিল ভ্রমণের বিবরণ বিস্তারিত করে লিখ্‌তে পারব। কিন্তু সরস্বতীর বরাবর পদ্মবনে থাকার অভ্যাস তিনি ভিড়ের দিকে ভিড়বেন না। সময় নেই। এমন কি,

চিঠি লেখাই প্রায় অসম্ভব হয়েছে। তবে, তোমরা যদি এখানে থাক্‌তে খুসি হতে। তোমাদের কবি এখানকার কবিসভায় আসন পেয়েছে এবং সে আসনটি নিতান্ত ছোট নয়। আদর জিনিষটা উপাদেয় সে কথা স্বীকার করতেই হবে কিন্তু আমার সম্মানে আমার দেশের অগৌরব কিছু পরিমাণে দূর হবে এইটে আনন্দের বিষয়—এবং সব চেয়ে আমার আনন্দ হয় এই কথা স্মরণ করে যে আমি যা রচনা করেছি, এখানকার গুণীরা বল্‌চেন এঁদের পক্ষে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এটা গর্ব্বের কথা নয় আনন্দের কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল সমস্ত বিরোধের ভিতর দিয়ে যখন দেখ্‌তে পাই তখন মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পরম প্রেমকে কিছু পরিমাণে সত্যরূপে অনুভব করবার সুযোগ পাওয়া যায়।

আষাঢ় মাসের প্রবাসী ও জুন মাসের Modern Review আমাকে পাঠালে না কেন? লণ্ডন থেকে দূরে থাকাতে এবারকার মেল এখনো হস্তগত হয় নি—হয় ত আজ পাওয়া যেতে পারে—দেখব তার সঙ্গে এসেছে কি না। বিদেশে দেশের বাণীর জন্যে মন উৎসুক হয়ে থাকে অতএব তোমাদের কাগজ-পত্র পাঠাতে অবহেলা কোরো না। বলা বাহুল্য Thomas Cook & Son Ludgate Circus London ঠিকানায় আমার চিঠি পাঠানোই ভাল। সত্যেন্দ্রকে আমার অন্তরের স্নেহ জানিয়ো—সে আজ এখানে থাক্‌লে কত আনন্দ হত।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২

৫ সেপ্টেম্বর ১৯১২

ওঁ

আমার ঠিকানা—
21 Cromwell Road
South Kensington
London
S. W.

প্রিয়বরেষু

চারু এখানে পদার্পণ করে অবধি আষাঢ় মাসের প্রবাসী পাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে আসচি। কলকাতায় যাদের যাদের চিনি সকলেই[সকলকেই] লিখেছি— তোমাকেও জানিয়েছি— এখানে সুকুমারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়বার জন্যেও চেষ্টা করেছি— কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারি নি। আবার তোমাকে লিখ্‌চি; এবারও যদি ফল না হয় তবে এই আশাটা একেবারে পরিহার করে নিশ্চিন্ত হব— আশার অবধি নেই, শাস্ত্রে এই কথা বলে বলেই এতদিন চেষ্টা করতে ছাড়ি নি কিন্তু অন্তত আষাঢ় মাসের প্রবাসী সম্বন্ধে আশার একটা সীমান্ত আমার সম্মুখে আসন্ন হয়েছে।

আমার সম্বন্ধে নানা খবর হয় ত নানা দিক থেকে পেয়েছ অতএব আমার কাছ থেকে সে সম্বন্ধে বেশি কিছু প্রত্যাশা কোরোনা। কেবল একটা খবর দেওয়া আবশ্যক হয়েছে বলে দিচ্চি। Modern Reviewতে যে কটা গল্পের তর্জ্জমা বেরিয়েছে পড়ে রোটেন্‌ষ্টাইন খুব বিস্ময় প্রকাশ করচেন।

তিনি এগুলো মেজে ঘষে সংশোধন করে ছাপতে চান। লেখকরা যদি সম্মতি দেন তাহলে এ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। রামানন্দ-বাবু হয় ত সম্মতি আনিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু আমার খুব ভাল গল্পগুলো যে তর্জ্জমা হয়েছে এমন আমার মনে হয় না।

আমি এ দেশে অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত থাকব। তার পরে আমেরিকায় যাত্রা করব। ইতিমধ্যে এখানকার কাজ সমস্ত শেষ করে যেতে হবে।

এখানে বেশি যে লিখ্‌তে পারি তা নয়— সময়ও বেশি পাই নে, শরীরও যে খুব ভাল তা বল্‌তে পারি নে, যা কিছু লিখি সমস্ত শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানকার ভাণ্ডারীর কাছ থেকে তোমাদের প্রবাসীর জন্যে যদি কিছু মাঝে মাঝে আদায় করে নিতে পার চেষ্টা করে দেখো। তত্ত্ববোধিনীর পাত্র পূর্ণ হয়ে যা উপচে পড়বে তা বিতরণ করতে বোধ হয় অজিত কৃপণতা করবে না।

এবার থেকে কুকেদের কেয়ারে আমাকে পত্র ও পত্রিকা না দিয়ে ২১ নম্বর ক্রমোয়েল রোডের ঠিকানায় দিয়ো— তাহলে একটু শীঘ্র পাওয়া যায়। রামানন্দবাবুকে আমার নমস্কার জানিয়ো। এবং শান্তা সীতাকে বোলো এখানকার দৈত্যপুরীর সদর রাস্তার ধারে বসে তাদের সেই শীর্ণ নিভৃত গলিটির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ইতি ২০ ভাদ্র ১৩১৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ— কবির খবর এসে অবধি পাই নি। সত্যেন্দ্র কেমন

আছে, কি করচে জানিয়ো। সত্যেন্দ্র যদি কোনোক্রমে আমার সঙ্গে আসতে পারত তাহলে তার পক্ষে কতদিক থেকে যে কত ভালই হত এই কথাই আমার বারবার মনে হয়।

তোমার সেই গল্পটার কি গতি হল?

৬ অক্টোবর ১৯১২

ওঁ

আমার ঠিকানা

21 Cromwell Road
South Kensington
London, S. W.
[২ আশ্বিন ১৩১৯]

প্রিয়বরেষু

বারম্বার আমার সম্মান সম্বর্দ্ধনার কথা কাগজে পড়তে পড়তে আমি যে কতটা সঙ্কোচ অনুভব করচি সে কথা বল্‌তে পারি নে। এখানকার লোকে আমার রচনার আদর করচেন সে ঘটনায় আমি পুলকিত হই নি এমন কথা বল্‌লে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু তোমরা যখন সেই সমস্ত খবর জোড়াতাড়া দিয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে থাকো তখন আমি বড় লজ্জা পাই। বিশেষত এবারকার প্রবাসীতে দেখলুম Miss Radford এবং Miss Sinclairএর চিঠি দুটো তর্জ্জমা করে দিয়েছ— আমি যে কি ভয়ে ভয়ে আছি পাছে তোমরা ওগুলো Modern Reviewতে তুলে দাও তা আমি বল্‌তে পারি নে। ওগুলো

প্রাইভেট পত্র—ছাপা হলে হয় ত তাঁদের পক্ষে বিশেষ সঙ্কোচের কারণ হবে এবং ওটা ঠিক সঙ্গত হবে না। অবশ্য কি করেচ জানি নে, এবং যদি করে থাক নিষেধ করে প্রত্যাখ্যান করবারও সময় নেই। কিন্তু দোহাই আমার—এখানে প্রাইভেটভাবে কে কি বল্‌চেন তা নিয়ে প্রকাশ্যপত্রে আলোচনা কোরো না।

বহুকাল পরে কাল ১লা আশ্বিনে ১লা আষাঢ়ের প্রবাসী পেলুম। অন্যান্য মাসের প্রবাসী ঠিক সময়েই পেয়েছি কেবল ঐ আষাঢ়টাতেই আট্‌কে গিয়েছিল।

য়েট্‌স্‌ যে বইটা Edit করচেন সেটা ভূমিকা সমেত ছাপাখানায় গেছে—বোধ হচ্চে অক্টোবর মাসের মধ্যেই বের হতে পারবে। হাতে আরো অনেকগুলো জমেছে। ছোট গল্প আরো গোটাকতক পেলে মন্দ হত না। সুকুমার কিছু তর্জ্জমা করতে সুরু করেছে। সুকুমারের তর্জ্জমা মন্দ হয় না। গোটা তিনেক নাটক করে ফেলেছি, কবিতাও কম হয় নি। শেষ বয়সে যে আমাকে ইংরেজি ভাষার সাধনা করতে হবে সে কথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবি নি। ক্ষণিকায় লিখেছিলুম পরজন্মে আমি হয় ত আমার লেখার সমালোচক হব—ইহজন্মে তার একটা ভূমিকা হল, নিজের লেখার নিজে অনুবাদক হওয়াও একটা উৎকট ব্যাপার—ওতেও নিজের রচনাকে কম পীড়ন করতে হয় না—একেবারে তার সর্ব্বাঙ্গে কালশিটে পাড়িয়ে দেওয়া হয়।

রামানন্দবাবুকে বোলো Modern Reviewর জন্য

রোটেনস্টাইনকে লিখ্‌তে একটু যেন পীড়াপীড়ি করে ধরেন। Modern Reviewর প্রতি তাঁর খুব একটা শ্রদ্ধা আছে। ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে তিনি যদি একটা সমালোচনা লেখেন এবং আমাদের আধুনিক শিল্পীদের প্রতি তিনি যদি কিছু সদুপদেশ দেন তা হলে সেটা নিশ্চয়ই উপাদেয় হবে। জ্যোতি-দাদার ছবি তাঁর অত্যন্ত ভাল লেগেছে—তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে এখানকার কোনো একটা কাগজে তিনি লিখ্‌বেন মনে করেচেন।

জীবনস্মৃতিতে গগনের ছবিগুলি ভারি চমৎকার হয়েছে। এঁরা সেগুলোর খুব প্রশংসা করচেন। ও বইটা কি বিক্রি হবার আশা আছে? বিপরীত রকম খরচ করেছে।

জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্রের একটা বড়সড় ভদ্র রকম সমালোচনা কোরো—সরাসরি বিচার করে দু লাইনে সেরে দিয়ো না।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

জানুয়ারি ১৯১৩

ওঁ

508 W. High Street
Urbana, Illinois
U. S. A,

প্রিয়বরেষু

চারু, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেলুম। কিছুদিন থেকে প্রবাসীতে আমার লেখা পৌঁচচ্ছে না কেন জিজ্ঞাসা করেছ। তার একটা কারণ বল্লেই বাকিগুলো বলবার আর দরকার হবে না—কিছুকাল থেকে বাংলা একেবারেই লিখি নি। কোনো কালে যে এ দেশে এসে ইংরেজিতে যে কোনোরকম লেখাপড়া করব এ কথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবি নি। সেইজন্যেই বিদেশযাত্রার আরম্ভের মুখে খুব কষে কোমর বেঁধে দেদার বাংলা লিখ্‌তে সুরু করেছিলুম, ভেবেছিলুম এইরকম অনর্গল চল্‌বে। তোমরাও সেইভাবে পাত পেড়ে বসেছ। ইতিমধ্যে শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা ভারতী যখন তলব দিলেন তখন ক্রমশ বুঝতে পারলুম এখানে আমাকে এখানকারই কাজ করতে হবে। সমুদ্রের ওপারের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে এসেছে। এখানে ত চিরদিন থাক্‌ব না, এই ক'দিনের মধ্যে এখানকার কাজ যতটা পারি শেষ করে দিয়ে যেতে চাই। অতএব এখন তোমরা ডাক দিলে সাড়া পাবে না।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি ম্যাকমিলানরা ছাপবার ব্যবস্থা করচে।

ওরাই আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে। সুবিধা এই যে, ইংলণ্ডে আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে ওদের কারবার আছে। বোধ হয় আর্থিক কিছু সুবিধা হতেও পারে। এবারকার বইগুলো ত সব বিকিয়ে গেছে—লোকে খুব উৎসুক হয়ে উঠেছে—সকলের ভালও লেগেছে—অতএব এইবার যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয় তবে আমার বিদ্যালয়ের অকাল ঘুচতেও পারে। এ দেশে বোধ হয় লক্ষ্মী সরস্বতীর সতীন নন কেননা, এ দেশে বহুবিবাহ আইনবিরুদ্ধ—এই একটা মস্ত ভরসার কথা দেখা যাচ্চে।

এদিকে তর্জ্জমা জমে উঠ্‌চে। একবার লজ্জার বাঁধ ভাঙলে তখন ব্যাকরণের রক্তচক্ষুকে আর কে ভয় করে! ছেলেবেলায় যে রকম করে দুই পায়ের চটি সামনের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যেতুম, ঠিক তেমনিভাবেই ইংরেজি ভাষার ষত্ব ণত্ব ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলেছি—মোদ্দা, চলা বন্ধ করি নি। আজ এই খানিকক্ষণ হল শারদোৎসব তর্জ্জমা করে সেরেছি —কাল ওটা আরম্ভ করেছিলুম।

তুমি ত জানই এ দেশের লোকেরা বক্তৃতার কাঙাল। যতই চেষ্টা করি না কেন, বক্তৃতা না করে পার পাবার জো নেই। সে জন্যে কিছু কিছু লিখ্‌তে হচ্চে। এ কাজটা আমার কাছে তেমন স্বচ্ছ নয়, অথচ এটার প্রয়োজন আছে। এদিকে ওদিকে নিমন্ত্রণ জুটচে—যতটা পারি কাটাবার চেষ্টায় থাকি—কিন্তু বাদসাদ দিয়েও বাকি থাকে—সব নিমন্ত্রণ ত বিনা বক্তৃতায় সারবার জো নেই তাই প্রস্তুত হতে হচ্চে—সামনে

যদ্দুর দৃষ্টি যাচ্ছে কোথাও অবকাশের টিকি মাত্র দেখতে পাচ্চি নে।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর জন্যে আমি সত্যই দুঃখ বোধ করি। আমি এ দেশে খ্যাতিলাভ করব কল্পনাও করি নি, সুতরাং সেজন্যে অগ্রসর হয়ে আসি নি—দৈবক্রমে জুটে গিয়েছে। এই খ্যাতির সর্ব্বপ্রধান সুখ এই যে এতে করে আমার দেশের লোকের মনে আনন্দ হবে—এ আমার একলার জিনিষ নয়। কিন্তু এক জায়গায় দুঃখ উৎপন্ন হচ্চে সে আমারও দুঃখ। দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন এ দেশে যশ উপার্জ্জন করবেন তখন আমি তাতে অন্তরের সঙ্গে সুখী হব এ আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি। আমাদের দেশের যে কেউ যেটুকু সফলতা লাভ করতে পারচেন সে যে আমাদের প্রত্যেকেরই। দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রতিভা কি তাঁর একলার সামগ্রী? তিনি যেখানে মহৎ সেখানে সে মহত্ত্ব আমাদের সকলেরই, কিন্তু যেখানে তিনি ক্ষুদ্র, সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র। দস্যু রত্নাকরের পুত্রপরিবারেরা তার ঐশ্বর্য্যের ভাগ নিয়েছিল কিন্তু তার পাপের ভাগ নিতে ত পারে নি। চাঁদের জ্যোৎস্না সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু তা'র কলঙ্ক তা'র নিজের বুকেই দাগা থাকে। আমার কবিতার মধ্যে অযোগ্য জিনিষ ঢের আছে—আমার বাঁশির সকল রন্ধ্রেই যে উঁচু সুর বেজেছে তা নয়—আমার প্রকাশের স্রোতের মধ্যে পাপের মূর্ত্তিও যে প্রকাশ পায় নি এ কথা কখনই সত্য নয়—কিন্তু নদীর জলে কাদা মিশল থাকে বলে সেইটেই ত তার মুখ্য জিনিষ নয়—সেটা সত্ত্বেও যদি তার

জল স্নানে পানে কাজে লাগে তবে পৃথিবীসুদ্ধ লোক ত তাকে ক্ষমা করে—সেই ক্ষমা যদি দ্বিজেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে একেবারে না পাই তবে আমার কবিত্বের গ্লানির চেয়ে তাঁরি চিত্তের গ্লানির জন্যে আমি বেশি বেদনা পাব। এই গ্লানি কবে এবং কেমন করে দূর হবে জানি নে কিন্তু প্রার্থনা করি এই কালিমা সম্পূর্ণ কাটিয়ে তিনি তাঁর প্রতিভাকে পবিত্র করুন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসীর জন্যে একটা কবিতা এই সঙ্গে পাঠাই। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমরা আমার যতগুলি কবিতা ছাপিয়েছ কোনোটাই নির্ভুল হয় নি। বোধ হয় পাণ্ডুলিপি থেকে কেউ নকল করে দিয়েছিল এবং নকলে ভুল থেকে গিয়েছিল। কতকগুলো ভুল গুরুতর ছিল—কবিতার অর্থ বোঝা কেউ দরকার মনে করে না বলেই সেগুলো ধরা পড়ে নি। যাই হোক, কবিতার উপর এরকম অল্পমাত্র নিষ্ঠুরতাও ব্যথাজনক।

৫৫

১৭ মে ১৯১৩

C/o Messers Thomas Cook & Son,
Ludgate Circus
London

প্রিয়বরেষু

চারু আসল কথা আমার আদবে আর লিখ্‌তে ইচ্ছা করে না। কলমের সঙ্গে মনটাকে জুতে আজ পর্য্যন্ত তাকে হয়রান করে ছুটিয়েছি, মারামারি ঠেলাঠেলি রক্তপাতও কম

হয় নি—এখন মনে হয় এই লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে আর প্রবেশ করা নয়। প্রবাসীর সঙ্গে আমার লেখনীর একটা যোগ সাধন হয়ে গেছে এবং তার প্রতি আমার অন্তরের স্নেহ আছে—সেই মমতাবন্ধনে হয় ত আবার কোন্ দিন জড়িয়ে পড়ব কিন্তু মুক্তি লাভের জন্যেই চেষ্টা করতে হবে। আমার হাটের বেসাতী হয়ে গেছে বোধ হচ্চে যেন—এবারে ভিড় ঠেলাঠেলি এবং লাভ লোকসানের হিসাব চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়ে ঘরের মুখে রওনা হতে হবে—নইলে রাত্রি এসে পড়বে—আর পথ দেখ্‌তে পাব না।

তোমাদের সামনে একটা লড়াইয়ের দিন এসেছে দেখ্‌তে পাচ্চি—কিন্তু তোমাদের প্রতি একান্ত স্নেহ সত্ত্বেও আমাকে বোধ হয় হার মানতে হবে। তোমরা যখন দস্যুর আক্রমণে পড়েছ তখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি ভগবান অপহরণ করচেন—জয়ী হবার গৌরব আর আমার সইবে না, এখন পরাভবের তলায় নেমে মাটির উপরে আসন নেবার সময় এসেছে। হাতের কাজ যা ছিল তা একরকম চুকিয়েছি—এবার পায়ের কাজ, এখন বিদায়ের রাস্তায় চল্‌তে হবে, ধুলোর উপর দিয়ে হাঁটতে হবে। অতএব বোঝা হাল্‌কা করে দিয়ে যাত্রা করা যাক্—এখন আর পিছু ডেকো না।

এখান থেকে রওনা হতে বোধ হয় আর খুব বেশি দেরি হবে না। ইতি ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

১৭ নভেম্বর ১৯১৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

আমার সম্মান লাভে যাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ ১৩২০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭

* ৫ মার্চ ১৯১৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তুমি চেয়েছ তাই পাঠাচ্ছি— কিন্তু এগুলো গান সে কথা মনে রেখো— সুর না থাকলে এ যেন নেবানো প্রদীপের মত —এ ত ছাপতে দিতে ইচ্ছা করে না।

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হল উতলা।
বুকের পরে দোলে রে তার
পরাণ-পুতলা।
আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,

গান ছুলিছে, নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা।
আমার ছুটি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কে গো ছুলিছে।
ছুলিয়ে দিল সুখের রাশি,
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
ছুলিয়ে দিল জনমভরা
ব্যথা অতলা॥

এর মধ্যে ত কোনো আইডিয়া নেই এর যে বাসন্তী চঞ্চলতা আছে সেটি গানের সুরেই ব্যক্ত হচ্চে— শাদা কথায় এর কোনো নেশা নেই— এই জন্যে কাগজে ছাপবার যোগ্য বলে একে মনে করি নে। বরঞ্চ আর একটা দিচ্চি সেটা যদিচ গান তবু চল্‌তেও পারে।

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
বেলা শেষের তান
পথে চলি, পথিক শুধায়
"কি নিলি তোর দান?"
দেখাব যে সবার কাছে
এমন আমার কি বা আছে,
সঙ্গে আমার আছে শুধু
এই ক'খানি গান।

ঘরে আমার রাখ্‌তে যে হয়
বহু লোকের মন ;—
অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি,
অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য করে
করব মূল্যবান।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যেটা বক্তৃতা করেছিলুম সেটা তত্ত্ববোধিনীতে পাঠিয়েছি। লিখ্‌তে গিয়ে দেখলুম মনের মত হল না। তবু দ্বিজেন্দ্রর কাছে কপিটা কিম্বা ওর প্রুফ চেয়ে নিয়ে দেখো যদি চলনসই মনে কর তবে প্রবাসীতে নিতে পার। কিন্তু ছাপবার কি সময় আছে? ইতি বৃহস্পতিবার

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮

* ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, তুমি ত জানই, প্রবাসীকে সাহায্য করতে পারলে আমি কত খুসি হই। সবুজপত্র থেকে তোমরা যত খুসি

তোলো আমার আপত্তি নেই। মণিলালের মনের ভাবটা এই যে গল্প যদি তোমরা একেবারে গোটা তুলে নাও তাহলে সবুজপত্রের বিশেষ ক্ষতি হবে, কারণ, সবুজপত্রের মত কাগজ সাধারণের কাছে মুখরোচক হতে পারেনা—ঐ একটুখানি গল্পের প্রলোভন থাকাতেই ওর উপর লোকের দৃষ্টি পড়ে। এ কথা আমি নিশ্চিত জানি প্রবাসীতে কোনো লেখা বের হলে যত লোক পড়ে সবুজপত্রে তার শিকিও পড়ে না—সে জন্যে আক্ষেপ করে আর কি করব? ও কাগজের সম্পাদক এবং প্রকাশকের বিনা সম্মতিতে তোমাদের ত কিছু করবার জো নেই। আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তোমরা যে প্রস্তাব করেছ সেটা যথাস্থানে উত্থাপন কোরো।

আমি ইতিমধ্যে প্রায় গোটা-কুড়িক গান লিখেছি সেইগুলি ক্রমে ক্রমে তোমাদের পাঠিয়ে দিতে পারি—সেগুলোর প্রতি আর কারো কোনো দাবীদাওয়া নেই। তার মধ্যে একটা ত তুমি হস্তগত করেইচ।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

৺ ২২ অক্টোবর ১৯১৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এখনো প্রয়াগে। কাল দিল্লি যাব। গীতালির প্রুফ

দেখা হয়ে গেছে। অনেক বদল করেছি। কিছু বাদ পড়েছে —ততোধিক বেড়ে গেছে। সম্প্রতি কবিত্বের নেশা খুব জমেছিল— দিল্লি যাত্রায় সেটা ছুট্‌তে পারে।

তুমি যে ইংরিজি তর্জ্জমাগুলো কপি করে নিয়ে গেছ সেগুলো ধাঁ করে ছাপিয়ো না। বিলেতে ওগুলো গেছে। তাছাড়া আমেরিকান দস্যুদের ভয় করি। অসিতের ছবিগুলোর সঙ্গে যেগুলো ছাপাবে আমি নিজে তর্জ্জমা করে দেবে [দেব]।

এতদিনে সবুজপত্রের জন্যে গল্প লিখতে সুরু করেছি। কবে শেষ হবে জানি নে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

* ৮ নভেম্বর ১৯১৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কই, নৌকাডুবি কই? কলিকাতায় আজ রওনা হব অতএব যদি জোড়াসাঁকোয় আস্‌তে পার তবে মোকাবিলা হওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিবার

৬১

জানুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার স্রোতের ফুল-এর সকল পাপড়ি ফোটে নি। কাঁচায় পাকায় মিশল। যে অংশটি ভাল সে খুবই ভাল— কিন্তু যা ভাল নয় তা ভাল যে নয়ই তাতে সন্দেহ নেই— এর কি উপায় করা যায়! অন্তঃপুরের atmosphere খুব চমৎকার জমেছে কিন্তু বাইরের দিকটা খাপছাড়া আছে। নবকিশোর চল্‌বে না। ও রক্তমাংসের মানুষ হয় নি। তোমার গুরুকে তুমি অতিমাত্রায় লঘু করেছ। আমি হলে সমস্ত struggleএর মধ্য দিয়ে ওর মাহাত্ম্য দেখাতে চেষ্টা করতুম। মানুষকে নিতান্ত মাটি করলেই বোঝা যায় তাকে সত্য করা হয় নি। নবকিশোরের বাপকেও তুমি বেশ plausible করতে পার নি। উচিত ছিল ওকে আমাদের ভূপেনবাবু বা বিধুশেখর শাস্ত্রীর মত করা। অর্থাৎ বাইরে আচারের আবরণটা পাকা কিন্তু যখন হৃদয়ের পরিচয় আবশ্যক হয় তখন inconsistently সেটা টেঁকে না। নবকিশোরের বক্তৃতা তার চরিত্রকে একেবারে সমাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাকে অত্যন্তই স্বল্পভাষী করা আবশ্যক— কেজো লোকদের যেমন হওয়া উচিত। মালতীর চরিত্রও বেশ সত্য হয় নি। যদি তোমাকে কাছে পেতুম তাহলে আমি একবার অন্যরাস্তা দিয়ে তোমার কলমটাকে চালিয়ে দিতুম। আমার ত মনে হয় এটা

rewrite করা নিতান্ত দরকার। জিনিষটার মধ্যে যদি কোনো পদার্থ না থাকৃত তাহলে কোনো কথাই কইতুম না— কিন্তু এটার মধ্যে এতটা ভাল আছে যে এ জিনিষ কিছুতে নষ্ট হতে দিতে পারি নে। মুষ্কিল এই যে, তোমার বইয়ের খুড়ি ও গিন্নি চোখের বালির অন্নপূর্ণা ও রাজলক্ষ্মী, বিপিন ও নবকিশোর মহেন্দ্র ও বিহারীর ছাঁচে গড়া হয়েছে— এমন কি মালতীতে বিনোদিনীর আদল খুব আস্‌চে। এটা তোমার একেবারেই কাটিয়ে দিতে হবে। আমার শরীরটা ভাল থাকলে আমি স্থির থাক্‌তে পারতুম না নিজে লেগে যেতুম— কিন্তু সে অসম্ভব। Next best হচ্চে তোমাকে নিকটে বসিয়ে লেখানো— সেও বোধহয় অসম্ভব হবে। অতএব দেখা হলে আরো দু চারবার তোমার সঙ্গে কথা কয়ে যতটুকু সুবিধা হতে পারে সে ছাড়া অন্য উপায় দেখি নে।

আমার কিন্তু মাথাটা ফুটো হাঁড়ির মত একেবারেই অকেজো হয়ে গেছে। ভালই হয়েছে— ছুটি পাওয়া গেল।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬২

জানুয়ারি ১৯১৫

চারু, "শান্তিনিকেতন" গানটি তর্জ্জমা করেছি যদি রামানন্দবাবু পছন্দ করেন তবে ব্যবহার করতে পারেন। এটা যে এখানকার স্কুলের ছেলেদের গাবার গান সেটা বোধ

হয় নোটে বলে দেওয়া আবশ্যক হতে পারে। কলকাতা গেলে দেখা হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩

* ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, দুটো নূতন কবিতা পাঠিয়েছি বোধ করি পেয়েছি [পেয়েছ]। আমি যে ভাবে ছেদ প্রভৃতি দিয়েছি সেই ভাবেই ছাপিয়ো। চল্‌তি ভাষায় লেখা ভাঙা ছন্দ পড়তে পদস্খলন হয় না ত? লেখক স্বয়ং ত দিব্য আরামে পড়তে পারেন— কিন্তু পাঠকের উপরে ভরসা হয় না।

ভবসিন্ধুবাবু পিতৃদেবের যে জীবনী লিখেছেন তার মধ্যে একটি গল্প আছে যে আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোন্ ঘর আমার ইচ্ছামত ভাঙচুর করাতে পিতৃদেব প্রথমে আমাকে ভর্ৎসনা করেন তার পরে আমার অকীর্ত্তি সংশোধন করে দেন, তার পরে আমাকে বাস করবার জন্যে নূতন বাড়ি দেন। যখন সমালোচনা করবে তখন পাঠকদের বোলো আমার নূতন বাড়ির ভিত্তি এই ঘটনার ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তার প্রধান কারণ আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো কিছুই ভাঙি নি, যা কিছু ক্ষণভঙ্গুর তা তিনি নিজেই একরকম ভেঙে শেষ করে গেছেন, উত্তরবংশীয়ের জন্যে অপেক্ষা করেন নি।

অতএব ঐ গল্পটি সংশোধন করা কর্ত্তব্য— তা যদি করা হয় তাহলে শেষাংশটিই বাকি থাকে অর্থাৎ তিনি আমাকে বাসের জন্যে একটা নূতন বাড়ি দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে অনেক পিতাই এমন কাজ করে থাকেন অতএব এই ঘটনা আমার পক্ষে যতই প্রয়োজনীয় হোক মহর্ষির জীবনীর পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। ইতি ২৩ মাঘ ১৩২১

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ পিতামহদের কীর্ত্তির প্রতি কালাপাহাড়ি করা যে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ এই সংবাদটি আমার পাঠকবন্ধুরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করবেন অতএব এই বেলা এই মিথ্যাটাকে সরিয়ে ফেলা কর্ত্তব্য। আমার বিরুদ্ধে সত্যপ্রমাণ যা আছে তাই এত বেশি যে সনাতনীর দলে আমার মুখ দেখাবার জো নেই— তার উপরে আর কেন?

৬৪

অক্টোবর ১৯১০

ওঁ

চারু, চারটি গান পাঠাই— যদি প্রকাশের ভার নাও তবে নামকরণেরও ভার নিতে হবে।

সত্যেন্দ্র দত্তের দুটো কবিতার তর্জ্জমা করে একজন আমার ডেস্কের উপর রেখে গেছে— কোনোমতেই আত্মপরিচয় দিতে চায় না— সেই জন্যেই তার নাম ফাঁস করতে পারলুম না, মনে

দুঃখ রইল। যদি Modern Reviewতে চলে তাহলে অনুবাদকের উৎসাহ বাড়তে পারে।

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল
আশ্বিনেরি আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা
পাগল হাওয়ার গান সে গায়।
মাঠে মাঠে পুলক লাগে
ছায়ানটের নৃত্যরাগে,
শরৎ-রবির সোনার আলো
উদাস হয়ে মিলিয়ে যায়।

কি কথা সে বল্‌তে এল
ভরা ক্ষেতের কানে কানে?
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন
উঠেছে আজ নবীন ধানে?
মেঘে অধীর আকাশ কেন,
ডানা-মেলা গরুড় যেন,
পথভোলা এই পথিক এসে
পথের বেদন আন্‌ল ধরায়॥

—

আমার নিশীথ রাতের বাদল-ধারা !
এসহে গোপনে
আমার স্বপনমাঝে দিশাহারা !
ওগো অন্ধকারের অন্তরধন
দাও ঢেকে মোর পরাণমন,
আমি চাইনে তপন চাইনে তারা,
ওগো নিশীথ রাতের বাদল-ধারা !
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে
নিয়ো গো, নিয়ো গো
আমার ঘুম নিয়ো গো হরণ করে !
আমার একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল সুরের রূপে,
দিয়ো গো, দিয়ো গো
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া,
ওগো নিশীথ রাতের বাদল-ধারা !

—

কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে
তখন তুমি ছিলেনা মোর সনে।
যে কথাটি বলব তোমায় বলে'
কাটল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি সুরের হোমানলে

উঠ্‌ল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে।
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥

ভেবেছিলেম আজ্‌কে সকাল হলে
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে,
পাখীর গানে আকাশ গেল পুরে,
সেই কথাটি লাগ্‌ল না সেই সুরে
যতই প্রয়াস করি পরাণপণে।
তখন তুমি ছিলে আমার সনে॥

—

তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
বলেছে গান গাহিবারে।
ফুলে ফুলে তারায় তারায়
বলেছে সে কোন্‌ ইসারায়,
দিবসরাতির মাঝ-কিনারায়
ধূসর আলোয় অন্ধকারে।
গাইনে কেন কি ক'ব তা;
কেন আমার আকুলতা!
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা,
সুর যে হারায় অকূল পারে॥

তুমি যেতে যেতে গভীর স্রোতে
ডাক দিয়েছ তরী হতে।
ডাক দিয়েছ ঝড় তুফানে
বোবা মেঘের বজ্রগানে,
ডাক দিয়েছ মরণপানে
শ্রাবণ রাতের উতলধারে।
যাইনে কেন জান না কি?
তোমার পানে তুলে আঁখি
কূলের ঘাটে বসে থাকি
পথ কোথা পাই পারাবারে॥

—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫
নভেম্বর ১৯১৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এবারকার সবুজপত্র বেরবার দেরি আছে— অথচ তোমাদের প্রবাসী ত আসন্ন। অতএব শিক্ষার বাহন তোমাদের দিলে সবুজপত্রের প্রতি জুলুম করা হবে— সেও আমার প্রতি জুলুম করবে।

দেবেন্দ্র সেনের তর্জ্জমাটা কানে ভাল ঠেকচে না বলে

পাঠাই নি। আর কিছু একটা যদি হাত দিয়ে বেরয় ত পাঠিয়ে দেব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরেনকে তার প্রুফটা পাঠিয়ো

৬৬

জানুয়ারি ১৯১৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, Sister Niveditaর কাবুলিওয়ালা এবং যদুবাবুর ঘাটের কথা পাঠালে না?

"অহল্যা"র ইংরেজি ভাবানুবাদটি একবার Nationএ বেরিয়েছিল কিন্তু মাজ্‌তে মাজ্‌তে তার এতই বদল হয়ে গেছে যে গোটা দুই তিন লাইন ছাড়া তার আর পূর্ব্বস্মৃতি কিছুই নেই। বোধ হয় এটা Modern Reviewতে বের করলে ক্ষতি হবে না। বাঁকুড়ার Thompson এই তর্জ্জমাটার প্রশংসা করছিলেন—তাই তোমাদের পাঠাচ্ছি।

সুরেনের ফেব্রুয়ারি কিস্তির জীবনস্মৃতি পেয়েছ?

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জানুয়ারি ১৯১৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

নিম্ন ঠিকানায় জীবনস্মৃতির তর্জ্জমাওয়ালা Modern Review পাঠিয়ে দিয়ো। চয়নিকা ২য় সংস্করণের কথা মনে রেখো।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Ernest Rhys Esq
48 West Heath Drive
Hampstead. London

জানুয়ারি সংখ্যা এঁকে আমি পাঠিয়েছি।

W. B. Yeats
18 Woburn Buildings
Upper Woburn. London

৬৮

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ফাল্গুনী সম্বন্ধে সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত মশায়ের একটি প্রবন্ধ তোমাদের বৈঠকে পাঠাচ্ছি। বাহুল্য অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছি। সুরেন্দ্রবাবুর পত্রোত্তরে যে পত্র লিখেছি তার এক অংশ উদ্ধৃত করি :—

ফাল্গুনীটা কোনো এক ফাল্গুনে আমের মঞ্জরীর মত

অকস্মাৎ দক্ষিণ পবনে বিকশিত হয়ে উঠেছিল— তারপরে সেটা মধুকরের গুঞ্জনগান না শুনেই কেবলমাত্র কীটের দংশনে বিমর্ষ হয়ে মাটিতে ঝরে পড়বে, তাতে কোনো ফল ধরবে না, এটা আমার পক্ষে ক্লেশকর। জিনিসটি যে রসাল জাতীয় সেটা আপনি বেশ করে প্রমাণ করেচেন। আপনি ওটাকে প্রদক্ষিণ করে ওর স্বাদগন্ধবর্ণ নানা দিক থেকে যাচাই করে দেখেচেন এই আনন্দের ইতিহাসটুকু কোনো এক মাসিক পত্রের সভঃপাতী পত্রে পুষ্পরেণুর মত কিছুক্ষণের জন্যও সংলগ্ন হয়ে থাক্ না। যদি চ এক মধুপের গুঞ্জনেই বসন্তের আসর জমে না, কিন্তু আমার পোড়াকপালে ফাল্গুনও জ্যৈষ্ঠের মত রুদ্রমূর্তি ধরে ওঠে; অতএব কোনো একটা দুঃসাহসিক দক্ষিণ হাওয়ার একটু দাক্ষিণ্যও যদি পাই তবে সেইটুকুকেই সঞ্চয় করে নিয়ে এবারকার বসন্তলীলা চুকিয়ে যেতে চাই। —সবুজপত্রে আমার সম্বন্ধে আলোচনায় সঙ্কোচ বোধ করি— ভারতীতেও প্রায় তদ্রূপ। প্রবাসী আমার প্রতি প্রতিকূল নন, অতএব আমার কাব্যসমালোচন ওঁরই সভাপ্রান্তে আসন যদি পায় সেটা অশোভন হয় না। অতএব প্রবাসীর দরবারে আমি আমার দরখাস্ত পেশ করব। ইতি—

এই প্রবন্ধটি যদি গ্রাহ্য হয় তবে চৈত্রেই যেন বাহির হয়। যদি গ্রাহ্য না হয় এবং চৈত্রেই যদি বাহির না হয় তবে মণিলালের হাতে দিতে বিলম্ব কোরো না। কারণ এক চৈত্রে ফাল্গুনী সবুজপত্রে বেরিয়েছিল, আর এক চৈত্রে যদি তার ব্যাখ্যা

বের হয় তাহলেই বা দোষ কি? ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩২২

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈত্রের প্রবাসীর জন্যে গোটা দুয়েক কবিতা এইসঙ্গেই পাঠাচ্চি।

আমার মনের জান্‌লাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে
তোমার মনের দিকে।
সকালবেলার আলোয় আমি সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।
দেখ্‌তে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে নাম ধরে
সে নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।

আমার সুরের পর্দ্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে
তোমার গানের পানে।
সকালবেলার আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
ভরা আমার গানে।
মনে হল আমারি প্রাণ
তোমার বিশ্বে তুলেছে তান,

আপন গানের সুরগুলি সেই তোমার চরণমূলে
নেব আমি শিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে॥

২১ চৈত্র ১৩২১
সুরুল

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।

সেইমত আজি মোর প্রভাতের আনন্দ-স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্তকাননে
কোনো এক কোণে
একবেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি'
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

২৬ পৌষ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৬৯

* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

"You are my friend in all difficulty and doubt and companion in the darkest passage of life."

৭০

* ৮ এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, ক্ষিতিমোহনবাবুকে মোক্তার করে আমার কাছ থেকে একটি গানের জন্যে দরবার করেচ। আমার দরবারে মোক্তারের প্রয়োজন একেবারে নেই সে তুমি জান। কিন্তু আমার ভাণ্ডার যে শূন্য। গান আমার হাতে দু চারটে আছে বটে কিন্তু তোমাদের কাগজের পক্ষে এমন গান চাই যা গাবার এবং পড়বার দুই ক্ষেত্রেই উভচরবৃত্তি করতে পারে— যা সুরের ঘরে পিসি এবং কাব্যের ঘরে মাসির মত। তেমন ত খুঁজে পাই নে। ধন্না দিয়ে পড়ে থেকে একটা আদায় করেচে মণিলাল— আর একটা যেটা কিঞ্চিৎ চলনসই গোছের আছে পাঠালুম। পয়লা বৈশাখে কি দর্শন দিতে পারবে? রামানন্দ-বাবু এখানে একসময়ে আসবার ঈষৎ আভাস দিয়েচেন— তিনি এলে খুসি হব, অনেক কথা আলোচনা করবার আছে। আমেরিকায় Lynchingর কয়েকটা সাক্ষ্যপ্রমাণ কাল তাঁর কাছে ডাকে পাঠিয়েচি পেয়েচেন বোধ হয়— তাঁর Notes-এর,

মশানে এই দুষ্কৃতির বিবরণগুলিকে শূলে চড়ানো চাই।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চির-আমি

(বাউলের সুর)

যখন পড়্‌বেনা মোর পায়ের চিহ্ন
এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়া তরী
এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচাকেনা,
মিটিয়ে দেব লেনাদেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা
এই হাটে,
আমায় তখন নাই বা মনে রাখ্‌লে !
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে।

যখন জম্‌বে ধূলা তানপুরাটার
তারগুলায়
কাঁটালতা উঠ্‌বে ঘরের
দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান, ঘন ঘাসের

পরবে সজ্জা বনবাসের,
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির
ধারগুলায়
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে !
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে ।

তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশী
এই নাটে,
কাট্‌বে গো দিন, যেমন আজো
দিন কাটে ।
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী
এমনি সেদিন উঠবে ভরি,
চরবে গোরু, খেল্‌বে রাখাল
এই মাঠে ।
তখন আমায় নাই বা মনে রাখ্‌লে !
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে ।

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে
নেই আমি !
সকল খেলায় করবে খেলা
এই-আমি ।

নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আস্‌ব যাব চিরদিনের
সেই-আমি।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে!
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১
১ জুন ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি cutting পাঠিয়েছ আমার আশঙ্কা হচ্চে ওর মধ্যে সত্য আছে। আমাদের কর্ম্মচারীদের ওটা পাঠিয়ে দিয়েছি— যদি অন্যায় ঘটে থাকে তাহলে প্রতিকার করা হবে সন্দেহ নেই। লেখক যদি আমাকে পত্রযোগে সংবাদ দিতেন তাহলে যথাসময়েই সদুপায় হতে পারত।

Rothensteinকে চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে একটা পোলিটিক্যাল প্রবন্ধ লেখা হয়ে গিয়েছিল— এণ্ডুজ সেইটে কপি করে মডারন রিভিয়ুর জন্যে রামানন্দবাবুকে পাঠিয়েচেন। কিন্তু সেটা প্রকাশযোগ্য কি না আমার সন্দেহ আছে। রামানন্দবাবুকে বিচার করে দেখ্‌তে বোলো। ওটা কাগজে

বের করা হবে মনে করে লিখি নি। ওটা যদি ছাপা না হয় আমি তাতে লেশমাত্র ক্ষুব্ধ হব না।

Anatole Franceএর *White Stone* বই থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে তোমাদের কাগজে ছাপবার জন্যে এণ্ড্রুজকে লিখ্‌তে বলেছিলুম—বোধ হয় লিখেচেন। জিনিসটা অত্যন্ত উপাদেয়। ওটা তোমাদের Gleanings বা আর কোনো বিভাগে দিলে লোকের ভালই লাগ্‌বে। ইতি ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২

৬ জুন ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কিছুদিনের জন্যে তুমি আস্‌তে পারলে বেশ খুসি হই। আমার সেই বালিকা বন্ধুটি এখানে এসে জুটেচে, আমার দিন বেশ কাটচে।

ছাপাখানাটাকে খাড়া করা গেছে। একজন লোকের দরকার যিনি বলে দিতে পারেন কি কি জিনিসের প্রয়োজন এবং তার খরচ কত। সুকুমারের ভাই শুনেচি ওস্তাদ। কিন্তু বড় ওস্তাদ না হলেও চল্‌বে—একজন লোক যাঁর ছাপাখানা চালাবার অভিজ্ঞতা আছে যিনি দরদস্তুর ও

আইনকানুন জানেন এমন কাউকে দিন দুয়েকের জন্যে কি পাওয়া যায় না। হয় ত তুমিই বলতে পার কিন্তু তোমার কি অবকাশ হবে? যাই হোক এ সম্বন্ধে পরামর্শ ও সহায়তা চাই। ইতি ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩

*১০ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমরা প্রবাসীতে সবুজপত্র থেকে "কালো মেয়ে" কবিতাটি যদি তুলে দাও তাহলে দুটি সংশোধনের প্রতি মন দিয়ো— যথা,—

১৬২ পাতার অষ্টম লাইন

"সমস্ত পরিবারের নিত্য মনস্তাপ" না হয়ে হবে

"সমস্ত এই পরিবারের নিত্য মনস্তাপ।"

১৬৫ পাতার ৪র্থ লাইন—

"যেমনতর ওর ঐ ভাঙা জানলাখানি।"

না হয়ে হবে

"যেমনতর ওর ভাঙা ঐ জানলাখানি।"

আজকাল ইস্কুলমাষ্টারির কাজে ব্যস্ত আছি।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪

৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

যে দুটি কবিতার প্রুফ পাঠাইয়াছ দুটিই *Lover's Gift*এ বাহির হইয়াছে।

ইস্কুলমাষ্টারিতে তলাইয়া গেছি— সরস্বতীর পদ্ম এখান হইতে অনেক উর্দ্ধে— অতএব অলমতিবিস্তরেণ। ইতি ২১ ভাদ্র ১৩২৫

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫

২৮ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, তোমার বই আমার হাতে পৌঁচেছে, পড়েওচি, ইচ্ছা ছিল মোকাবিলায় তন্ন তন্ন করে ঐ বই সম্বন্ধে আমার মৌখিক রায় জানাব— কারণ বিস্তর কথা— সব কথা লেখবার মত আমার শক্তি নেই। কলকাতায় থাকতে তোমার সঙ্গে দেখা হল না। যদি কখনো অবসরমত একখানা বই হাতে এখানে এই ছুটির মধ্যে একদিনের জন্যে আসৃতে পার তাহলে আমার মন্তব্য সুস্পষ্ট করে বলব। ইতি ১১ কার্ত্তিক ১৩২৫

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নভেম্বর ১৯১৮]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

একটি শিক্ষকের আশু প্রয়োজন। প্রধান কাজ বাংলা পড়ানো। আমাদের এখানে আমারই রচিত গ্রন্থ পাঠ্য নির্ব্বাচিত হয়েচে; তার কারণ এখানে নির্ব্বাচন সমিতিতে দীনেশবাবু প্রভৃতি বাংলাভাষার সমজদার কেউ নেই। এখন, এমন লোকের দরকার যিনি দীনেশবাবুদের এলাকায় বাস করেন না, যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমক খান না। খুব বেশি অর্থ দাবী করলে কষ্ট পাব— কিন্তু আদরের ত্রুটি হবেনা— এখানে বিশ্বভারতীতে পাঠের সব সুযোগই পাবেন— আর যদি গলা থাকে তাহলে গানও শিখ্‌তে পারবেন, আর যদি নাও থাকে তাহলে মাঝে মাঝে উপদ্রব সহ্য করবার চেষ্টা করব। একটু সংস্কৃতের অনুস্বার বিসর্গের যদি দূর সম্পর্কও থাকে তাহলে ভাল। কেননা, নইলে ষত্বণত্ব জ্ঞানহীন আমাদের মত আনাড়ির পক্ষে অধ্যাপনাটা স্পর্দ্ধার বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি তোমার মনে হয় যে লোকটি রসিক এবং উৎসাহী তাহলে অসংস্কৃতভাবেই তাঁকে নিতে পারব। মোদ্দা কথা, তাঁকে বিশ্বভারতীর ক্লাসে ভর্ত্তি হতেই হবে, এর অন্যথা হলে চল্‌বেনা। একটু মনোযোগ কোরো। দরকার আছে। নেপালবাবু আশ্রম ত্যাগ করচেন।

ইংরেজি ভাষায় ম্যাট্রিক্যুলেশনের খেয়া পারাপারে মজবুৎ কাউকে তোমার জানা আছে কি ?

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭

১৭ মে ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গল পড়ে নোট্ করে রেখেচি। এক কপি মনসামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল যদি পাঠাতে পার তাহলে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমার যা-কিছু বক্তব্য আছে জানতে পারবে। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮

২১ জুলাই ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

Letters from an Onlooker-এর আলাদা কপি কি এখনো ছাপা হয় নি ? আমি বিলাতের বন্ধুদের পাঠাতে চাই।

"ঘোড়ার পরীক্ষা" মডার্ণ্ রিভিউর জন্যে পাঠালুম।

শান্তিনিকেতন পত্রে কোন কোন প্রবন্ধে মৌলিন্য কথাটা ব্যবহার করেচি সেটা চল্‌বেনা। তার স্থানে স্বমূলকতা কি চলে? নেহাৎ না হয় ত মৌলিকতা বসিয়ে দিয়ো অর্থাৎ যখন প্রবাসীতে উদ্ধৃত করবে।

পনেরই শ্রাবণে কলকাতায় যাব দিনদুয়েক থাকব। ইতি
৫ শ্রাবণ

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯
*৩০ জুলাই ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কাল সন্ধ্যার সময় কলকাতায় পৌঁছব—সোমবারে সকালে ফিরব—ইতিমধ্যে তোমরা আমার সঙ্গে দেখা কোরো। ইতি বুধবার

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০
২৭ নভেম্বর ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শোনা গেল জগদানন্দ সম্পাদকী দরবার থেকে তোমার

উপর পত্র জারি করেচেন, তাতে তুমি বিচলিত হোয়ো না। আমাদের শান্তিনিকেতন পত্রের খিড়কির দরজা জগদানন্দের সভায় আর তার সদর দরজা না হয় প্রবাসী আপিসে রইল তাতে ক্ষতি কি? আমাদের পত্র যোগে আমরা নাম করতেও চাই নে গ্রাহক বাড়াতেও চাই নি, অথচ এখানে যে আয়োজন হচ্চে বাইরে যদি তার ব্যবহার চলে তাহলে তাতে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু নেই। একজন ছাত্র শান্তিনিকেতনের লেখাগুলি প্রবাসীতে পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছে এবং উপকৃতও হয়েচে—সেই বার্ত্তাটি জানিয়ে সে আমাকে পত্র লিখেচে—তাই আমার এই কথাগুলি মনে এল।

তোমাকে একটা গল্পের প্লট শিলঙ থেকে পাঠিয়েছিলুম, পেয়েচ ত? কাজে লাগ্‌বে কি? কিন্তু গল্পে কি কোনো প্লটের বিশেষ দরকার আছে? যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় এবং যদি ততদিনে মনে থাকে তবে সেই প্লটটা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

তুমি একবার সশরীরে সুরেনের আপিসে গিয়ে "গোরা" তর্জ্জমা সম্বন্ধে তার অভিপ্রায় জেনে নিয়ো। তার কাছ থেকে চিঠির জবাব পাওয়া দুর্লভ। ইতি ১১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

১৯ জানুয়ারি ১৯২০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার সেই "কথিকা"গুলো তোমরা অনেককাল হল শুনেচ—নতুন কিছুই নয়। বিজয়বাবু আমার মুখে সেগুলো নতুন শুনে বিচলিত হয়েচেন। কিন্তু ছাপার অক্ষরে পড়লে হয়ত তত অপূর্ব্ব বোধ হবেনা। এগুলো কোনো বিশেষ প্রণালীতে বা বিশেষ সমারোহে বের করতে আমি লজ্জা বোধ করি। জান ত আমি বিশেষ অভ্যর্থনা সইতে পারি নে। আমার এই লেখাগুলো এখনো ছাপাবার জন্যে মনে তাগিদ আস্‌চেনা। এত বেশি লেখা লিখেচি যে আজকাল অপ্রকাশের শান্তির জন্যে আমার মন উৎসুক।

প্রবাসীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উদ্ধৃত আমার অনেকগুলি প্রবন্ধ পড়ে অধ্যাপক এণ্ডার্সন কেম্ব্রিজ হতে খুসি হয়ে আমাকে পত্র লিখেচেন, অনুবাদ-চর্চ্চা প্রভৃতি লেখা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও করেচেন। তোমাদের ঐ সংখ্যা সম্বন্ধে আরো অনেকগুলি সকৃতজ্ঞ পত্র পেয়ে আনন্দ বোধ করেচি। ইতি ৫ই মাঘ ১৩২৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

৫ মার্চ ১৯২০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গল্প লেখবার মত মেজাজও নেই সময়ও নেই। মনে হয় ও পাঠ উঠে গেছে— এখন ইচ্ছা করলেও আর লিখ্‌তে পারব না। তবে এক কাজ করতে পারি। আমার কথিকার ছোট ছোট গল্প— সে নিতান্তই গল্পস্বল্প— দু চারটে দিতে পারি। কিন্তু যারা ক্ষুধার খাওয়া চায় তাদের পেট ভরবে না, ওতে বস্তু অংশ নেই—যারা কিঞ্চিৎ রসগ্রহণ করে খুসি থাক্‌তে চায় তাদের ওতে একটুখানি তৃপ্তি দিতে পারে। তুমি যদি নিজে গল্প লিখ্‌তে চাও আমি বরঞ্চ ভেবে চিন্তে প্লট্‌ দিতে পারি কিন্তু আজকাল তাও আমার মাথায় সহজে আসে না। বোধ হচ্চে আমার মানসিক উন্নতি হচ্চে— আমি সাহিত্যে গল্পের ক্লাস থেকে হয় ত বা লোকশিক্ষার ক্লাসে উত্তীর্ণ হব-হব করচি। তাহলে মরবার পূর্ব্বে আমার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জোগাড় করে যেতে পারব। কিন্তু তাতে মস্ত একটা ভয়ের কথা এই যে, পুণ্যফলে হয় ত বাংলা দেশে অধ্যাপকরূপে আমার পুনর্জ্জন্ম ঘটবে— সেইটে এড়াতে চাই। ইতি ২২ ফাল্গুন ১৩২৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৩

[জুলাই ১৯২২]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সত্যেন্দ্রের নামে এই কবিতাটি তার স্মৃতিসভায় পড়বার জন্যেই লিখেছিলুম তাই তোমাদের পাঠাই নেই [নি]। তোমার তাগিদ পেয়ে পাঠালুম— কিন্তু গোপন রেখো— বন্ধুমহলেও কাউকে দেখিয়ো না। আগামী ৯ই তারিখে জোড়াসাঁকোয় আমার সন্ধান করলে পাবে। সেই সময়ে প্রুফটা একবার দেখিয়ে নিয়ো।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪

[৮ জুলাই ১৯২২]

ওঁ

কলিকাতা

অয়মহং ভো

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫

* ১০ মে ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, ছুটিতেও কি তোমার দেখা পাওয়া যাবেনা। একবার

১৪॥৭

এসে কিছু আলাপ আলোচনা করে যাও না। আপাতত আমি চলৎশক্তিরহিত— ভাগ্যক্রমে এখনো বলৎশক্তি আছে। কিছুকাল পরেই আর একবার য়ুরোপে পাড়ি দেব।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৮৬

[জুলাই ১৯২৫]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চারু, বর্ষায় ফাল্গুনের আবাহন হবে, তার জন্য কোন কৈফিয়তের দরকার ছিল না। তবু পাঠাচ্ছি।

ফাল্গুনী নাটকের সূচনা অংশে—একেবারে শেষভাগে রাজাকে যখন কবি বসন্তোৎসবের আনন্দে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করবেন, রাজা তখন প্রশ্ন করবেন—

রাজা—কবি তুমি যে এই ভরা বাদলের মাঝখানে ফাল্গুনের তলব করে বসলে, এ তোমার কি রকম ক্ষ্যাপামি?

কবি—এ ক্ষ্যাপামি শিখেছি সেই ক্ষ্যাপার কাছ থেকে যিনি জ্যৈষ্ঠের হোমহুতাশনের ভরা দাহনের মধ্যে সজলজলদ-স্নিগ্ধকান্ত আষাঢ়ের অভিষেক-উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র জারি করে' বসেন কদম্বের নবকিশলয়ে। যিনি পাতা ঝরা উত্তুরে হাওয়ার সুর এক মুহূর্তে ফিরিয়ে দিয়ে বনসভায় দক্ষিণ হাওয়ার আসর

জমিয়ে তোলেন। বর্ষার শিঙাখানা কেড়ে নিয়ে তাতেই যদি বসন্তের বাঁশী বাজিয়ে তুলতে না পারি তবে আমি কবি কিসের?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭

২১ ডিসেম্বর ১৯২৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চারু, তোমাদের ওখানে যাওয়া স্থির করেছি। প্রথমে ভেবেছিলেম ডিসেম্বরের মধ্যেই যাত্রা করব কিন্তু তোমাদের তখন কলেজ বন্ধ থাকবে শুনে জানুয়ারির শেষভাগেই যাবার সঙ্কল্প করচি। রমেশ তাঁর বাসায় আমাকে আশ্রয় দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তোমাদের পাড়াতেই নাৎনী সম্পর্কীয় আত্মীয়া আছে বলে রমেশকে কথা দিতে সাহস করছি নে। যাহোক স্থানকালে উপস্থিতমত এর মীমাংসা হতে পারবে।

আমার জন্যে অভ্যর্থনার বিরাট পর্ব্ব করলে সইবে না, তাহলে শান্তিপর্ব্ব ডিঙিয়ে একেবারে স্বর্গারোহণপর্ব্ব এগিয়ে আসবে।

আমার সঙ্গে কালীমোহন যাবেন—আর ভাবছি নন্দলালকেও নেব—হয় ত আমাদের মুসলমান অধ্যাপক জিয়াউদ্দীনও যেতে পারেন। রথীরও যাবার ইচ্ছা আছে।

অতএব সেখানে গিয়ে আমরা শান্তিনিকেতন পঞ্চায়েৎ বসাতে পারব। ইতি ৬ই পৌষ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৮

॥ ৩/৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ঢাকার সাধারণের তরফ থেকে দুই ভদ্রলোক দূত স্বরূপে এসে বিশেষভাবে ঢাকার আতিথ্যের জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে আমি তোমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অতিথি— তার পরে অন্যত্র নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছি। এই জন্য বাধ্য হয়ে তিনদিন পূর্ব্বে ঢাকায় গিয়ে সেখানে জনসাধারণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। ক্ষণকালের জন্য তিল মাত্রও সন্দেহ হয় নি যে এতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কিছু মাত্র ক্ষোভের কারণ হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার প্রতিশ্রুতি আমি সর্ব্বাংশেই রক্ষা করতে প্রস্তুত আছি। ১০ই থেকে ১৪ই পর্য্যন্ত রমেশের বাড়িতে থাকব সে সম্বন্ধেও কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি। এ স্থলে ঢাকার সাধারণের তরফে যাঁরা আমাকে অভ্যর্থনা করবার প্রস্তাব করেছেন তাঁদের প্রত্যাখ্যান করা কি আমার কর্ত্তব্য হতে পারে? বিশেষত ঢাকার, এমন কি, পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে এই

আমার প্রথম পরিচয়। এঁদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করি এমন স্পর্দ্ধা আমার পক্ষে একান্ত অসঙ্গত হত। রমেশের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে বসে আছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারচিনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৯

১৩ মার্চ ১৯২৭

SANTI-NIKETAN
BENGAL, INDIA

তোমার ফরমাস মতো দোলের কবিতা লিখে অমিয়কে দিয়ে নকল করিয়ে পাঠালুম। কিন্তু মনে রেখো এই কবিতাটিকে ছাপাখানার মসীবন্ধনে বন্দী করবার অধিকার তোমাদের দিচ্চি নে—আবৃত্তিসভায় এর অবগুণ্ঠন মোচন করতে পারো এই পর্য্যন্ত তোমাদের শাসনের সীমা।

"সাগরকূলে" শব্দের অর্থ হচ্চে জীবন সমুদ্রের বা হৃদয় সমুদ্রের কূল,— দূর প্রান্ত,— সেইখানে নিভৃতে দেবতা সংসার কর্ম্মক্ষেত্রের বাইরে সুপ্ত থাকতেও পারেন—হঠাৎ কোনো পূজারী আপন পূজার দ্বারা তাঁকে আবিষ্কার করেন, জাগ্রত করেন।

ডান হাতের মধ্যমাঙ্গুলির প্রতি হঠাৎ দুর্দ্দৈবের দৃষ্টি পড়াতে সেটা অপঘাতে কিছু দিন পঙ্গু হয়ে আছে। লেখা দুঃখকর।

অতএব আমার এই ক্ষত অঙ্গুলির উপহারটুকুর মধ্যে কিছু বেদনাও রইল।

রমেশ ও তাঁর গৃহিণীকে আমার সস্নেহ অভিবাদন জানিয়ো এবং তুমিও সপরিজনে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ২৯ ফাল্গুন ১৩৩৩

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০

৫ মে ১৯২৭

VISVA-BHARATI

SANTI-NIKETAN, BENGAL

কলিকাতা

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু তুমি যে লাইনটা আমার তথাকথিত রচনাবলী থেকে উদ্ধার করে পাঠিয়েচ তার অর্থ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। একটু প্রণিধান করে দেখ্‌লেই বুঝবে রচনাটা আমার নয়, আমার যে কৌতুকপ্রিয় দুষ্টগ্রহ মুদ্রাকরের কর পরিচালন করে থাকেন তাঁরই। তাঁর অনেক কীর্ত্তিই আমার গ্রন্থকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। অনেক পরাশ্রিত জীব অতিকায় তিমির কলেবরে সংসক্ত হয়ে তাকে শোষণ করে থাকে, তারা উক্ত তিমির বিধিদত্ত অঙ্গ নয়, গ্রহদত্ত আনুষঙ্গিক।

যে মানুষ মস্ত বাড়ি পেয়েছে অথচ যার ঝাঁড় দেবার ফরাস বেশি নেই লেখা সম্বন্ধে আমার সেই দশা— আস্‌বাবের চেয়ে আবর্জ্জনা বেশি হয়ে ওঠে।

যাই হোক, ঐ লাইনটার বিশুদ্ধ আদিপুরুষ সম্প্রতি কোন্ প্রেতলোকে বাস করেন তাও আমি জানি নে। যে-ছাত্রদের তুমি পড়াবে তাদের তুমি সন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত করাতে পারো। এই দুঃসাধ্য গবেষণার কাজ আমার দ্বারা ঘটে উঠবেনা— আমি সামান্য কবি মাত্র, প্রত্নতত্ত্ববিৎ নই। কাল যাচ্চি শিলঙ পর্ব্বতে Uplands নামক কুটীরে। ইতি ২২ বৈশাখ ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১

৯ মে ১৯২৭

Uplands, Shillong.

কল্যাণীয়েষু

"সমস্যা" লেখাটা সাম্‌নে নিয়ে আগাগোড়া মিলিয়ে অসঙ্গতির ফাটলের মধ্যে থেকে একটা কোনো অর্থ বের করবার চেষ্টা করব। ঝোঁকের মাথায় কোন্ অর্থে কোন্ শব্দটা ব্যবহার করেচি সব সময়ে পরে তা মনে থাকে না— হয়তো সেই রকমের একটা তাড়াহুড়োর উত্তেজনায় শব্দেতে ভাবেতে

জট৷ পাকিয়ে গেছে, কোথাও যে গাঁঠ পড়েছে তখন তা জান্‌তেও পারি নি। ওটা যদি মুদ্রাকরের মুদ্রাদোষবশত না হয়ে থাকে তাহলে অনবধানের অপরাধ স্বীকার ক'রে শোধনের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। মুদ্রাকরে গ্রন্থকারে মিলে গ্রন্থাবলীর পাতায় পাতায় প্রমাদ যা বিকীর্ণ করা গেছে তার পরিমাণ বড় কম হবে না।

কোনো ভালো অভিধান দেখো তো, বেতস বল্‌তে বাঁশও হয়, এমন সাক্ষ্য পেয়েছি। কবিতা যখন লিখেছিলেম তখন খাগ্‌ড়ার কথা ভেবেছি— শরেতে যে ভদ্ররকম বাঁশি হয় তা নয় কিন্তু ওর মর্ম্মস্থানের ফাঁকটুকুতে নিঃশ্বাস সঞ্চার করে সুর বের করা যায় বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু যখন দেখা গেল বেতস বলতে শর বোঝায় না এবং অর্থমালার সর্ব্বপ্রান্তে বেণু কথাটা পাওয়া গেল তখন বাগর্থের দ্বন্দ্ব মিটল দেখে নিশ্চিন্ত হয়েচি। তুমি কোন্ কৃপণ অভিধানের দোহাই দিয়ে আবার ঝগ্‌ড়া তুলতে চাও ?

এখানে আছি ভালো। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯২

১৫ মে ১৯২৭

Uplands, Shillong.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। তুমি কি মনে করনা, নিছক খ্যাতি লাভের মধ্যে অগৌরব আছে? রচনা শুধু যে অনেকে বুঝবেনা তা নয় অনেকে তাকে নিন্দা করবে এও কবির পুরস্কারের অঙ্গ। যতীন্দ্র সিংহ যদি আমাকে প্রশংসা করতেন সে কি আমার পক্ষে ভাবনার কারণ হত না? পৃথিবীর সব ভালো জিনিষের মতোই ভালো লাগ্‌বার শক্তিও দুর্লভ— বিধাতা তাকে হরির লুঠের বাতাসার মতো নেহাৎ শস্তা করেন নি ভালোই করেছেন। অতএব যারা কবির নিন্দা করে তাদের কৃপা কোরো, তাদের উপর রাগ কোরোনা। যে কবির কাব্যে কলঙ্ক আরোপ করলে তাকে নিষ্প্রভ করা হয়, তার প্রভা ক্ষীণ। বস্তুত নিন্দাটা হচ্চে পরখ করবার প্রণালী, খাঁটি জিনিষকে বাজিয়ে দেখা। তাকে মারলে দোষ নেই যাকে মারলেও মরে না— বস্তুত যা অল্পপ্রাণ তাকেই যেন আমরা দয়া করে নিন্দা না করি। এই কারণেই সংসারে বিধাতার নিষ্ঠুরতা তাদেরই পরে যারা শক্তিমান— তারা অযোগ্যের হাতে মার খেতে জন্মেচে। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

২ জুন ১৯২৭

Shillong.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এতদিন পরে সঙ্কলন বইখানা হাতে এসে পৌঁচেছে। প'ড়ে দেখ্‌লুম— স্পষ্টই দেখা যাচ্চে— একটা কর্ত্তৃপদের স্খলন হয়ে বাক্যটা অর্থচ্যুত হয়েচে। সম্পূর্ণ বাক্যটা এই রকম হওয়া উচিত: "আত্মীয়তার সম্বন্ধ কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি।" কবে কোথায় এই প্রধান পদটি পড়ে গেছে আমি তা বলতে পারি নে। আমার বিপুল রচনামণ্ডলের মধ্যে কোথায় যে কি রকম অপঘাত ঘটচে তা আমার চোখেও পড়েনা। আমার সৃষ্টির কাজ করে দিয়ে আমি তো খালাষ, তারপরে গ্রহ উপগ্রহরা তাদের মধ্যে কোথায় কোন্ ছিদ্র খনন করচে কিছুই জানিনে, ভাবীকালের পুরাতত্ত্ববিদের গবেষণা কাজের বিস্তর খোরাক দিয়ে যাবো বলে মনে হচ্চে।

বহুকাল পরে একটা উপন্যাস লিখ্‌তে লেগেছি। আয়তনটা বোধ হয় ছোটো হবেনা। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৪

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

VISVA-BHARATI
10, CORNWALLIS STREET
Calcutta, ১৭ সেপ্টেম্বর 1927

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, সময় ত আমার মুহূর্ত্তমাত্র নেই। তুমি আমাকে যে অনুরোধ করেচ তা পালন করতে হলে আমাকে একখানা বড় গোছের বই লিখ্‌তে হয়। আশ্রমে আমি কিছুকাল পঞ্চভূত পড়িয়েচি তাতেই জানি ওর মধ্যে অনেক গ্রন্থি আছে যা মোচন করে সকলের পক্ষে সুগম করতে অনেক বাক্য ও চিন্তা ব্যয় করা দরকার। শুনেচি ক্ষিতিমোহনবাবু ঐ বইগুলি অধ্যাপনার ভার নিয়েছিলেন। পূজার ছুটির সময় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলে কাজে দেখবে।

চয়নিকায় ছাপার ভুল মারাত্মক। এক কপি সংশোধন করে প্রশান্তকে দিয়েচি—সেইটে দেখে তোমার নিজের বই যদি শুধরে না নাও তাহলে আমার কবিতার দুর্ব্বোধ্যতার অপবাদ তোমার মনেও বদ্ধমূল হবে।

আমার বিদায় অভিবাদন।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৫

১৯ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার নিজের মনে হয় Selection জাতীয় বইয়ের সাদাসিধে নাম দেওয়া ভালো। এমন দিন গেছে যখন তর্ক-শাস্ত্রেরও কুসুমাঞ্জলি নামে আপত্তি ছিল না—এখন আভরণ ব্যবহারের যুগ চলে গেছে—কুণ্ডল কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণ মেয়েরাও ত্যাগ করতে উদ্যত। সহজ নামটাই দিয়ো যথা

"সত্যেন্দ্রনাথের
কাব্যসঞ্চয়ন"

অথবা

"কাব্যসঞ্চয়ন"
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
রচনা হইতে)

এ অঞ্চলে যাতায়াত একেবারে ছেড়ে দিয়েচ না কি? ঢাকা সহরের নাম সার্থক দেখচি। খৃষ্টমাসের ছুটিতে দেখা দিয়ে গেলে দোষ কি? ইতি ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

২৮ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, সময় অল্প, সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দেব। যে মানুষ না চায় তাকে কেউ কিছু দিতে পারেনা, দিলে দান বিফল হয়। চাওয়া এবং দেওয়া একটা চক্র, পরস্পরের যোগে পরস্পর সম্পূর্ণ। তুমি তোমার ছাত্রের কল্যাণার্থী, একান্ত মনেই চাও যে তার শিক্ষা সার্থক হয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছার পথ বন্ধ, সে যদি না চায়। আমাদের দেশে গুরুভক্তির অর্থই তাই। গুরুর নিজের জন্যে ভক্তির প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাঁর দান-ক্রিয়ার জন্যে তার প্রয়োজন আছে,— ভক্তির দ্বারা গুরুর কাছে ছাত্র আপন দাবীকে সত্য করে— তখন গুরুর কল্যাণ ইচ্ছার বাধা দূর হয়। পাওয়ার জন্যেই পাওয়ার বাধার মুল্য আছে। বাধা দূর করতে গিয়ে পাওয়ার শক্তি সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তীর্থে পৌঁছনোর সার্থকতা তীর্থে যাত্রার কৃচ্ছ্রতার দ্বারাই পরিপূর্ণ। দেবতাকে না পাওয়াটাই দেবতাকে পাওয়ার ভূমিকা, মাঝে থাকে প্রার্থনা। যেটাকে পেয়েই আছি সেটাকে আমরা সব চেয়ে কম পাই। এই জন্যে ভগবান যদিচ নিজেকে দিয়েই রেখেচেন— তবু চেয়ে পাওয়ার দুঃখের ভিতর দিয়ে পাওয়ার আনন্দকে প্রগাঢ় করতে হবে। বস্তুত তাঁকে না পাওয়াটা মায়া, ঐটে লীলা— যিনি আছেন তিনি নেই হয়ে খেলা করেন, যিনি দিয়েচেন তিনি দেন নি বলে ফাঁকি দেন। বাহ্য বিষয়েও

তাই, জ্ঞানের বিষয়েও তাই। চাষ করে মানুষ অন্ন পেয়েচে বলে তার সেই পাওয়া পশুর পাওয়ার চেয়ে বড়ো। পশুর জ্ঞান সহজবোধের সীমার বাইরে বেশি দূর যায় না, মানুষের জ্ঞান সাধনা-সাধ্য জ্ঞান। সে জ্ঞান যে হেতু অসাধ্য নয় সেই হেতু সেটা পেয়েইচি, যে হেতু সাধনার অপেক্ষী সেই হেতু সেটা পাই নি। এই না পাওয়ার বাধার ভিতর দিয়ে মানুষের পাওয়ার গৌরব। ভগবানকে পাওয়া সম্বন্ধে সেই একই কথা—তাঁকে পাওয়ার সাধনার দ্বারাই পাওয়ার যোগ্যতাগৌরবে মানুষ বড় হয়ে ওঠে। বড়ো না হয়ে উঠে কেউ বড়োকে পেতেই পারে না। অঞ্জলির মধ্যে সরোবরের জল তুলে নিতে পারো না। আকাশ থেকে ধারা বর্ষণ হচ্চে, তোমার কাজ হচ্চে জলাশয় তৈরি করা— অর্থাৎ আকাশের জলকে নিজের বিশেষ চেষ্টার দ্বারা নিজের জল করে নেওয়া— প্রার্থনার দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সেই জলাশয়কে বড়ো করা, গভীর করা হয়।

প্রার্থনা অনেক শ্রেণীর আছে। ধন প্রার্থনা, মান প্রার্থনা, বিদ্যা প্রার্থনা, পরীক্ষায় পাস করা প্রার্থনা। এ সমস্ত প্রার্থনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি— বিশ্বব্যাপারের নিয়মের সঙ্গে নিজের যথার্থ ইচ্ছার যোজনার দ্বারাই এরা সফল হয়। অর্থাৎ বিশ্বশক্তির সঙ্গে আত্মশক্তির মিলন ঘটানো আবশ্যক। পর্ব্বত লঙ্ঘন করতে চাও, ঠিক পথে শক্তি প্রয়োগ করো। কিন্তু স্বয়ং ভগবানকে প্রার্থনা— প্রেমকে প্রেমের দ্বারাই চাওয়া— মানব সংসারেই হোক্ আর অধ্যাত্মলোকেই হোক প্রেমের আত্ম-

প্রকাশ প্রার্থনাতে—সে প্রার্থনা সাজে সজ্জায় মিষ্টবাক্যে মিষ্টব্যবহারে সাধ্যসাধনায়—অর্থাৎ আত্মত্যাগে—ভগবানের কাছেও আমাদের প্রার্থনা শুধু বাক্যে নয়, ত্যাগে কল্যাণে সে প্রার্থনা সার্থক। যাকে ভালোবাসি তাকে ফাঁকি দিই নে, কেননা সে স্থলে ফাঁকি দেওয়া নিজেকেই বিড়ম্বিত করে—ভগবানকে যদি ভালোবাসি তবে শুধু কথায় তাঁকে ফাঁকি দিতে ইচ্ছেই হবেনা, স্বভাবতই সত্যকার ত্যাগের দ্বারা তাঁকে প্রার্থনা করি। যদি বলো তাঁকে না ভালোবেসে তাঁর ভালোবাসা পাওয়া যাবে—সে তো পাচ্চই নিমেষে নিমেষে নিশ্বাসে নিশ্বাসে—তোমার অস্তিত্বের মধ্যেই তাঁর ভালোবাসা, —কিন্তু সে পাওয়াকে নিজের দেওয়ার দ্বারা তুমি আপন করে নিতে পারলে না বলেই সে পেয়েও না পাওয়া। প্রেমের প্রার্থনার দ্বারা ভগবানের প্রেমকে আপন করা হয়, সেই আপন করাই ভগবানকে পাওয়া। ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৭

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বলাকার "শঙ্খ" বিধাতার আহ্বান শঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয়—অকল্যাণের সঙ্গে পাপের সঙ্গে

অন্যায়ের সঙ্গে। সময় এলেই উদাসীনভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। দুঃখস্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।

শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তাহলে দেখ্‌তে পাই সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না—ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না বলেই এত বড়ো সীমাকেও ভেঙে তাঁর চলে যেতে হয়—পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখ্‌লে তাঁকে খর্ব্ব করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলি সীমা ভেঙে ভেঙে। তাজমহলের সঙ্গে সাজাহানের যে সম্বন্ধ সে কখনোই চিরকালের নয়—তাঁর সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেই রকম। সে সম্বন্ধ জীর্ণপত্রের মতো খসে পড়েচে—তাতে চিরসত্যরূপী সাজাহানের লেশমাত্র ক্ষতি হয় নি।

তাজমহলের শেষ দুটি লাইনের সর্ব্বনাম "আমি" ও "সে" —যে চলে যায় সেই হচ্চে সে, তার স্মৃতিবন্ধন নেই,—আর যে অহং কাঁদচে সেই তো ভার-বওয়া পদার্থ। এখানে আমি বলতে কবি নয়—"আমি-আমার" করে' যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। আমার বিরহ, আমার স্মৃতি আমার তাজমহল যে মানুষটা বলে, তারই প্রতীক ঐ গোরস্থানে—আর মুক্ত হয়েচে যে, সে লোকলোকান্তরের যাত্রী—তাকে কোনো একখানে ধরে না, না তাজমহলে, না ভারতসাম্রাজ্যে, না সাজাহান নামরূপধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে।

বামী যেমন দীপ হাতে একটা অন্ধকার ঘূর্ণি সিঁড়ি বেয়ে চল্‌চে, সমস্ত নক্ষত্রলোককে আমি সেই দীপহাতে ছোটো মেয়েটির মতোই দেখ্‌চি। চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ যদি তার আলো নিবে যায়—তা হলে সে আপ্‌নাকে আর দেখ্‌তে পাবে না—অসীম অন্ধকারের মধ্যে একটা কান্না উঠ্‌বে, "আমি হারিয়ে গেছি।"

আমি নিজে কাজের ভিড়ের মধ্যে এমনি চাপা পড়েচি যে ঐ পলাতকার "বামী"র মতোই একেবারে হারিয়ে গেছি বলে বোধ হচ্চে, আমাকে খুঁজে বের করবার জন্যে বাইরে হাত বাড়িয়ে আঁকুবাঁকু করে মরচি। ইতি ৮ ফাল্গুন ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৮

১৫ অক্টোবর ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, তুমি তো জানোই, আমার জীবনে বারম্বার নিরবচ্ছিন্ন নিন্দার দলবদ্ধ আক্রমণ সমুদ্যত হয়ে উঠেচে, আমার সান্ত্বনার বিষয় এই যে, আমার ব্যবহারে তার কারণ ঘটতে দিই নি, এবং আমার লেখনী সেই কলহের ক্ষেত্রে অবতরণ করে প্রতিপক্ষতা করতে অস্বীকার করেচে। ইতিপূর্ব্বে অনেক বড়ো বড়ো ধনুর্দ্ধরেরাই ব্যূহ রচনা ক'রে আমার পরে অবিশ্রাম শরবর্ষণ করেচেন তবুও এখনো টিঁকে আছি,

আজকের দিনেও যাঁরা থেকে থেকে মুষ্টি আস্ফালন করচেন কালকের দিনে তাঁদের সেই উগ্র উত্তেজনার কোনো চিহ্ন কোথাও থাকবে না। যাঁরা আমার অখ্যাতির ধ্বজা উচ্চ ক'রে ধ'রে উচ্চতা লাভ করতে চান আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি তাঁরা নিজের মহিমা দ্বারাই অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করুন, কুৎসা-ব্যবসায়ের কুৎসিত উপায়ে নয়। গৌরবে স্বদেশের কোনো সাহিত্যিক আমাকে ছাড়িয়ে যাবেন না এমন নীচ কামনা আমার মনে কদাচ যেন স্থান না পায়—তাঁদের সাধনা সফল হোক, নবযুগের সাহিত্য সিংহাসনে বসে তাঁরা রাজটীকা পরুন, আর সেই আত্মপ্রসাদে, অন্য কবির খ্যাতি খর্ব্ব করবার অসহ্য উষ্মা, তাঁদের মনে শান্ত হোক্।

তোমাকে অনেক দিন দেখি নি। ছুটি উপলক্ষ্যেও কি ঢাকা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেনা? ইতি ২৯ আশ্বিন ১৩৩৬

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৯
১৫ এপ্রিল ১৯৩১

শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, তোমাদের চয়নিকায় আমার কবিতা আহরণ করতে চাও আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। কপিরাইট

বিশ্বভারতীর এই জন্যে একবার সচিবের অনুমতি দরকার হতে পারে নতুবা প্রশান্তর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমাকে ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেছ ঐটে কঠিন ঠেকচে। জীর্ণ দেহের মধ্যে অলস মন আপন নিভৃত নীড় রচনা করে অদৃশ্যপ্রায়ভাবে কালযাপন করবার আয়োজন করেচে। লেখবার স্বাভাবিক ইচ্ছে আর নেই—লেখবার পথ এখন উজানের পথ—সুতরাং লেখনী আজ লগির আকার ধরেচে—বাণীনির্ঝর তলিয়ে গেছে বালুর নীচে, খুঁড়ে জল বের করতে হয়। এখন থেকে আমার প্রত্যাশা তোমরা ছেড়ে দাও। দেখা হলে সকল কথার আলোচনা হবে। ইতি ২ বৈশাখ ১৩৩৮।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০০

১১ জুন ১৯৩১

আশীর্ব্বাদ পত্রী

শ্রীমান প্রেমোৎপল,

শ্রীমতী অমিয়া,

বিকশি' কল্যাণবৃন্তে যুগলের হিয়া
অন্তরে অক্ষয় হোক্ প্রেমের অমিয়া।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৮

১০১

৪ অক্টোবর ১৯৩২

অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা
কোণে কোণে তার পুঞ্জিত হোলো জীবনের ভাঙা আশা।
ঘরের মধ্যে বুকের কাঁদনগুলা
উড়িয়ে বেড়ায় ধূলা।
দূষিয়া রুষিয়া উঠে নিরুদ্ধ বায়ু,
শোষণ করিছে আয়ু।
যেখানে-সেখানে মলিনের লাগে ছোঁওয়া
দীপ নিবে যায়, তীব্র গন্ধ ধোঁওয়া
রোধ করে নিঃশ্বাস,
কঠোর ভাগ্য হানে নিষ্ঠুর ভাষ॥

ওরে দরিদ্র, চেয়ে দেখ্ তোর্ ভাঙা ভিত্তির ধারে,
অসীম আকাশ, কে তারে রোধিতে পারে।
সেথা নাই বন্ধন।
প্রভাত আলোকে প্রতিদিন আসে তব অভিনন্দন।
সন্ধ্যাতারা তোমারি মুখেতে চাহে,
তোমারি মুক্তি গাহে।
তব সত্তার মহিমা ঘোষিছে সব সত্তার মাঝে,
হে মানব, তুমি কোথায় লুকাও লাজে।
যেখানে ক্ষুদ্র যেখানে পীড়িত তুমি,
কর্কশ হাসি হাসিছে যেথায় দৈন্যের মরুভূমি

তাহার বাহিরে তোমার উদারস্থান,
বিশ্ব তোমারে বক্ষ মেলিয়া করিতেছে আহ্বান ॥

১৮ আশ্বিন,
শুক্লপঞ্চমী
১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০২

১৫ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, একজাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয় তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিম্বা রূপ-রচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার একজাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার "বৈশাখ" কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেচ। বলা বাহুল্য, এটা শেষজাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনাকালের সমস্ত কিছু। যেমন "সোনার তরী" কবিতাটি (ছিলাম তখন পদ্মায় বোটে। জলভারনত কালোমেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেচে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেচে ফেনা। নদী অকালে কূল

ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্চে। কাঁচা ধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙি নৌকো হুহু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেচে। ঐ অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান। আর কিছুদিন হলেই পাকত। মনে আছে এগ্রিকালচারাল বিভাগীয় দ্বিজু রায় বিদ্রূপ করেছিলেন শ্রাবণ মাসের ধানের অসাময়িকতা উল্লেখ করে।

ভরা পদ্মার উপরকার ঐ বাদল দিনের ছবি "সোনার তরী" কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত। "বৈশাখ" কবিতার মধ্যে মিশিয়ে আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্রমধ্যাহ্নের দীপ্তি। যেদিন লিখেছিলুম, সেদিন চারদিক থেকে বৈশাখের যে তপ্ত রূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ঐ কবিতায় প্রকাশ পেয়েচে। সেই দিনটিকে যদি ভূমিকারূপে ঐ কবিতার সঙ্গে তোমাদের চোখের সামনে ধরতে পারতুম তাহলে কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠত না।

তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্চে নিম্নের দুটি লাইন নিয়ে—

ছায়ামূর্ত্তি যত অনুচর
দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন্ রন্ধ্র হতে ছুটে আসে।

খোলা জানলায় বসে ঐ ছায়ামূর্ত্তি অনুচরদের স্বচক্ষে দেখেচি শুষ্ক রিক্ত দিগন্তপ্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে প্রেতের মতো হুহু করে ছুটে আসচে ঘূর্ণা নৃত্যে, ধুলোবালি শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্ত্তী শ্লোকেই ভৈরবের অনুচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেচি, পড়ে দেখো।

তারপরে এক জায়গায় আছে—

সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্বপরে—

এই দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েচ।

সেদিনকার বৈশাখ মধ্যাহ্নের সকরুণতা আমার মনে বেজেছিল বলেই ওটা লিখ্‌তে পেরেচি। ধূধূ করচে মাঠ, ঝাঁঝাঁ করচে রোদ্দুর, কাছে আমলকি গাছগুলোর পাতা ঝিলমিল্ করচে, ঝাউ উঠচে নিঃশ্বসিত হয়ে, ঘুঘু ডাক্‌চে স্নিগ্ধ সুরে,—গাছের মর্ম্মর, পাখীদের কাকলী, দূর আকাশে চিলের ডাক, রাঙামাটির ছায়াশূন্য রাস্তা দিয়ে মন্থরগমন ক্লান্ত গোরুর গাড়ির চাকার আর্ত্তস্বর সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে যে একটি বিশ্বব্যাপী করুণার সুর উঠ্‌তে থাকে নিঃসঙ্গ বাতায়নে একলা বসে সেটি শুনেচি, অনুভব করেচি, আর তাই লিখেচি।

অমিয়র চিঠিতে তুমি লিখেচ, সকালবেলাকার আলো-অন্ধকারের সময়কে প্রত্যূষ বলা হয়ে থাকে—সেই শব্দটাকে ব্যবহার করলে তার স্থলে প্রদোষ ব্যবহার করবার আভি-ধানিক দোষ কেটে যায়। প্রত্যূষ শব্দটা দিনরাত্রির একটি বিশেষ সময়কে নির্দ্দেশ করে—অর্থাৎ যাকে বলে ভোর বেলা। ভোরে বা সন্ধ্যায় আলোকের অস্ফুটতায় যে একটি বিশেষ ভাব মনে আনে, প্রত্যূষ শব্দে সেটাকে প্রকাশ করা হয় না। প্রদোষ শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করি এবং করব। দোষ শব্দের অর্থ রাত্রি,—প্র উপসর্গটা সামনের দিকে তর্জ্জনী তোলে—অতএব ঐ শব্দটাকে বিশ্লেষণ করে দুই

অর্থই পাওয়া যেতে পারে,— অর্থাৎ যে সময়টার সম্মুখে রাত্রি, অথবা রাত্রির সম্মুখে যে সময়। রাত্রির প্রবণতা যে দিকে।— কিন্তু শব্দ বিশ্লেষণের দরকার নেই, দরকার আছে twilight শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়ার। প্রদোষ শব্দটা সাধারণত বেকার বসে থাকে তার দ্বারা আমি সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করব, যেহেতু অন্য কোনো শব্দ নেই।

তুমি আমার কাব্য বিশ্লেষণ করে বই লিখতে প্রবৃত্ত হয়েচ তার নাম দিতে চাও রবিরশ্মি। রবিকে উহ্য রেখে রশ্মিচ্ছটা নাম দিতেও পারো। ইতি ২৯ আশ্বিন ১৩৩৯।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার গ্রন্থে আমার লাইন উদ্ধৃত করবে তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার অনেকগুলি কাব্যই বিশ্বভারতীর, কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি নেওয়া দরকার হবে। ইদানীংকার যে বইগুলোর স্বত্ব আমার সে সম্বন্ধে কোনো বিপদ নেই।

১০৩

২১ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তুমি পঞ্জিকা মিলিয়ে যদি কবিতার তাৎপর্য্য নির্ণয় করতে চাও তো বিপন্ন হবে। বুধবারের পরে বৃহস্পতিবার আসে অত্যন্ত সাধারণ নিয়মে। সেটাকে অবজ্ঞা কোরো। আমাদের

জীবনে, সুতরাং সাহিত্যেও, হয়তো কোনো একটা বিশেষ বুধ বা বৃহস্পতিবার সপ্তাহ ডিঙিয়ে চব্বিশঘণ্টাকে উপেক্ষা করেই আসন রক্ষা করে। যেদিন বর্ষার অপরাহ্নে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙি নৌকো বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসচে সেদিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজো আমার মনে আছে। সেই দিনেই সোনার তরী কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে, তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই। এইরকম অবস্থায় ইতিহাসের ভুল হবারই কথা। কারণ আমার মনে সোনার তরীর যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্চে সেই শ্রাবণ দিনের ইতিহাস, সেটা কোন্ তারিখে লিখিত হয়েছিল সেইটেই আকস্মিক,—সেদিনটা বিশেষ দিন নয়, সেদিনটা আমার স্মৃতিপটে কোনো চিহ্ন দিয়েই যায়নি। অতএব আমার ইতিহাসে আর তোমাদের ইতিহাসে এইখানে বাদ প্রতিবাদ হবেই, দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের হাতে দলিল আছে আমাদের হাতে নেই। আদালতে তোমাদেরই জিৎ রইল। আমার দলিলের তারিখ কবিতার অভ্যন্তরেই আছে। শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে। তুমি বল্‌বে, ওটা কাল্পনিক, আমি বল্‌ব তোমাদের তারিখটা রিয়ালিস্টিক্। এমনতরো কথা কাটাকাটি করলে কথার অবসান হবে না।

বৈশাখের অনুচরীর যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয়তো কি—নৃত্যের ভঙ্গী দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি

বল্‌চ তুমি তার ধ্বনি শুনেচ, কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণিগতিটাকে দেখেচি সেখান থেকে কোনো শব্দই পাই নি। বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্ত্তনে দেখা যায়, তার রূপ নয় তার গতিই অনুভব করি, তার শব্দ তো শুনিই নে। এ স্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জো নেই। ইতি ৪ কার্ত্তিক ১৩৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৪

২৭ নভেম্বর ১৯৩২

ওঁ

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

তুমি যে গানটি পাঠিয়েছ সে গানে প্রদীপ শিখায় ও কবির চিত্তে কোনো প্রভেদ আছে বলে মনে করি নে। উতল হাওয়া যাকে বলা হচ্চে সেও একান্ত বায়ব্য পদার্থ না হতে পারে। অবশ্য ব্যাপারটা আত্মজীবনীর একাংশ নয়। মানুষের একটা কাল্পনিক আত্মজীবনী আছে, সেখানে তার নানা অনুভূতির অবাস্তব লীলা। এ না থাকলে কেবলমাত্র কবিজীবনীর সংকীর্ণ পথ অনুসরণ করে গীতিকাব্য লেখা অসম্ভব। অন্তরে অনেকবার যে সব ভাব নানা উপলক্ষ্যে

ভাবিত হয়েচে, বিস্মৃত হয়েচে, প্রেতশরীরীর মতো তারা ঘুরে বেড়ায় মনের কোণে কোণে, তাদের সূক্ষ্ম সত্তা নিয়ে। এই সূক্ষ্মতাবশতই বিবিধ রূপ দিয়ে তাদের আবদ্ধ করা সহজ।

প্রদীপ শিখার সঙ্গে ভোরবেলাকার তারার স্বাভাবিক সখিত্ব। উভয়েরই জীবনের চরম কথাটি সেই সময়ে আসন্ন আলোকে বিলীন হবে, অন্তিম মুহূর্তের জানাশোনা হবে দুজনের। সেই যে তাদের বাণী মরণ দূতের জন্যে অপেক্ষা করচে— উতল হাওয়ার কানে কানে সেই কথাটি দেবার ইচ্ছা আছে শ্রীমতী দীপশিখার। অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার অকথিত বাণীর বেদনাগান এ'কে বলা যায়। এ গান কত ঘরে কত কুণ্ঠিত হৃদয়ে বসন্ত নিশীথে গুঞ্জরিত হয়ে উঠ্‌চে— কবি তাকেই সুর দিয়েচে। যার প্রয়োজন সে এ'কে গ্রহণ করতে পারে, যার প্রয়োজন নেই সেও হয়তো দেখ্‌বে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তারো মনের কোথায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে। ইতি ১১ই অগ্রহায়ণ রবিবার।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৫

২৩ জানুয়ারি ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি যে প্রশ্নগুলি করেচ, সে তোমার নিজের নয়, সে পরের, সেই জন্যে তার জবাব দিতে ইচ্ছে করে না। প্রশ্ন-

গুলির মধ্যে অন্তত একটিতে কৈফিয়তের দাবী আছে, তার জবাবদিহী করতে আমার ধিক্কার বোধ হয়। তুমি ছাড়া আর কারো পত্রের উত্তরে কথা কইতুম না।

তোমাদের কবি অধ্যাপক বলেচেন আমি আদর্শবাদ ভাববাদ নিয়ে কল্পনা বিলাস করি, "প্রকৃত বৈষয়িক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে" অবতীর্ণ হইনি। মুস্কিল ঐ প্রকৃত বিশেষণ নিয়ে। বৈষয়িক শব্দের চলিত অর্থ যদি গ্রহণ করো তাহলেও এ কথা নিশ্চিত তোমরা জানো, যে সময় ঐ কবিতাটি লিখেছিলুম সে সময়ে পুরাপুরিই বিষয় কাজে নিযুক্ত ছিলুম—এবং এ কাজে খ্যাতিও পেয়েছি। তার অনতিকাল পরে আমি পল্লীর কাজে শিক্ষার কাজে আমার অর্থ আমার স্বাস্থ্য আমার সংসার ভাসিয়ে দিয়েছি। বাংলা দেশ ছাড়া অন্য সকল দেশের লোকই এ খবর ভালো করে জানে। বাঙালীর মুখে অনেক বার শুনেছি আমি কেবল কবিত্বই করে থাকি—তার কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বাংলা দেশে জন্মেছি। যা সুপ্রত্যক্ষ তাকেও যারা চোখে দেখতে পায় না তাদের সেই অন্ধতার মূলে যে চিত্তবৃত্তি আছে তার সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করাই ভুল। আজ ৩৫ বৎসরের দুঃসহ দুঃখে ও দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে যা আমি আমার প্রদেশবাসীদের দেখাতে পারি নি আজ তা প্রমাণের চেষ্টা করে কী হবে।

২। যে-প্রাণলক্ষ্মীর সঙ্গে ইহজীবনে আমাদের বিচিত্র সুখ দুঃখের সম্বন্ধ মৃত্যুর রাত্রে আশঙ্কা হয় সেই সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন করে বুঝি আর কেউ নিয়ে গেল। যে নিয়ে যায়,

মৃত্যুর ছদ্মবেশে সেও সেই প্রাণলক্ষ্মী, পরজীবনে সে যখন কালো ঘোমটা খুলবে তখন দেখতে পাব চির পরিচিত মুখশ্রী। কোনো পৌরাণিক পরলোকের কথা বলচি নে সে কথা বলা বাহুল্য এবং কাব্যরসিকদের কাছে এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে বিবাহের অনুষ্ঠানটা রূপক। পরলোকে আমাদের প্রাণসঙ্গিনীর সঙ্গে ঠিক এই রকম মন্ত্র পড়ে মিলন ঘটবে সে আশা নেই। আসল কথা পুরাতনের সঙ্গে মিলন হবে নূতন আনন্দে।

৩। ধরণীর ধূলায় তো আজও আছি তবু নিশীথ আকাশের দিকে যখন তাকাই তখন মনে যে আনন্দ পাই সেই আনন্দের সম্বন্ধটা কি অস্বীকার করতে হবে। নক্ষত্রের সঙ্গে এই আনন্দের পরিচয় আমাদের নেই না কি। অন্তত আমার তো আছে। আমি কখনো কখনো রাত দুটোর সময় বিছানা ছেড়ে বাইরে দাঁড়িয়েছি সে কেবল ঐ আকাশভরা নক্ষত্রের ডাকে— সেই কথাটাকেই কাব্যে বলেছি—

লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।

৪। উর্ব্বশী যে কী কোনো ইংরেজি তাত্ত্বিক শব্দ দিয়ে তার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে চাই নে, কাব্যের মধ্যেই তার অর্থ আছে। এক হিসাবে সৌন্দর্য্য মাত্রই এব্স্ট্র্যাক্ট— সে তো বস্তু নয়— সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে প্রকাশ উর্ব্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য— সেই জন্য

কোনো কর্ত্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্ত্তব্য বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল এব্‌স্ট্র্যাক্ট সৌন্দর্য্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যে হেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য্য সেই জন্যে তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। শেলি যাকে ইনটেলেক্‌চুয়াল বিউটি বলেছেন উর্ব্বশীর সঙ্গে তাকেই অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধা লাগে তবে সে জন্যে আমি দায়ী নই। গোড়ার লাইনে আমি যার অবতারণ করেছি সে ফুলও নয় প্রজাপতিও নয় চাঁদও নয় গানের সুরও নয়— সে নিছক নারী— মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়, যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই।

হায় রে অদৃষ্ট, কবিকে এমন করে কাব্যব্যাখ্যা করতে হয়। এক একসময় সন্দেহ হয় যে-অন্ধতায় আমার প্রত্যক্ষ কর্ম্মকে অগোচর করে রাখে সেই জাতীয় অন্ধতায় আমার কাব্যের অর্থকেও আচ্ছন্ন করে। তাই আমার ব্যাখ্যায় কোনো ফলের আশা করি নে। ইতি ১০ মাঘ ১৩৩৯।

রবীন্দ্রনাথ

১০৬

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মনে রাখতে হবে উর্ব্বশীকে। সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়,

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্ত্তকী, দেবলোকের অমৃতপান-সভার সখী।

দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয় নারীর সৌন্দর্য্য নিয়ে। হোক্ না সে দেহের সৌন্দর্য্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এই রূপ-সৌন্দর্য্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতাই স্বর্গীয়। উর্ব্বশীতে সেই দেহসৌন্দর্য্য ঐকান্তিক হয়েছে, অমরাবতীর উপযুক্ত হয়েচে। সে যেন চির যৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত— তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য্য।

কামনার সঙ্গে লালসার পার্থক্য আছে। কামনায় দেহকে আশ্রয় করেও ভাবের প্রাধান্য, লালসায় বস্তুর প্রাধান্য। রসবোধের সঙ্গে পেটুকতার যে তফাৎ এতেও সেই তফাৎ। ভোজনরসিক যে, ভোজ্যকে অবলম্বন করে এমন কিছু সে আস্বাদন করে যাতে তার রুচির উৎকর্ষ সপ্রমাণ করে। পেটুক যে, তার ভোগের আদর্শ পরিমাণগত, রসগত নয়। সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয় তবুও তা অনির্ব্বচনীয়। উর্ব্বশীতে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দেহধারণ করেচে সুতরাং তা এব্‌স্ট্র্যাক্ট নয়।

মানুষ সত্যযুগ এবং স্বর্গ কল্পনা করেছে। প্রতিদিনের সংসারে অসমাপ্তভাবে খণ্ডভাবে যে পূর্ণতার সে আভাস পায়, সে যে এব্‌স্ট্যাক্টভাবে কেবলমাত্র তার ধ্যানেই আছে কোনো-খানেই তা বিষয়ীকৃত হয় নি একথা মান্‌তে তার ভালো লাগে না। তাই তার পুরাণে স্বর্গলোকের অবতারণা। যা আমাদের

ভাবে রয়েছে এবৃস্ট্যাক্ট, স্বর্গে তাই পেয়েছে রূপ। যেমন যে-কল্যাণের পূর্ণ আদর্শ সংসারে প্রত্যহ দেখতে পাইনে অথচ যা আছে আমাদের ভাবে, সত্যযুগে মানুষের মধ্যে তাই ছিল বাস্তবরূপে এই কথা মনে করে তৃপ্তি পাই— তেমনই এই কথা মনে করে আমাদের তৃপ্তি যে, নারীরূপের যে অনিন্দনীয় পূর্ণতা আমাদের মন খোঁজে তা অবাস্তব নয়, স্বর্গে তার প্রকাশ উর্ব্বশী মেনকা তিলোত্তমায়। সেই বিগ্রহিণী নারী-মূর্ত্তির বিস্ময় ও আনন্দ উর্ব্বশী কবিতায় বলা হয়েছে।

অন্তত পৌরাণিক কল্পনায় এই উর্ব্বশী একদিন সত্য ছিল যেমন সত্য তুমি আমি। তখন মর্ত্ত্যলোকেও তার আনাগোনা ঘটত, মানুষের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ ছিল— সে সম্বন্ধ এবৃস্ট্র্যাক্ট নয় বাস্তব। যথা পুরুরবার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। কিন্তু কোথায় গেল সেদিনকার সেই উর্ব্বশী। আজ তার ভাঙাচোরা পরিচয় ছড়িয়ে আছে অনেক মোহিনীর মধ্যে— কিন্তু সেই পূর্ণতার প্রতিমা কোথায় গেল!

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশি।— একটা কথা মনে রেখো।—উর্ব্বশীকে অবলম্বন করে যে-সৌন্দর্য্যের কল্পনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে লক্ষ্মীকে অবলম্বন করলে সে আদর্শ অন্যরকম হোতো— হয় তো তাতে শ্রেয়স্তত্ত্বের উঁচু সুর লাগত। কিন্তু রসিক লোকে কাব্যের বিচার এমন করে করে না। উর্ব্বশী উর্ব্বশীই, তাকে যদি নীতি উপদেশের খাতিরে লক্ষ্মী করে গড়তুম তাহলে ধিক্কারের যোগ্য হতুম।

সেকালে উর্ব্বশী অনেক মানুষকে কর্ত্তব্য থেকে ভ্রষ্ট

করেচেন। একালে ইন্দ্রদেব তোমাকেই পাঠিয়েচেন আমার কর্ত্তব্য মাটি করবার জন্যে। অথচ এটা প্রোফেসারীয় কর্ত্তব্য —কবির কর্ত্তব্য নয়, অতএব আমার উচিত ছিল এই কর্ত্তব্যকে শ্রদ্ধা করা। ইতি ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭

২ অক্টোবর ১৯৩৩

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কাব্যের একটা বিভাগ আছে যা গানের সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনো নির্দ্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে, যে-মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়, যে মায়া শরৎঋতুতে সূর্য্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জে। মনকে রাঙিয়ে তোলে, এমন কোনো কথা বলে না, যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

ক্ষণিকার "আবির্ভাব" কবিতায় একটা কোনো অন্তর্গূঢ় মানে থাকতে পারে কিন্তু সেটা গৌণ, সমগ্রভাবে কবিতাটার একটা স্বরূপ আছে, সেটা যদি মনোহর হয়ে থাকে তাহলে আর কিছু বলবার নেই।

তবু "আবির্ভাব" কবিতায় কেবল সুর নয় একটা কোনো কথাও বলা হয়েছে সেটা হচ্চে এই যে, একসময়ে মনপ্রাণ ছিল ফাল্গুনমাসের জগতে, তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি

রূপ দেখা দিয়েছে আপন বর্ণগন্ধগান নিয়ে; সে বসন্তের রূপ, যৌবনের আবির্ভাব— তার আশা আকাঙ্ক্ষার একটি বিশেষ বাণী ছিল। তারপরে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রশস্ততর হয়ে এল তখন সেই প্রথম যৌবনের বসন্তী রঙের আকাশে ঘনিয়ে এল বর্ষার সজল শ্যাম সমারোহ— জীবনে বাণীর বদল হোলো, বীণায় আর এক সুর বাঁধতে হবে; সেদিন যাকে দেখেছিলুম এক বেশে এক ভাবে, আজ তাকে দেখচি আর এক মূর্ত্তিতে, খুঁজে বেড়াচ্চি তার অভ্যর্থনার নূতন আয়োজন। জীবনের ঋতুতে ঋতুতে যার নূতন প্রকাশ সে এক হলেও তার জন্যে একই আসন মানায় না।

খেয়ার "অনাবশ্যক" কবিতার মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে বলে মনে করি নে। আমাদের ক্ষুধার জন্যে যা অত্যাবশ্যক, তার কতই অপ্রয়োজনে ফেলাছড়া যায় জীবনের ভোজে, যে-ভোজ উদাসীনের উদ্দেশে। আমাদের অনেক দান উৎসর্গ করি তার কাছে যার তাতে দৃষ্টি নেই— সেই অনাবশ্যক নিবেদনে আনন্দও পেয়ে থাকি অথচ বঞ্চিত হয় সে, যে একান্ত আগ্রহ নিয়ে হাত পেতে মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে প্রতিদিন দেখতে পাচ্চি সংসারে যেখানে অভাব সত্য সেখান থেকে নৈবেদ্য প্রচুর পরিমাণেই বিক্ষিপ্ত হয় সেই দিকে যেখানে তার জন্যে প্রত্যাশা নেই, ক্ষুধা নেই।

তোমাকে যদি কাছে পেতুম তাহলে খাটিয়ে নিতুম প্রাচীন কবিতা সঙ্কলনে। দেখলুম কাজটা সহজ নয়, কেননা মনের

মতো জিনিষ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। হয়তো মনটা অত্যন্ত বেশি খুঁৎখুঁতে।

ইংরেজি ভাষায় বাংলা কবিতার অনুবাদ সম্বন্ধে আমার সংশয় ঘোচে না যে হেতু ইংরেজি ভাষার ঠিকমতো নাড়িজ্ঞান আমাদের হতেই পারে না। আধুনিক ইংরেজি কাব্যের অন্তরে বাহিরে নতুন যুগের মিস্ত্রি লেগেছে—এতই রূপান্তর হচ্চে যে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমাদের দেশের কোনো কারিগরের পক্ষেই সম্ভব নয়। ললিতবাবুকে বোলো এণ্ড্রুজ সাহেবকে তাঁর লেখা পাঠাতে, তিনি যদি পছন্দ করেন তবে Unwin বা আর কোনো প্রকাশকের জিম্মে করে দিতে পারেন—আমার ভরসা নেই। এণ্ড্রুজ কাল এখানে এসেচেন। বিজয়ার আশীর্ব্বাদ। ১৬ আশ্বিন ১৩৪০

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮

৫ নভেম্বর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু শরীরটা রীতিমত অপটু। অথচ কাজের দায় ঘাড়ে চেপে আছে। সেই Oxford Book of Bengali Verses মাথার উপর ঝুলচে। ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু কাজ সেরেচি। রামায়ণ মহাভারত থেকে ভদ্র রকমের দুই একটা টুকরো পাঠাতে পারো? সে যেন স্বাদেশিক সাহিত্যের তিলক পরা

না হয় যেন সার্ব্বদেশিক সাহিত্যের যোগ্য হতে পারে। অলমতিবিস্তরেণ ইতি ৫ নবেম্বর ১৯৩৩

তোমাদের

কবি

১০৯

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, নিজের কবিতার মধ্যে এমন অনেক কথা থেকে যায় যার ঠিক অর্থটি সেই কবিই দিতে পারে যে সেটা সদ্য বসে সেটা লিখছিল। অন্তত তার মনে তৎকালে অর্থটা সুস্পষ্ট ছিল অনবলুপ্ত কর্পূরের গন্ধের মতো। তার বহুকাল পরে অর্থের আভাসমাত্র থাকে, প্রকাশটা হয় ক্ষীণ। তখন অর্থ-বিচার সম্বন্ধে সে বিচারকের পদ নিতে পারে না, দশজন জুরির মধ্যে একজন হতে পারে মাত্র।

জীবনে অনেক সুখদুঃখ অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার স্থায়িত্ব নেই যা চেতনায় আবির্ভূত হতে হতেই বিস্মৃতির নেপথ্যে সরে যায়। কেবল নিজের ব্যক্তিগত জীবনে নয় সকল মানুষের জীবনে। সেই সকল ঘটনার বেদনা যতই প্রবল হোক তারা খবরের কাগজে ব্যক্তিগত নিদারুণ সংবাদের ছোটো ছোটো প্যারাগ্রাফের মতো এবেলার বার্ত্তা ওবেলা যায় মিলিয়ে। এইগুলোকে বলা যেতে পারে শ্রাবণের

রাত্রির বর্ষণ, অন্ধকারের মধ্যে মুখরিত হয়ে চলেছে আংশিক এবং ক্ষণিক গোচরতার মধ্যে। ভেবে দেখ না এই মুহূর্ত্তেই তোমাদের পাড়ায় মানব জীবনের যে অগণ্য সুখদুঃখ ক্রন্দিত হয়ে উঠ্‌চে সে কত বড়ো মোটা পর্দ্দার পিছনে। সাহিত্যে সেইগুলি নিয়ে যা সৃষ্টি করব সে হচ্চে সংসারের বহু বিস্মৃতিরই ধারাপতন। ইতিহাসের বড়ো বড়ো জিনিষ রক্ষিত হচ্চে নানা আকারে, তারা আমাদের স্মৃতিসম্পদ; যেগুলি অখ্যাত অগোচর অথচ যেগুলি প্রত্যেক মানুষেরই চেতনায় প্রতিমুহূর্ত্তে তরঙ্গিত সেই সমস্ত আশুবিলীয়মান পদার্থকে রূপ দিতে চাই যে রচনায় তারই ধারাকে খুব সম্ভব কবি জীবনের শ্রাবণরাত্রির বিস্মৃতিবৃষ্টি বলেচেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা স্মৃতি অধিকার করবে বটে কিন্তু মূলে তারা বিস্মৃতিপুঞ্জ, সংসারের বর্জ্জনাধারে তারা বিলোপের অপেক্ষা করচে। ইতি ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১০
২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

রুদ্ধগৃহ অনেক দিনের লেখা। পড়তে গেলে অন্য কারো রচনা বলে বোধ হয়। তুমি প্রশ্ন না করলে ওর অস্তিত্বের

পরিচয় পেতুম না। কিন্তু ওর বিষয়বস্তুটা দুর্ব্বোধ মনে হোলো না।

জীবনে যখন কোনো বড়ো শোক আসে তখন মনে করতে পারি নে কালে তার ক্ষয় হতে পারে। নিজের কাছে নিজের শোকের একটা অভিমান আছে। এত তীব্র বেদনাও যে কোনো চিরসত্যকে বহন করেনা সে কথাটাকে আমরা সান্ত্বনা-স্বরূপে গ্রহণ করিনে, তাতে আমাদের দুঃখের অহংকারে আঘাত লাগে। জীবনটা থাকে কালের চলাচলের পথে, তার বিশ্রামহীন চাকার তলায় গুরুতর বেদনার চিহ্নও জীর্ণ হয়ে অস্পষ্ট হয়ে আসে। আমাদের কাছে প্রিয়জনের মৃত্যুর একটিমাত্র দাবি, সে বলে মনে রেখো। কিন্তু প্রাণের দাবি অসংখ্য, মনকে সে অহোরাত্রি নানাদিক থেকেই আকর্ষণ করতে থাকে—দাবির সেই উপস্থিত ভিড়ের মধ্যে মৃত্যুর একটিমাত্র আবেদন টিকতে পারেনা। মনে যদি থাকে স্মৃতির ব্যথা যায় ক্ষীণ হয়ে। কিন্তু শোকের অভিমান জীবনকে বঞ্চিত করে ও শোককে ধরে রাখতে চায়। চারিদিকের দরজা বন্ধ করে দেয়, প্রাণের দূতগুলিকে বলে দেয় not at home। প্রাণ আপন বিচিত্র ফসলের ক্ষেতকে উর্ব্বর করে রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু শোক অভিমানী তার মাঝখানে একটা শোকোত্তর জমি রাখতে চায় সেইটেতে সাধের মরুভূমি বানায়। মৃত্যুর সঞ্চয় নিয়ে কালের বিরুদ্ধে তার মকর্দ্দমা। ভিতরে ভিতরে ক্রমেই হারতে থাকে কিন্তু হার মানাতে চায়না লেখক বলচে হার মানাই ভালো। মনকে নিজকৃত কবরে

জীবিত সমাধি দেবার মতো অভিশাপ কিছু হতে পারে না। দেখা যাচ্চে পরবর্ত্তীকালের "বলাকা"র ভাবের সঙ্গে এই লেখার মিল আছে। ইতি ২১।৯।৩৪

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১১

৭ এপ্রিল ১৯৩৬

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয় শ্রীমান কনক

ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী লীলার

শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে আশীর্ব্বাদ—

দুর্গম সংসার পথে আজ হতে, হে যুগল যাত্রী,
প্রেমের পাথেয় নিয়ে পূর্ণপ্রাণে চলো দিনরাত্রি।
দুঃখের মিলাক দাহ, সুখের ঘুচুক মোহ ধন্ধ
আঘাতে সংঘাতে থাক্ অবিচ্ছিন্ন মিলনের বন্ধ।

২৫ চৈত্র

১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১২

২ জুন ১৯৩৬

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু আর তো পারা যায় না। ক্রমাগত ফরমাস আসচে নানাদিক থেকে। বিষয়টা এক কলমটাও এক অথচ বাণীকে করতে হয় বিচিত্র। তোমাদের অনুরোধ এড়াবার জো নেই— অতএব

যুগলযাত্রী করিছ যাত্রা,
নূতন তরণীখানি।
নবজীবনের অভয় বার্ত্তা
বাতাস দিতেছে আনি।
দোঁহার পাথেয় দোঁহার সঙ্গ,
অফুরান হয়ে র'বে।
সুখের দুখের যত তরঙ্গ
খেলার মতন হবে।

ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৩

২৯ অগস্ট ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কনক চলে যাবার পরে বজেটের মীটিং বসেছিল। আবিষ্কার করা গেল তহবিলে ভাঁটা পড়েছে। বেতন দেবার পরিমাণ সামর্থ্য নেই। কারণ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ধনভাণ্ডারে সর্ব্বত্রই সুদ কমে এসেছে—অতএব আয় ব্যয় সমন্বয়ের দুঃসাধ্য সাধনায় ইচ্ছাকে সংযত করতে হোলো। যদি শনিগ্রস্ত আমার ভাগ্যেও সুদিন আসে তাহলে আমন্ত্রণের পথ খুলতেও পারে। ইতি ২৯ অগস্ট ১৯৩৬

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৪

১৬ এপ্রিল ১৯৩৭

ওঁ

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

নববর্ষারম্ভে আমার সর্ব্বান্তঃকরণের কল্যাণকামনা গ্রহণ কর। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪৪

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৫

২৩ জানুয়ারি ১৯৩৮

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কোনো আপত্তি নেই— রবিরশ্মির অসম্পূর্ণ অংশকেও যদি রবির নামের সম্মতি দিতে চাও তাতে দোষ কী। ইতি ২৩।১।৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৬

৩০ জানুয়ারি ১৯৩৮

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

তুমি যে উৎসর্গ পত্র রচনা করেছ তোমার রবিরশ্মির প্রথম ভাগে তা ব্যবহার করতে পারো, আমার সম্মতি আছে। ইতি ১৬ মাঘ ১৩৪৪

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৭

১৩ মে ১৯৩৮

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

নিজের অন্তরের জিনিষকে বাহিরের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দেখতে অদ্ভুত লাগে। তখন সেটাকে পরিচয়ের দৃষ্টি থেকে দেখি নে, দেখি কৌতূহলের দৃষ্টিতে। অনেকদিন বেঁচে আছি তাই আমার রচনার আরম্ভ অংশ প্রাগিতিহাসের কোঠায় পড়ে গেছে— বর্তমান ইতিহাসের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। স্বয়ং বিধাতা তাঁর সেকালের সৃষ্টিতে লজ্জিত, নইলে আজ মানুষ জন্মাত না, সঙ্কোচে তিনি আদি জীবসৃষ্টির চিহ্ন চাপা দিয়েছেন মাটির নিচে। বৈজ্ঞানিক গুপ্তচর তাঁর সৃষ্টির আব্রু নষ্ট করতে উদ্যত। আমার কাব্যেরও সেই দশা। দ্রৌপদীর লজ্জা শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন, আমার কবিতার লজ্জা তোমরা রাখলে না। বনফুল বইখানার জন্যে ততটা ক্ষোভ নেই, কেননা সেটা সত্যিই কাঁচা। কিন্তু কবিকাহিনীতে ভগ্নহৃদয়ে অল্পস্বল্প পাক ধরেছে, এই জন্যেই ওদের কৃত্রিম প্রগল্‌ভতাকেই বলা যায় জ্যাঠামি। সদরে তার প্রদর্শনীটা ভালো নয়। তখনকার কালে এই কাঁচা পাকার অবস্থা ছিল বাংলা দেশের সর্বত্রই— এই জন্যেই কবিকাহিনী পড়ে কালীপ্রসন্ন ঘোষ উদীয়মান কবির জয়ধ্বনি করেছিলেন, ভগ্নহৃদয় পড়ে ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মাণিক্য বালক কবিকে সম্মান

জানাবার জন্যে তাঁর বৃদ্ধমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলা দেশের সেই বাল্যলীলার পর্ব ঘুচেছে, কিন্তু অনেকখানি আছে স্ত্রৈণতা, মা বলতে সে অজ্ঞান, আর প্রিয়ার তো কথাই নেই। আদুরে সাহিত্য, তাতে মেয়ের প্রশ্রয়ই বেশি, বেশ একটু আর্দ্রভাবের সেন্টিমেণ্টালিটি। বাল্যযুগের পরবর্তী আমার সাহিত্যে (বিশেষত সন্ধ্যাসঙ্গীত আদিতে) সেই স্যাৎসেঁতে ভাব রোগের মতো লেগে আছে। আছে তাতে সাধারণের দরদ পাবার আগ্রহ। সেটা ক্রনিক হয় নি এই আমার রক্ষা, নইলে কোন্‌কালে সেই রুগ্ন কাব্যের নাড়ী ছেড়ে যেত। তুমি তার সেই সেকালের সর্দ্দি-ধরা গদ্‌গদ বাণীকে যখন কিছুমাত্র খাতির করেছ, তখন আমি কুণ্ঠিত হয়েছি। অনেক চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু তোমাদের ঠেকানো যায় না। যে অবলা প্রাণী ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে বাঁচতে চায়, শিকারীর আনন্দ তাকেই লক্ষ্য করতে। লাগিয়েছ ফাঁস, এনেছ টেনে। যা হোক্‌ ভাগ্যক্রমে সেই আদ্যযুগই আমার অন্তিম যুগ হয় নি। তাও জোর করে বলা যায় না। আধুনিক যুগীয় জীবের অমানুষিক মোটা মোটা দাঁত উঠেচে দেখে ভয় লাগে, তাদের পাতে লেহ্য চোষ্য তো চল্‌বেই না, ভদ্ররকম চর্ব্যও নয়— রূঢ়ভাবে তাদের শ্বানীন (?) দন্ত (canine teeth) দিয়ে প্রচণ্ড ভঙ্গীতে ছিঁড়ে খাবার জিনিষ তারা পছন্দ করবে বলে মনে হয়। আমরা যে সুপক্ব জিনিষের ভোজকে সভ্যমানবোচিত মনে করে এসেছি তার প্রতি অবজ্ঞা করে ওরা হাসবে, বলবে অতিসভ্যতা মানুষের দাঁত

খারাপ করে দিয়েছে, স্বাদকেও করেছে কৃত্রিম ; বেশি আদর দিয়েছে রসনাকে। ভয় হচ্চে কথাটার মধ্যে হয় তো কিছু সত্য আছে। জীবকে প্রকৃতি প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী নয়;—তৎসত্ত্বেও সন্তানবৎসলা মায়ের মতো মানুষকে প্রকৃতি দুর্বলতাবশত আদুরে করেছে বেশি, হয় তো শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবার পক্ষে তার ফল ভালো নয়। সদ্যস্ক ভাবী কালের দিক থেকে এই রকমের নির্মম কথাই কানে ভেসে আসচে। অবশ্য চিরন্তন ভাবীকালের কী রায় তা নিশ্চিত জানি নে, মামলায় হাইকোর্টে জিৎ নিয়ে কিছুকাল হাঁকডাক করে শেষকালে প্রিভিকৌন্সিলের বিচারে জিতের ধন ফেরৎ দিতে হয় এমনো দেখা গেছে। যেমন ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ তেমনি রুচির আইনেরও। অতএব খ্যাতিটাকে নিয়ে উৎফুল্ল কিম্বা অবসাদগ্রস্ত হবার জরুরী দরকার নেই, ওটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাই ভালো। আমি সে চেষ্টা করে থাকি কিন্তু সিদ্ধপুরুষ হয়েছি জেনে শিবনেত্র হয়ে বসবার সময় এখনো আসেনি। যদি আসে তাহলে পৃথিবীতে খাঁটি ও মেকি মজুরীর শেষ ময়লা ঝুলিখানা ফেলে দিয়ে হালকা হয়ে পারের খেয়ায় চড়তে পারব। ভাগ্যের কাছে এই শেষ আশীর্বাদটাই চাই। সে সব চরম কথা থাক। তুমি আমার প্রত্যেক কবিতাটি নিয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছ, তাতে আমি গৌরব বোধ করি কিন্তু একটা কথা এই মনে হয় কাব্যরস আস্বাদনে পাঠকদের অত্যন্ত বেশি যত্নে পথ দেখিয়ে চলা স্বাস্থ্যকর নয়। নিজে নিজে সন্ধান করা ও আবিষ্কার করায় সত্যকার আনন্দ। তা ছাড়া কাব্যের কেবল

একটা মাত্র বাঁধা মানে না থাকতে পারে— তার আসনে এতটা স্থিতিস্থাপকত্তা থাকে যাতে ভিন্ন আয়তনের মানুষকে সে তার আপন আপন বিশেষ স্থান দিতে পারে। অনেক বিশেষ কাব্যকে বিশেষ প্রকৃতির লোক স্বভাবতই বুঝতে পারে না, সভা থেকে তাদের চলে যাবার দরজা খোলা রেখে তাদের সহজে বিদায় নিতে দেওয়া ভালো। চাদর ধরে টেনে এনে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেষ্টায় সত্য ফল হয় না। ধরে নেওয়া চাই রসের সামগ্রী অনেকের কাছে অনাস্বাদিত থাকবেই— জ্ঞানের সামগ্রীও তাই। এই নিয়ে মনের ক্ষোভ মেটাবার জন্যেই কবি বলেছেন ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ। যে ভিন্নতা স্বাভাবিক তাকে প্রসন্ন মনে সেলাম করে দূরে চলে যাওয়াই ভালো। নিজের রুচি ও শিক্ষা অনুসারে কেউ যে কাব্য বিচার করবে না তা নয়, কিন্তু তাতে অনেকখানি ফাঁক থাকা চাই, নিরেট ঠাসা গাইডবুক সাবালক ভ্রমণকারীর স্বাধীন চেষ্টাকে প্রতিহত করে। উত্তরে বল্‌তে পারো সংসারে নাবালকের সংখ্যা বিস্তর আছে— আমি বলি ও পথে তাদের না চলতে দেওয়াই ভালো।

আমার কথা যদি বলো আমি বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে তোমার বই পড়েছি, অনেকদিন ধরে অনেক লেখা লিখেছি— সকলের প্রতি আমার সমান টান নেই— অনেকের প্রতি আমি নিষ্ঠুর, অনেকের কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। তোমার অনুসরণ করে তাদের সঙ্গে পদে পদে মোলাকাৎ হোলো। কাউকে চিনলুম, কাউকে চিনলুম না, কাউকে নতুন

দেখায় দেখলুম। মজা লাগল এই মনে করে যে, এদের সব দূরের থেকে দেখা, যেমন করে দেখা যায় অতীত কালের কবির কবিতাকে। কিন্তু অতীত কালের কবিতার একটা মস্ত সুবিধা আছে, বর্তমান কালের আবরণ থেকে তা মুক্ত। সাহিত্য, যা চিরকালের আদর্শেই বিচারযোগ্য, কাছের দৃষ্টিতে সে আত্মরূপকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে না। হাল আমলের সংস্কারগুলো কাছের বলেই প্রবল, সেই প্রবলতাকেই সত্যের নিদর্শন বলে হালের লোক বিশ্বাস করে, সে বিশ্বাস নির্ভর-যোগ্য নয় বারে বারে তার প্রমাণ হয়ে গেছে। সেই জন্যেই বলি তোমাকে আর একবার জন্মাতে হবে। সে জন্যে তাড়াতাড়ি করার কোনো দরকার নেই, না করলেই সব দিকে ভালো। পাঠকদের কাছে তোমার বই ঔৎসুক্যজনক হবে বলে মনে করি— নিজের মতের সঙ্গে নিজের মত মিলিয়ে কখনো তারা এদিকে মাথা নাড়বে কখনো ওদিকে, যাদের কোনো মত নেই তারাও যেন বইখানা কেনে, যথাসম্ভব কাজে লাগবে— কিন্তু তাদের কথা চিন্তা করবার দরকার নেই। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩৪৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৮

১৬ মে ১৯৩৮

"UTTARAYAN"

SANTI-NIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু চিঠিতে আমার কথা বোধ হয় ভালো করে স্পষ্ট হয় নি। না হবার কারণ, আমার মনটা আজকাল অস্পষ্ট। আমার ধারণা ছিল রবিরশ্মি সাহিত্যালোচনার উচ্চ পর্যায়ের। অর্থাৎ বাছাই করে সমগ্র কাব্যের একটা সুপরিস্ফুট মূর্তি এতে গড়া হবে। কিন্তু বইটা হয়েছে প্রধানত ছাত্রদের পড়বার জন্যে, তন্ন তন্ন ব্যাখ্যা— যাদের বিচারবুদ্ধি পাকা হয় নি তাদের পথ দেখিয়ে চলা, আগাগোড়া সমস্ত পথ। এর একটা প্রয়োজন আছে সেটা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সাহিত্যসভার প্রয়োজন নয়। পথ যাদের অচেনা, সেই সব ছাত্রদের পরিচালনার কাজ এই বইয়েতে যথোচিতভাবেই হবে— বিদ্যালয়ে যাঁরা ক্লাস পড়াবেন তাঁদের পরিশ্রম তুমি বাঁচিয়েছ। সেদিক থেকে তোমাকে আশীর্বাদই করতে হবে। কিন্তু ভোজের নিমন্ত্রণ একে বলব না, সে নিমন্ত্রণে ভোজ্যেরও বাছাই এবং ভোক্তারও বাছাই অত্যাবশ্যক। কিন্তু তা নিয়ে তোমাকে দোষ দিতে পারি নে— কেননা সেটা তোমার উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল না, অথচ আগে থাকতে সেইটেই আমি প্রত্যাশা করেছিলুম, দেয়ালকে রাস্তা মনে করে দুর্যোধনের মতো মাথা

ঠুকেছিলুম। দুর্যোধনের আক্ষেপে বিচলিত হোয়ো না, একটু হেসো। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৯

২০ মে ১৯৩৮

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার ঘরে যত আশীর্বাচন বর্ষণ করেছি এমন আর কোথাও না। শুভ ইচ্ছা ফুরোয় না কিন্তু বচন ফুরোয় যে। তরুণের গলায় বাগ্‌বাদিনী যে বরমাল্য দিয়েছিলেন প্রাচীনের গলায় আজ তা শুকিয়ে এসেছে।

প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের উপর তুমি যে প্রবন্ধ লিখেছ তা পড়ে খুব খুশি হয়েছি। হতে পারে তার একটা কারণ গুণগানের আকর্ষণে। কিন্তু গুণগান তো অনেক শুনেছি। মুখ মরে এসেছে। কিন্তু তোমার এই রচনায় যে একটি চিত্র সম্পূর্ণ হয়েছে তাতে কলানৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। দ্রষ্টব্যকে সুস্পষ্ট করতে হলে এই রকম বাছাই কৌশল থাকা চাই, তাতে বহুলতার জায়গায় এই রকম ফুটে ওঠে সৌসাম্য, সেইটেই আর্ট। তোমার লেখনী থেকেই তারি অপেক্ষা করি, সেটা হবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমগ্র। পেটুকের পরিবেষণ সেরে

নিয়েছ, এবার হোক্ রসিকের আমন্ত্রণ। সবটাকে দিতে গেলে আসলটাকে দেওয়ার ব্যাঘাত হয়। ইতি ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"UTTARAYAN"

SANTI-NIKETAN, BENGAL.

ওঁ

শ্রীমান পুলকের শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে আশীর্ব্বাদ

নবসংসার সৃষ্টির ভার
নত শিরে নিয়ো দুজনে,
মিলনাঞ্জলি যুগল হিয়ার
দিয়ো বিধাতার পূজনে।
কল্যাণ দীপ জ্বালায়ো ভবনে
বিশ্বেরে কোরো অতিথি,
মানবের প্রেমে জাগায়ো জীবনে
পুণ্য প্রেমের প্রতীতি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২০

৩১ অগস্ট ১৯৩৮

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গল্পের প্লট অলস সময়ের সৃষ্টি, মনের কোণে মাকড়ষার জাল রচনা। এই ব্যস্ততার দিনে সে সমস্তই ছিঁড়ে সাফ হয়ে গেছে— মাকড়ষাটা সুদ্ধ ভেগেছে। এক সময় কোণগুলো তারা দখল করে ছিল এখন মগজের মধ্যে ঝাঁটিয়ে চলেছে কাজের কথা, ভারি ভারি বিষয়— তারা যে রাস্তা দিয়ে রথ হাঁকিয়ে চলে সে রাস্তায় উদ্বৃত্ত সৃষ্টির কণা মাত্র খুঁটে পাবার জো নেই। আবার যদি এই অকেজো বুদ্ধি নিয়ে জন্মাই অকেজো সময়ে, তখন গল্পের প্লটের দাবী যদি জানাও হয়তো পেতে দেরি হবে না। এখন দিন ফুরিয়েছে। ব্যস্ত আছি ক্লান্ত আছি এবং নিষ্কৃতির সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আছি। ইতি ৩১।৮।৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

স্যার ফিলিপ হার্টগকে লিখিত

[১৯২৪ ?]

Dear Dr. Hartog,

May I take the liberty of introducing to you my friend Mr. Charuchandra Banerji—Lecturer, Calcutta University—who has won rare distinction as a Bengali author and whose critical knowledge of Bengali literature I greatly admire. I am told that you want for Dacca University a lecturer for this subject—I know no one who is better fitted for this post than my friend.

Sincerely yours,
Rabindranath Tagore

২

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

১৬ মে ১৯৩৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রবিরশ্মি বইটা সম্বন্ধে চারুকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে করেছেন তাঁকে নিন্দাই করেছি। ওটা ছাপাবেন না। আমার কৈফিয়তে চারুকে যে

চিঠি লিখেছি তার নকল পাঠাই। তাঁর বইটা ক্লাস বইয়েরই মতো হয়েছে, ছাত্রাবস্থা ছাড়িয়েছে যারা এটা তাদের উপযোগী নয় অথচ সেই রকম বইয়ের দরকার আছে। অতিশয় বেশি দিতে গেলে কম দেওয়া হয়। বোধ হয় চারু ক্লাস পড়াবার উপলক্ষ্যেই এটা লিখেছেন সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও থাকলে ভালো হোত। যদি থাকত তা হলে বইটা প্রশংসারই যোগ্য হত।

ঠাণ্ডায় আছি, লোক কম গরমও নেই। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

আপনার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

২০ ডিসেম্বর ১৯৩৮

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদে মনে আত্মীয় বিচ্ছেদের শোক পেয়েছি। এই দুঃখের দিনে তোমাদের সকলের জন্য শান্তি ও সান্ত্বনা কামনা করি। ইতি ২০।১২।৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত

১
[১৯০৬ ?]

তুমি যে কাব্য সাহিত্যে আপনার পথ কাটিয়া লইতে পারিবে তোমার এই প্রথম গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

২
[১৯০৮ ?]

অনুবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। কবিতাগুলি এমন সহজ ও সরস হইয়াছে যে··· অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। মূলের রস কোনোমতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না। কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপে আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে— আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই— তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য।

৩
[১৯০৯ ?]

বাহিরে যাহার সার্থকতা, বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে সে তীব্র বেদনা অনুভব করে— বস্তুত এই বেদনাই জানায় যে তাহাকে বাহিরে আসিতে হইবে, ইহাই তাহার গর্ভবেদনা— এবং মৃত্যুবেদনারও নিঃসন্দেহ এই তাৎপর্য্য। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাহিরের জগতের সহিত মিলনে— যতক্ষণ

পর্য্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বহির্ম্মুখী হইয়া না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে— নিখিলের মধ্যে তাহারা বাহির হইয়া আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়। অতএব যখন আমরা পীড়া অনুভব করি তখন আমরা যেন না মনে করি এই পীড়াই চরম— ইহা মুক্তির বেদনা— একদিন যাহা বাহিরে আসিবার তাহা বাহিরে আসিবে এবং পীড়া-অবসান হইবে— 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে' কবিতাটির ভিতরকার তাৎপর্য্য আমার কাছে এইরূপ মনে হয়। সেইজন্য উহার নাম দিতেছি 'মুমুক্ষু'। নামটা কিছু কড়া গোছের বটে— যদি অন্য কোনো সুশ্রাব্য নাম মনে উদয় হয় তবে চয়নিকার প্রকাশককে জানাইয়া দিয়ো।

৪

[১৯১০ ?]

একরকম অনুবাদ আছে যাহা রূপ হইতে প্রতিরূপ আঁকার মত— তাহাতে কেবল চেহারাটা দেখা যায় কিন্তু সে চেহারা কথা কহে না— অর্থাৎ তাহাতে খানিকটা পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশই বাদ পড়ে। তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি— আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে— ইহা শিল্প কার্য নহে সৃষ্টি কার্য। বাঙ্গলা সাহিত্যে তোমার এই অনুবাদগুলি প্রবাসী নহে, ইহারা অধিবাসীর সমস্ত অধিকারই পাইয়াছে— ইহাদিগকে পূর্ব নিবাসের পাস্

দেখাইয়া চলিতে হইবে না— তোমার তীর্থরেণু পুষ্পরেণু হইয়া উঠিয়া নূতন গন্ধে বাতাসকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

১৫ জানুয়ারি ১৯১৩

কল্যাণীয়েষু

সত্যেন্দ্র, তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের দেশের রসের কারবার বড় ছোট। নিতান্ত মুদির দোকানের ব্যাপার। ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙার বন্দোবস্ত। সমালোচনার ভঙ্গী দেখলেই সেটা বোঝা যায়— নিতান্ত গেঁয়ো রকমের। সমালোচকেরা সাহিত্য-কারবারীদের মুচ্ছদি— তাদের নিজের পুঁজি-পাটা থাকা চাই, এবং জগতের বাজার যাচাই করবার মতো অভিজ্ঞতা ও শক্তি না থাকলে তাদের চলে না। আমাদের মূলধন কেবল, আমার কি ভালো লাগে এবং না লাগে সেইটুকু। সেটুকুর মূল্য কেবলমাত্র আমার ঘরে পাঁচ-দশ জনের কাছে, কিন্তু বড়বাজারে সে টাকা একেবারেই চলে না— এই দৈন্যটি বোঝবার পর্য্যন্ত শক্তি আমাদের নেই।

তাই ত আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বলচি, মাঝে মাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাবো না কেন?— কাব্যকে সাহিত্যকে একটা বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না

কেন? যে কবি সেই ত দ্রষ্টা এবং অন্যকে দেখিয়ে দেবার ভার ত তারই।... প্রভৃতি কাগজের সমালোচনা দেখলে আমার বড় কষ্ট বোধ হয়। এ সমালোচনা ত সাহিত্য-পথের মশাল নয়, এ কেবল চকমকি ঠোকা—ছোট্ট ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ কিন্তু তার খটাখট্ শব্দটাই বেশি। এতে কি পথিকদের কোনো সুবিধা হয়? ইতি ২ মাঘ ১৩১৯।

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[১৯১৮]

সত্যেন্দ্র, তুমি যদি 'কই' শব্দের শেষ 'ই'টির মাত্রা বাজেয়াপ্ত করতে চাও তবে অন্যায় হবে না? আমার দৃষ্টিতে দৈবক্রমে 'কই' কথাটা পদের শেষে পড়ে গেছে। তাই ফাঁক পেয়ে সেই ফাঁকির উপর দিয়ে মাত্রাটা চালিয়েছ কিন্তু যদি "কই শয্যা, কই বস্ত্র" হত তাহলে কী রকম করে এমন অবৈধাচরণ করতে পারতে? বস্তুত ইকারের পরে ফাঁক নেই —ক-এর অ-টাকে দীর্ঘ ক'রে ই-এর হ্রস্বতা পূরণ করা হয়। সে তো সকল হসন্ত বর্ণের সম্বন্ধেই খাটে—"কোথা জল, কোথা স্থল"—এখানে মাত্রার ওজন যদি দেখ তবে দেখবে 'জ' যত বড় 'ল্' তত বড় নয়—সেইজন্যে জ-টাকে দেড়মাত্রা করতে হয়েছে। তোমার বিধি অনুসারে 'জল'কে একমাত্রা

করে ফাঁকের উপরে আর-এক মাত্রা ফেলতে হয়। কিন্তু সেটা সাধু ছন্দের নিয়মবিরুদ্ধ। "সেই ত বহিছে বায়ু", এখানে তুমি 'সেই'-এর 'ই'-টিকে কি বিমাত্র বলে গণ্য করবে।

"When we two parted" কবিতাটির সম্বন্ধে অনেক দ্বিধা আমার মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু শেষকালে অন্য কোনো দৃষ্টান্ত মনে না পড়াতে ওটাকে ত্যাগ করি নি— আমার অভিপ্রায় এই ছিল যদি কেবলমাত্র প্রথম লাইনটা পড়া যায় তাহলে সম-অসমমাত্রার ছন্দের লয়টা ইংরেজের কানে পরিচিত হতে পারে— মনে কর যদি এমন হত—

When we two parted
Silence and tears

তাহলে তো ছন্দভঙ্গ হত না— এমন অবস্থায় 'In'টাকে ফাল্‌তো বলে ধরবার অধিকার আছে। বস্তুত ছন্দের মধ্যে ফাল্‌তো অংশের লক্ষণই এই যে, সেটাকে বাদ দিলে মূল ছন্দের তাল কাটে না— ও জিনিসটা ফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আসনে ওর স্থান নেই। তথাপি আমার প্রবন্ধটার মধ্যে একটু বদল করে দেওয়া গেল— কিন্তু আমার বোধ হয় যে সেটা অনাবশ্যক।

প্রা স ঙ্গি ক প ত্র ও র চ না

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

১

[২১ অগস্ট ১৯১২]

কল্যাণীয়েষু মণিলাল, আমি "শিশু"র গোটাকতক কবিতা তর্জমা করেছি, সেগুলো এঁদের খুব ভাল লেগেছে।...

আমি তর্জমার কাজে লেগেই আছি। এদের সকলেরই খুব ভাল লাগ্‌চে। আমার ইংরেজি যে কোনো সভ্যদেশে চল্‌তে পারে সে কথা আমি মনেও করতে পারতুম না কিন্তু দেখা যাচ্ছে একেবারে হুহুঃ শব্দে চল্‌ছে। ক্রমশ তার পরিচয় পাবে। চিত্রাঙ্গদা আমি সেরে ফেলেছি। আরো অনেকগুলো শেষ হয়ে গেছে।

সত্যেন্দ্রকে বোলো সে যদি আমার কতকগুলো লেখা ইংরেজি গদ্যে (পদ্যে নয়) তর্জমা করে দিতে পারে আমি খুব খুসি হব। সে অনেকের কবিতা বাংলায় তর্জমা করেছে কিন্তু আমার কবিতা বাংলায় তর্জমা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই আমি বঞ্চিত হয়েছি; একবার ইংরেজিতে চেষ্টা করে দেখ্‌তে বোলো।...

তোমার রবিদাদা

২

৭ অক্টোবর ১৯১২

C/o. Prof. Seymour
Urbana
Illinois
U.S.A.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মণিলাল, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পাওয়া গেল। চৈতালির পরে তোমরা যে বইগুলো ছাপিয়েছ সেগুলো আমাকে পাঠালে না কেন?

আমার ইংরেজি গীতাঞ্জলি ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বোধ হয় আর হপ্তাদুয়েকের মধ্যেই বের হতে পারবে। তারপরে আমার অন্যান্য তর্জমাগুলোর কপি প্রকাশকের হাতে দিয়ে আমি এখান থেকে অপ্রকাশ হব। আটলান্টিকের পারঘাটার দিকে পাড়ি দেব। সেইখানকার ঠিকানাতেই এবার থেকে চিঠি দিয়ো।

সত্যেন্দ্রের "কুহু ও কেকা" পড়ে আমি ভারি খুসি হয়েছি। সত্যেন্দ্র একলাই আমাদের বংলার কাব্যনিকুঞ্জকে একেবারে মুখরিত করে রেখেছে। অমর কবিসভায় ওর একখানি আসন যে ধ্রুব হয়েছে আমার মনে সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না।··· ২১ আশ্বিন ১৩১৯

তোমার রবিদাদা

২৭ অগস্ট ১৯১৬

Urbana

কল্যাণীয়েষু

মণিলাল, এখানে এসে অবধি চিঠিপত্র লেখা প্রায় বন্ধ আছে। ইংরেজি লেক্‌চার লিখেই দিন কাটচে— তারপরে এইগুলো আওড়াতে আওড়াতে কতকাল যাবে। প্রশান্ত সাগর পাড়ি দেবার আগে একবার তোমাদের কাছে আর এক দফা বিদায় গ্রহণ করা যাক্।···

এলাহাবাদে আমার যে সব বই ছাপবার জন্যে আয়োজন চলছিল তার কোন্‌টার কি হল? কেবল "ঘরে বাইরে" এবং "সঞ্চয়" পেয়েচি। শুনেছি "ঘরে বাইরে" নিয়ে অনেক রোখারোখি লেখালেখি চলেচে। দূরে থাকবার এই একটা মস্ত সুবিধে— তোমাদের ওখানকার কাগজের তুফান এই বৃহৎ পৃথিবীর আকাশে অতি ক্ষুদ্র মর্মরধ্বনিও তোলে না।

সত্যেন্দ্রের খবর কি? তাকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো। সত্যেন্দ্র একটা নাটক লিখবে আশা দিয়েছিল— তার অঙ্কুর কি দেখা দিয়েচে?

আমার আশীর্বাদ। ১১ই ভাদ্র ১৩২৩

রবিদাদা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আষাঢ়ের পুঞ্জ মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী ৫
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে ১০
ভালে তব বরণের টীকা; কবি, আজ হ'তে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্য কক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সংগীত তব দ্বারে।

জানি, তুমি প্রাণ খুলি ১৫
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত-কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ-সম; ২০
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম.

করুণ কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর বীণা-'পরে
সোনার নূতন তার এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তার হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে, ২৫
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষাবসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সংগীত; কাননের পল্লবে কুসুমে ৩০
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি' ৩৫
জয়মাল্য বিরচিয়া— রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি; অনাগত যুগের সাথেও
বেঁধে গেলে বন্ধুত্ব বন্ধন, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি!

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে, ৪০
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে' গেলে দান
দূর কালে; কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়

অনুক্ষণ, তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়, ৪৫
কোথায় সান্ত্বনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া ৫০
তুমি আস নাই বলে'— অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে ৫৫
তোমারে শুধাই— কোন্ লোকে রাত্রি তব হ'ল ভোর,
উদয়গিরির তলে কোথা তুমি দাঁড়াইলে আজি,
নবসূর্য্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে ? সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রু সাথে মিলিত মধুর ৬০
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গলবারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে সকরুণ বিদায়ের তান,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন আহ্বান।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে ৬৫

আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারি গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক— সূর্য্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা ৭০
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি'
ঝরে পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি ওই খেয়া-'পরে করি' ভর—
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে ; ৭৫
দক্ষিণের-দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্তপ্রভাতে,
নবমল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণদিনে, শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায়, মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথরাত্রে ; হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ? ৮০

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপনমনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে। ৮৫
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি' ; সর্ব্ব আবরণ করি লীন

চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত্ত্যকবি, মুহূর্ত্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায় ৯০
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়—
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ! যেমনি অপূর্ব্ব হোক্ নাকো,
তবু আশা করি, যেন মনের একটি কোণে রাখো ৯৫
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুখে সুখে
বিজড়িত— আশা করি, মর্ত্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা ১০০
অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে— ব্যর্থ নাহি হোক্ এ কামনা।

১৮ই আষাঢ়
১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -লিখিত পত্র ও প্রাসঙ্গিক রচনা

১২ মে ১৯২৭

ওঁ

রমণা, ঢাকা।

২৯এ বৈশাখ ১৩৩৪

শ্রীচরণকমলে

ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন, ময়মনসিংহে আপনার জন্মদিনের উৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হলো। এই উৎসবের প্রধান উদ্যোগী সেখানকার উকীল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী নীহারকণা; উৎসবের সমস্ত ব্যয় এঁরাই বহন করেছেন। নীহারকণা "আর্ট ও আহিতাগ্নি"-রচয়িতা শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেনের ভাগিনেয়ী। আপনার প্রতি ভক্তি তাঁর অসাধারণ।

ময়মনসিংহে আরও অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলো যাঁরা আপনার বিশেষ ভক্ত। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাক্‌লাদার এবং শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী শোভনা গুপ্তা।

সম্প্রতি হরানন্দবাবুর বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে; চোরে তাঁদের সর্বস্ব নিয়ে গেছে। একটা সুট্-কেস খুল্‌তে না পেরে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো; সেই সুট্-কেসে আপনার কতকগুলি চিঠি ছিলো, সেইগুলি অপহৃত বা দগ্ধ হয় নি। এতে শোভনা আনন্দিত হয়ে পিতাকে ব'লেছিলেন— বাবা, গহনা কাপড় জামা গেছে, আবার হবে; কিন্তু

চিঠিগুলি গেলে যে ক্ষতি হতো তা তো পূরণ হতো না। চিঠিগুলি যে বেঁচেছে এই আমাদের পরম লাভ ও আনন্দের বিষয়!

শোভনার এই উক্তি ময়মনসিংহ-ময় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

আমি আমার অভিভাষণে জগতের সকল কবির চেয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ ব'লেছি ব'লে কেউ কেউ আমার উপর বিরক্ত হয়েছে শুন্‌লাম। কিন্তু এও শুন্‌লাম যে তাঁরা আপনার রচনা হয় একটাও বা অধিক পড়েন নি। এই রকম মূঢ় লোকেরাই আপনার অপূর্ব্ব দানের মহামূল্য হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারে না। তাদের আপত্তি আমি তুলনায় সমালোচনা করেছি। আমি এই কর্ম্ম ক'রে বহু কাল থেকে বহু লোকের বিরক্তি-ভাজন হয়েছি; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিবাদ প্রথম আমিই প্রবাসীতে তাঁর "আলেখ্য" বই সমালোচনা-প্রসঙ্গে করি। জীবনের অবশিষ্ট দিন কটাও আপনার মহিমা কীর্ত্তন ও প্রচার করেই কাট্‌বে। আপনার কবিতাগুলি বুদ্ধি ও মনের শৃঙ্খল মোচন করে, আপমার গানগুলি বাঙালীর জীবন-বেদ! শোকে দুঃখে সান্ত্বনা, আনন্দে উৎসাহ, ক্লান্তিতে রসায়ন! আপনার প্রবন্ধগুলি যুক্তির শাণ-যন্ত্র! এই সত্য জানা কথাও লোককে বোঝাতে হয় এই আমার দুঃখ।

সেবক

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪ এপ্রিল ১৯৩১

CHARU BANDYOPADHYAY, M.A.
LECTURER, DACCA UNIVERSITY
House Tutor, Dacca Hall

UNIVERSITY OF DACCA
Dacca Hall
RAMNA, DACCA
১লা বৈশাখ ১৩৩৮

শ্রীচরণকমলে নিবেদন,

আজ নববর্ষে আপনাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি। আমার জীবনের শিক্ষাদীক্ষা আনন্দ অনেকখানি আপনারই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান। এইজন্য আপনি জগদ্‌গুরু হলেও বিশেষ ক'রে আমার গুরু। আমি নিত্য আমার আহ্নিককৃত্যের পরে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞ অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কল্‌কাতা থেকে ঢাকায় আসায় আমার সকল রকমে সুবিধা হলেও আপনার দর্শন লাভে বঞ্চিত হয়ে থাকায় বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়ে আছে। আপনার জন্মোৎসবে এবার আপনার দর্শন পাওয়ার জন্য বিশেষ উৎসুক হয়ে আছি।

আপনাকে আমি নিত্য স্মরণ করলেও আমি আপনাকে পত্র লিখ্‌তে সাহস করি না। আমি যদি কখনো পত্র লিখি তবে আপনার সুবিধা হলে উত্তর দিবেন, নতুবা দিবেন না, তাতে আমার কোনো দুঃখ হবে না।

এখানে রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আছেন, তাঁকে আপনি চেনেন। তিনি বাংলা ভাষার গীতিকবিতার একটি চয়নিকা কর্‌ছেন। আমাকেও তিনি সঙ্গে নিয়েছেন। আমরা আদিমতম বাংলা থেকে আরম্ভ করে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লেখা কবিতার মধ্যে থেকে উৎকৃষ্ট কবিতা বেছে নিয়ে মনোজ্ঞ চয়ন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। আপনার কবিতা থেকে বাছাই ক'রে নেওয়া আমাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ হয়েছে। আপনার কবিতা দিয়েই বইখানি ভ'রে দিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু মোটের উপর আপনার কবিতা চল্লিশটির বেশি নেওয়া যাবে না। এখন আমাদের সমস্যা হয়েছে কোনটি রেখে কোনটি দেওয়া যায় তা স্থির করা। আমি যেটি নিতে চাই, তিনি বলেন অন্যটিই বা না নেওয়া যাবে কেন। সবই নিতে ইচ্ছে করে ব'লে আপনার কাছে এসে আমাদের নির্ব্বাচন থেমে গেছে। সে যাই হোক, যে কোনো চল্লিশটি কবিতা গ্রহণ ক'রে আমাদের চয়নিকার গৌরব বৃদ্ধি কর্‌তে পারি এই অনুমতি আপনার কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি।

আর একটা প্রার্থনাও আমাদের আছে। যদি আপনি অনুগ্রহ ক'রে ঐ কাব্য চয়নিকার একটি ভূমিকা লিখে দেন তবে আমাদের সৌভাগ্যের কথা হয়। বাংলা গীতিকবিতার উৎপত্তি পরিণতি বিশেষত্ব সম্বন্ধে আপনি যদি কিছু লিখে দিতে স্বীকৃত হন তা হলে আমরা পরম সৌভাগ্য বিবেচনা কর্‌ব।

আমাদের এই চয়ন ইংরেজী প্যাল্‌গ্রেভের গোল্‌ডেন ট্রেজারী অফ সঙ্‌স্‌ এণ্ড লিরিক্‌স্‌ চয়নের অনুযায়ী কর্‌বার ইচ্ছা। খুব সুন্দর ক'রে ছাপতে রাজি হয়েছেন এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস।

এখন আমাদের সাফল্যের নির্ভর আপনার দয়ার উপর।

প্রণত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

১১ অক্টোবর ১৯৩২

CHARU BANDYOPADHYAY, M.A.
LECTURER DACCA UNIVERSITY
House-Tutor, Dacca Hall

UNIVERSITY OF DACCA
Dacca Hall
RAMNA, DACCA

১১ অক্টোবর ১৯৩২

শ্রীচরণকমলে অসংখ্য প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

আমার জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ বিজয়ার পরদিন পেয়ে ধন্য হলাম, এই আশীর্ব্বাদ আমার জীবনে পাথেয় হ'য়ে থাকবে।

আপনার বৈশাখ নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতার দু-একটি স্থান একটু অস্পষ্ট হ'য়ে আছে আমার কাছে। কবিতার দ্বিতীয় ষ্ট্যাঞ্জায় আছে—

ছায়ামূর্ত্তি যত অনুচর
দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হ'তে ছুটে আসে।

এই ছায়ামূর্ত্তি অনুচর কাহারা?

পরের এক ষ্ট্যাঞ্জায় আছে—

সকরুণ তব মর্ম্ম সাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-পরে।

বৈশাখের করুণ মর্ম্ম ও শান্তিপাঠ কি? বৃষ্টি বর্ষণ? বৈশাখের দুঃখ কি? তা'র তপস্যা-লব্ধ মেঘজাল?

এই দুটি স্থানের সংশয় মোচন করলে উপকৃত হবো।

আমি আপনার চয়নিকা ও সঞ্চয়িতার কবিতাগুলির একটি ব্যাখ্যা লিখ্‌বার আয়োজন করছি। এর আগে অজিত, আবদুল ওদুদ, কুমুদনাথ দাস প্রভৃতি যাঁরা আপনার কাব্য-আলোচনা করেছেন তাঁরা কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত ভাব মাত্র নির্দ্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন। আমি কবিতাগুলির অন্তর্গূঢ় ভাব ছাড়া শব্দ ও বাক্যের সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব। এখানে অনেকে অতি বিজ্ঞ

রকমের ব্যাখ্যাপুস্তক বাহির করে বিক্রয় করছেন। তা ছাড়া অনেক অধ্যাপক এসে আমার বই থেকে আমার টীকা-টিপ্পনী লিখে নিয়ে গিয়ে অধ্যাপনা করেন। এইজন্য আমি মনে করছি আমার নোটগুলি আমিই আমার নামে প্রকাশ করব। এ সম্বন্ধে আমি আপনার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ চাই। আমার বইয়ের নাম রাখব মনে করেছিলাম রবি-রশ্মি। রবি-রশ্মি-বিশ্লেষণ রাখলে বেশ হতো, কিন্তু বড় হ'য়ে যাবে। রবিচ্ছবি, রবির বর্ণচ্ছটা প্রভৃতি নামও মনে হয়েছে। কিন্তু সকলগুলির মধ্যে রবি-রশ্মি নামটিই আমার মনঃপূত হচ্ছে। আপনি তো অনেকের ছেলে-মেয়ের নাম রেখে দেন, আমার এই শেষ পূজার অর্ঘ্যের নাম নির্ব্বাচন আপনি করে দিলে বেশ হয়। রবি-রশ্মি যদি আপনি সমর্থন করেন তবে ঐ নামই রাখ্‌ব। সাত-আট বৎসর ক্রমান্বয়ে আপনার কাব্য পড়িয়ে আমার যা-কিছু জ্ঞান সংগ্রহ হয়েছে, সেইগুলি একত্র ক'রে তার সঙ্গে আমার আযৌবনের পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা মিলিয়ে এই অর্ঘ্য রচনা করব। আমার শক্তির অল্পতায় তা হয়তো আপনার পূজার উপযুক্ত হবে না, তথাপি আমার ঐকান্তিক আন্তরিকতা এই পূজার মধ্যে আমি নিবেদন ক'রে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে চাই। আমার জীবনের কাজ ফুরিয়ে এসেছে। এইবার বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে শান্তিনিকেতনে আপনার পদপ্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নেবো এই অর্ঘ্য হাতে বহন ক'রে।

প্রণত সেবক

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪ নভেম্বর ১৯৩২

CHARU BANDYOPADHYAY, M.A.
LECTURER, DACCA UNIVERSITY.
House-Tutor. Dacca Hall

UNIVERSITY OF DACCA,
Dacca Hall
RAMNA, DACCA.

২৪ নভেম্বর ১৯৩২

শ্রীচরণকমলে প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার বসন্ত নামক পুস্তকে একটি গান আছে সেটি গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৫৮ পৃষ্ঠায়ও আছে। সেই গানটির ইংরেজী অনুবাদ ললিত চাটুজ্জে মশায় করেছেন এবং তাঁর একখানি ইংরেজী কবিতা সঞ্চয়নের মধ্যে সেটি সন্নিবেশিত করেছেন। সেই বইখানি এখানকার আই-এ পরীক্ষার পাঠ্য। জগন্নাথ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক সেই ইংরেজী অনুবাদের অর্থ জান্‌বার জন্য ইউনিভার্সিটি আর কলেজের অনেক অধ্যাপকের কাছে ঘুরে শেষে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি যা হোক একটা অর্থ তাঁকে বাৎলে দিয়েছি। কিন্তু আমিও নিশ্চিত হবার জন্য আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। যদি দয়া ক'রে এই গানটীর অর্থ আমাকে জানান তো সুখী ও উপকৃত হবো। বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ দুটিই এই সঙ্গে দিলাম।

সেবক

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ধীরে ধীরে ধীরে বও,

ওগো উতল হাওয়া।

নিশীথ রাতের বাঁশি বাজে,

শান্ত হও গো শান্ত হও।

আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি'
ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে কানে
মৃদু মৃদু কও ॥
তোমার দূরের গাথা বনের বাণী
ঘরের কোণে দেহ আনি' ॥
আমার কিছু কথা আছে
ভোরের বেলার তারার কাছে,
সেই কথাটি তোমার কানে
চুপি চুপি লও ॥

এখানে এই আমিটি কে ? কেবল মাত্র প্রদীপশিখা, না কবিও ? আমার কিছু কথা আছে—সেই কথা কি ? এবং সেই কথা ভোরের বেলার তারাকে বল্‌বার তাৎপর্য্য কি ?

THE NIGHT LAMP

Softly, softly, softly blow
O Night-wind, O restless wind ;
Thrills a note on Midnight's pipe !—
Hush, O wind, go soft and slow.
I, the night-lamp for thy sake
In fear and trembling keep awake,—
Tell thy secret in mine ear,
But hush, O wind, speak it low.
News from far-off winds in spring
Unto my room-corner bring ;
I too have a word to send
To the stars at darkness' end :
Take it in thine ear, O wind—
Take it softly ere you go.

CHARU BANDYOPADHYAY, M.A.
LECTURER, DACCA UNIVERSITY
House-Tutor, Dacca Hall

UNIVERSITY OF DACCA,
Dacca Hall
RAMNA, DACCA

১৩ জানুয়ারি, ১৯৩৩

পৌষসংক্রান্তি

শ্রীচরণকমলে ভক্তিপূর্ণ অসংখ্য প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

আমার কয়েকটি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়েছে। এখানে মোহিতলাল মজুমদার, শহীদুল্লাহ্, আর আমি বাংলা পড়াই। আপনার চয়নিকা, চিত্রা, মানসী, আর সঙ্কলন, সাহিত্য, গল্পগুচ্ছ, বি-এতে পাঠ্য আছে। সেই বইগুলির কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধে মোহিত-বাবু শনিবারের চিঠির ভাবাবিষ্ট হ'য়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা আমার মত চায়। আমার নিজের মতের সমর্থনের জন্য আমি আপনার আশীর্ব্বাদ ও মত চাই।

১। এবার ফিরাও মোরে কবিতা সম্বন্ধে মোহিত-বাবু বলেন—কবি যদিও এবার ফিরাও বলেছেন, কিন্তু তিনি ফিরেন নি, সেই পূর্ব্বেকার মতনই আদর্শবাদ ভাববাদ আইডিয়ালিজ্‌ম্ নিয়েই তিনি কল্পনাবিলাস করেছেন, কিন্তু প্রকৃত বৈষয়িক কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হন নি। এবার ফিরাও মোরে কবিতার নামটিও যথোপযুক্ত হয় নি, এবার নিয়ে যাও মোরে হওয়া উচিত ছিল। এই রকম ধ্বংসমূলক সমালোচনা তিনি শনিবারের চিঠিতেও লিখেছেন।

২। সিন্ধুপারে কবিতার সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ্ বলেন যে সেখানে পরজীবনের কোনো কথা বলা হচ্ছে না, তা যদি হ'ত তা হ'লে সিন্ধুর ওপারে নাম হ'ত, তাতে এই ইহজীবনের কথাই বলা হয়েছে।

বাসরঘরের যে দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা কবির কাব্যের সৌন্দর্য্যভাণ্ডারের ছবি।

৩। উৎসর্গের অন্তর্গত প্রবাসী নামক কবিতায় কবি বলেছেন—

মনে হয় যেন সে-ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে-দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।

আবার কবি বলেছেন—

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

কিন্তু এর মাঝখানেই আবার বল্‌ছেন—

লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।

যদি কবির সঙ্গে ধরণীর তৃণ জল ধূলার যোগ অনাদি কাল থেকে থেকে—থাকে, তবে আবার তারকার সঙ্গে যোগ থাকে কেমন ক'রে?

৪। গীতাঞ্জলির অন্তর্গত ভারততীর্থ কবিতায় আছে—

এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।

মহা-মানবের সাগর-তীরে চিত্ত জাগ্রত হবে, তাতে মহাসাগরের সঙ্গে তো ওতঃপ্রোত [ওতপ্রোত] যোগ হবে না।

৫। উর্ব্বশী কবিতায় মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল মানে কি? মুনিরা সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তপঃভ্রষ্ট হয়, অথবা যে-কেউ তপস্যা করছে কিছু প্রকাশ করবার সৃষ্টি করবার লাভ করবার, সে তা চরমসুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে চায়? মোহিত-বাবু বলেন যে এই উর্ব্বশী

কবিতার মধ্যেও নাকি আগাগোড়া ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা হয় নি। যিনি অ্যাবস্‌ট্র্যাক্ট্‌ অ্যাব্‌সোলিউট্‌ ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বিউটী, তাঁকে বর্ণনা করতে গিয়ে সাকার মূর্ত্ত ক'রে তোলা হয়েছে।

ফিরিবে না ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচল-বাসিনী উর্ব্বশী।

এই ষ্ট্যাঞ্জাটির অর্থ কি?

আরো অনেক বিবাদ আছে। তবে এই কয়টির বিতণ্ডাই প্রধান। আপনার অভিমত পেলে আমি জোর ক'রে আমার মত প্রকাশ করতে পারব। আর এগুলির ব্যাখ্যা আপনার কাছ থেকে জানা হ'য়ে গেলে আমার রবি-রশ্মির মধ্যেও কাজে লেগে যাবে। বই লিখ্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন এই মহান্‌ সঙ্কল্প যেন শ্রদ্ধার সহিত উদ্‌যাপন করতে পারি।

আমাদের ঢাকা-হল থেকে ছাত্রদের বাৎসরিক পত্র শতদল প্রকাশিত হয়। তার সম্পাদক আপনার কাছে আশীর্ব্বাদ-বাণী প্রার্থনা ক'রে পত্র লিখেছিল শুন্‌লাম। সে এখনো কোনো লেখা না পাওয়াতে আপনার কাছে আমাকে দিয়ে সুপারিশ করাতে চায়। যদি কিছু লেখা দু-চার লাইনও পাঠান ছাত্রেরা কৃতার্থ হবে।

সেবক

[চারু বন্দ্যোপাধ্যায়]

৭ '

অক্টোবর ১৯৩৩

CHARU BANDYOPADHYAY, M.A.
LECTURER, DACCA UNIVERSITY.
HOUSE-TUTOR, DACCA HALL

UNIVERSITY OF DACCA
Dacca Hall
Ramna, Dacca.

বিজয়াদশমী ১৩৪০

শ্রীচরণকমলে

আজ আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি।

আমি যে গুরুভার ব্রত গ্রহণ করেছিলাম, তা ভগবানের কৃপায় ও আপনার আশীর্ব্বাদে উদ্‌যাপন করবার কাছাকাছি এনেছি—রবিরশ্মি বিশ্লেষণ প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। বলাকার পরিচয় লিখ্‌ছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো পাল্লা দিয়ে পারবার জো নেই—প্রত্যেক মাসে নূতন নূতন বই বেরুচ্ছে, আর আমার কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে, কর্তব্য গুরুতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু আমি অবিশ্রাম পরিশ্রম ক'রে কাজ ক'রে চলেছি। ফুলস্ক্যাপ কাগজের ৬৫০ পৃষ্ঠা টাইপ করা হয়েছে। বোধ হয় হাজার পৃষ্ঠার কাছাকাছি হবে।

ক্ষণিকার মধ্যে আবির্ভাব নামে যে কবিতাটি আছে সেটির অন্তরের কথাটি কি? সে কি কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অসাময়িক আবির্ভাব বা অনুভব? অথবা জীবনদেবতার আবির্ভাব? কে 'বাসর-ঘরের দুয়ারে করালে পূজার অর্ঘ্য বিরচন?' এটির একটু দিগ্‌দর্শন করিয়ে দিলে উপকৃত হবো।

খেয়ার মধ্যে 'অনাবশ্যক' নামে একটি কবিতা আছে, তারও তাৎপর্য্য আমাকে জানালে সুখী হবো। এই দুটি কবিতা সম্বন্ধে আমার একটু অস্পষ্টতা আছে। অনাবশ্যক কবিতাটির কথা একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু আপনি কি বলেছিলেন তা এখন মনে নেই।

এখন লেখবার সময়ে খট্‌কা লেগেছে। এখানে এমন কেউ শ্রদ্ধাবান্‌ নেই যার কাছে একটু পরামর্শ করতে পারি। তাই আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার অনেক উপদ্রবই ক্ষমা করেছেন, এও ক্ষমার্হ হবে আশা করি।

শ্রীমান্‌ প্রশান্ত মধ্যে এখানে এসেছিলেন। তিনি বল্‌ছিলেন যে আপনি একটি কবিতা-সঞ্চয়ন করছেন। তার পুরাতন বিভাগে আমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি তা হ'লে ভালো হয়। আমি তো এ আমার সৌভাগ্য ব'লে মনে করব। কিন্তু এতদূর থেকে আমি কি কিছু কাজে লাগ্‌তে পারি আপনার? খুব ইচ্ছা ছিল এই ছুটিতে গিয়ে আপনার কাছে থাক্‌ব। কিন্তু হ'য়ে উঠ্‌ল না। গ্রীষ্মের ছুটিতে গিয়েছিলাম, ঐ আশায়। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তখনো আপনি দার্জিলিং থেকে নামেন নি। যদি আমাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো সম্ভব হয়, তবে আমাকে আদেশ করলে আমি কৃতার্থ হবো।

রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কবিতার কতকগুলি অনুবাদ করেছেন ইংরেজীতে। তিনি সেইগুলি অনেককে শুনিয়েছেন, অনেকেই ভালো বলেছেন। আমিও কতকগুলি শুনেছি, আমারও ভালো লেগেছে। তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে আপনি সেগুলি একবার দেখেন। তবে লেখকের নিজের মুখে শোনা ও পড়ার মধ্যে তফাৎ আছে। তাই তিনি ইচ্ছা করেন যে যদি কখনো আপনার সুবিধা হয় তিনি গিয়ে আপনাকে কিছু শোনাতে পারেন। আর তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীকে আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে ব'লে ঐ কবিতাগুলি প্রকাশের বন্দোবস্ত ক'রে দেন, এবং একটি ভূমিকা লিখে দেন। এই বই থেকে যা লাভ হবে, তার কিছু অংশ তিনি বিশ্বভারতীকে সমর্পণ করতে ইচ্ছা করেন, যদি বিশ্বভারতী অনুগ্রহ ক'রে এই সামান্য দান গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত তিনি জান্‌তে চান।

প্রণত সেবক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

CHARU BANDYOPADHYAY M.A.
LECTURER, DACCA UNIVERSITY

SEGUN-BAGAN
Ramna, Dacca

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

শ্রীচরণকমলে অসংখ্য প্রণাম পূর্বক নিবেদন,

আপনার পত্রে বিশ্বভারতীর আর্থিক অসচ্ছলতার সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। কনককে যে আপনি নিতে পারলেন না, তার জন্য আমার অন্য দুঃখ নেই, কেবল সে যে আপনার সান্নিধ্য ও প্রভাব থেকে বঞ্চিত হলো এই তার ও আমার দুর্ভাগ্য ব'লে মনে হচ্ছে। আপনার আশীর্বাদে কনক কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজের স্কুল বিভাগে একটি কাজ পেয়ে সেইখানে গেছে। এখানে তার আর্থিক লাভ হবে, কিন্তু আপনার স্নেহাশ্রয়ে তার যে পরম লাভ হতো তা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে রইল। তাকে ব'লে দিয়েছি সে মাঝে মাঝে আপনার চরণধূলি নিতে শান্তিনিকেতনে যাবে। তার কাছ থেকে আমি যা শুনেছি তাতে জেনেছি যে আমার প্রতি আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ সমানই আছে, সেও আপনার স্নেহ পেয়ে আনন্দিত ও ধন্য হয়ে এসেছে। আমার আর আট মাস পরে এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন আমি গিয়ে আপনার চরণতলে বস্‌ব এবং এই বানপ্রস্থের কালে আপনার ও বিশ্বভারতীর সেবা ক'রে আমার শেষ কয়টা দিন অতিবাহিত কর্‌ব।

আপনার বৈশাখ কবিতায় ছিল "মুখে তুলে করাল পিনাক", পিনাক বাদ্য-যন্ত্র নয় ব'লে সেই লাইনটি এখন পরিবর্তন করেছেন "বিষাণ ভয়াল"। কিন্তু আমি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল পড়াতে গিয়ে দেখ্‌লাম তাতে পিনাক বাদ্য-যন্ত্রের উল্লেখ আছে—"তের হাজার বাজাইল রুদ্রাক্ষ পিনাক" ১৯৯ পৃষ্ঠা। তবে এই পিনাক হয়তো তারের যন্ত্র ছিল, মুখের বাদ্য নাও হ'তে পারে।

আর একটি কথা অনেক দিন থেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা ছিল, আজ জানাই। আপনার বিসর্জন নাটকখানি এখানকার বি-এ অনার্স ও পাসের পাঠ্য, আমি পড়াই। যত সংস্করণ হয়েছে তার প্রায় সবগুলিই আমি সংগ্রহ করেছি। আমার মতে শ্রীমান্ প্রশান্ত মহলানবিশ ১৩৩৩ সালে বিশ্বভারতী থেকে যে সংস্করণ বাহির করেছিলেন সেইটিই সর্বোত্তম, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সংস্করণগুলিতে সৌন্দর্য ও নাটকত্বের হানি হয়েছে। দেবীর মন্দিরে রাজা পূজায় আসীন এবং সেই সময়ে অপর্ণা এসেই রাজার বিরুদ্ধে রাজার কাছে নালিস ক'রে বল্লে—"বিচার প্রার্থনা করি"—এটি চমৎকার Dramatic Exposition হয়েছে। সেই দৃশ্যটি বাদ দেওয়া সমীচীন হয়নি। আর তা ছাড়া হাসি ও তাতাকে বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু তারাও সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাদ পড়েছে। অপর্ণার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে সেই বালক-বালিকার ভয় ও বেদনা মিশে রাজাকে অধিকতর দৃঢ়সঙ্কল্প করেছিল, রাজা যেই আদেশ দিলেন যে বলি নিষেধ হলো, হাসি অমনি তার ভাইকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল যে "রক্তের সব দাগ মুছে গেছে"—এর মধ্যেও একটি সুন্দর ইঙ্গিত ছিল, সেটি আমরা হারাচ্ছি সংক্ষিপ্ত সংস্করণে। এই রকম পদে পদে অনেকগুলি Dramatic Irony নষ্ট হয়ে গেছে। তাতে ক'রে বইখানির সৌন্দর্যহানি হয়েছে মনে করি। আমার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী আমার সঙ্গে একমত হয়ে আপনাকে তাদের অনুরোধ জানাতে বলেছে যে যদি সম্ভব হয় তবে অবিলম্বে বিসর্জনের একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাহির করবার জন্য আপনি আদেশ দিলে আমরা সকলে সুখী হব ও সকল সাহিত্য-রসিক সুখী ও কৃতজ্ঞ হবেন। বাংলা-সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ নাটকখানিকে বিকলাঙ্গ দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না। আশা করি আমাদের আবেদন আপনি বিশেষ বিচার ক'রে দেখ্‌বেন।

প্রণত সেবক

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫ জানুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

১ গোবিন্দ দাস রোড, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

২০এ জানুয়ারি ১৯৩৮

শ্রীচরণকমলে

প্রণাম পূর্বক নিবেদন,

আপনার নিজহাতে-লেখা পত্র পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু এই পত্রে আমার প্রার্থনার স্পষ্ট উত্তর পেলাম না।

আমার রবিরশ্মি বইয়ের পূর্বভাগ আমি আপনার নামে ও অজিত চক্রবর্তী প্রভৃতি আরও আমার কয়েকজন বন্ধু যাঁদের কাছ থেকে আমি আপনার কাব্য-রসাস্বাদনে সাহায্য পেয়েছিলাম তাঁদের নামে-উৎসর্গ করতে চাই। কিন্তু আমার পুস্তকের প্রকাশক কল্‌কাতা-ইউনিভার্সিটি আপত্তি তুলেছেন যে অপরের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আপনার নাম দেওয়াতে আপনার সম্মতি আছে কি না। উৎসর্গপত্রের একটা নকল এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি ; আপনি দেখে আপনার সুস্পষ্ট সম্মতি দিলে সুখী হব।

প্রণত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ওঁ

কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

এবং

আমার বাল্যসখী

শ্রীমতী নলিনীবালা রায়

ও

পরলোকগত বন্ধুবর

নলিনীকান্ত সেন, সুরেশচন্দ্র আইচ, অজিতকুমার চক্রবর্তী

এবং

অন্যান্য যে-সকল পরিচিত অথবা অপরিচিত সাহিত্যসুহৃৎ
যাঁহাদের বাক্য ও রচনা হইতে আমি
রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের অমৃত-রসাস্বাদনে
সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি
তাঁহাদের সকলের উদ্দেশে
এবং
সকল কালের ও সকল দেশের রবীন্দ্রকাব্যরসিক
মহানুভবদিগের উদ্দেশে
আমার এই অকিঞ্চিৎকর ব্যর্থ প্রয়াস
পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত
উৎসর্গ করিলাম

১০

১৫ মে ১৯৩৮

ওঁ

"মাতৃকা"
৪৪এ রাণী হর্ষমুখী রোড্, পাইকপাড়া, কলিকাতা
১৫ই মে, ১৯৩৮

শ্রীচরণকমলে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও নিবেদন,

আমার রবিরশ্মি সম্বন্ধে আপনার অভিমত পেলাম। তাতে প্রশংসার লেশমাত্র নেই। এতে আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম আপনি আমাকে কত আপনার জন মনে করেন। বাহির দেউড়ি থেকেই সস্তা প্রশংসা দিয়ে আমাকে বিদায় ক'রে দেন নি। এই পরম সৌভাগ্যে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি। এবং আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম বারবার জানাচ্ছি। ডক্‌টর সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতির বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখ্‌লেই মনে

হয় সেটা কতখানি মেকি, কী দারুণ অত্যুক্তি, আর কী বিষম ব্যাজস্তুতি।

প্রণত সেবক

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

১৬ মে ১৯৩৮

ওঁ

"মাতৃকা"

৪৪এ রাণী হর্ষমুখী রোড্, পাইকপাড়া,

কাশীপুর পোষ্ট্-অফিস, কলিকাতা

২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

শ্রীচরণকমলে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও নিবেদন,

আমার ছেলের বিয়ে। আমার পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতার সনির্বন্ধ আকাঙ্ক্ষা আপনার আশীর্বাদ লাভ।

প্রণত সেবক

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ— ছেলের নাম পুলক, মেয়ের নাম মায়া।

চাঁদপুর রবীন্দ্র-জয়ন্তীর জন্য লিখিত ও পঠিত অভিনন্দন পত্র

রবীন্দ্র-বন্দনা

হে কবি-গুরু, তোমার এই জন্মদিনে আমরা তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। তোমার জন্মলাভে আমরা লাভবান্ হইয়াছি নানা রকমে, সেই জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাকে আমরা বন্দনা করি।

হে রবি, তোমার উদয়ে বঙ্গদেশ হইতে সমগ্র ভারতে তোমার ভাতি উদ্‌ভাসিত হইয়া পড়িয়াছে, তোমার প্রতিভায় সমগ্র জগৎ প্রভাস্বর হইয়াছে। তুমি প্রদীপ্ত, তোমার প্রোজ্জ্বল প্রভায় বাংলাদেশের মানস-কাননে নববসন্তের অভ্যুদয় হইয়াছে। তুমি প্রাণময়, তোমার সন্দীপন-মন্ত্রে বাংলার সুপ্ত প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার মহিমার অসামান্য ঐশ্বর্য্য ও অকৃপণ দানের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ শ্রদ্ধার সহিত তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

হে ঋষি, তুমি সত্যদ্রষ্টা, সত্যভাষী, সত্যপ্রকাশক। তুমি বিশ্বমানবের বন্দনীয়। তোমার বাণী শ্রবণ করিবার জন্য বিশ্ববাসী উৎকর্ণ হইয়া আছে, তোমার তূর্য্যকণ্ঠ অকুণ্ঠিত হইয়া সত্য নির্দ্দেশ করিতেছে। তোমার সত্যনির্দ্দেশ আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সার্থক হোক, আমরা যেন তোমার প্রচারিত সত্যমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারি।

হে বিশ্ব-পুরোহিত, তুমি বিশ্ব-মিলন-যজ্ঞের মহা-ঋত্বিক, বিশ্বের কল্যাণমন্ত্র পাঠ করিয়া তুমি বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন ভারতকে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়াছ। তুমি ভূমার উপাসক, ব্রহ্মের পূজক, তুমি সঙ্কীর্ণ ভারতকে মহত্ত্বের উদার বৃহৎ ক্ষেত্রে মুক্তি দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছ। ভারতের ঋষিদের বরেণ্য শিব-সঙ্কল্প তোমার কণ্ঠে পুনরুদ্‌গীত হইয়াছে। তোমার আরব্ধ এই যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। হে বরণীয়, তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

হে স্বদেশব্রত, স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্ত্তি তুমি। তুমি এই সোনার বাংলাকে ভালোবাসিয়াছ, তুমি ভারতের ভুবনমনোমোহিনী রূপকে বন্দনা করিয়াছ। আবার তুমিই কাহারও প্রতি বিদ্বেষ না রাখিয়া মাতৃভূমিকে ভালোবাসিতে শিখাইয়াছ, মাতার কাছে সকল সন্তানই সমান সমাদরের যোগ্য এবং মাতার কোলের কাছে হিংসা দ্বেষ অশোভন—এই মহাসত্য তুমিই প্রচার করিয়াছ। দেশকে তুমি সত্য করিয়া চিনিতে শিখাইয়াছ, পরের দ্বারে ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ বলিয়া আত্মচেষ্টা ও আত্মশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা কর্ম্মের ভিতর দিয়া স্বদেশের সেবা করিতেও তুমিই শিখাইয়াছ। হে সাত্ত্বিক স্বদেশ-হিতৈষী, তুমি অপরের অন্যায়ে বজ্রকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছ, আবার স্বদেশের অন্যায়ে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিয়াছ। অন্যায় যে করে ও অন্যায় যে সহে তাহাদের উভয়ের উপরেই রুদ্রের বজ্রাভি-সম্পাত তুমি প্রার্থনা করিয়াছ। তুমি আমাদিগকে সেই সাহস দাও যাহাতে আমরাও তোমার ন্যায় অন্যায়কে অনায়াসে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিতে পারি; সেই শক্তি দাও যাহাতে আমরা যাহা ন্যায় বলিয়া মনে করি তাহা অকুণ্ঠিত সাহসে পালন করিতে পারি। তুমি আমাদিগকে সেই প্রেরণা দাও যাহাতে আমরা সত্য শিব ও সুন্দরকে আমাদের জীবনে বরণ করিয়া লইতে পারি।

হে কবি, বঙ্গভারতীকে তুমি বিশ্বভারতীতে পরিণত করিয়াছ; বঙ্গভারতীর বীণার তন্ত্রে যে অনন্ত সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, তাহা তুমি বিচিত্র মূর্চ্ছনায় প্রকাশিত করিয়া তুলিয়াছ। তোমারই রঙ্গমল্লী বীণার আলাপ শুনিবার জন্য চির-উষার ও চির-তুষারের দেশ হইতে চির-উষর দেশ পর্য্যন্ত উৎসুক হইয়া আছে, তুমি যাহা শুনাইয়াছ তাহাতে বিশ্ববাসী মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তোমারই জন্য বাঙালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব্ব, এবং বিশ্বকবিসভায় আমরা তোমারই করি গর্ব্ব! হে রবিকবি, আকাশের যে রবি তোমার মিতা তাহার

রথে মাত্র সপ্তাশ্ব যোজিত, আর তোমায় কাব্য-রথে তুমি সহস্রছন্দের অশ্ব সংযোজিত করিয়াছ। তুমি আশ্চর্য্যকর্ম্মা, তুমি মহামনীষী, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। তুমি পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো সবারই সমানবয়সী, তুমি সকলের বয়স্য বন্ধু, শিশুভোলানাথ তোমার খেলার সাথী, যুবক-যুবতী তোমার যৌবন-নিকুঞ্জের পাখীর গানে সম্মোহিত, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যাহারা পরকালের ডাক শুনিয়া খেয়া পার হইবার জন্য তাহাদের জীবনের নৈবেদ্য সাজাইতেছে তাহাদেরও পরম নির্ভর ও সান্ত্বনা তুমি। হে সার্ব্বভৌম কবি, তুমি সার্ব্বজনীন কবি, সকল লোকের মনের আনন্দ তুমি, সকল লোকের মনের কথা প্রস্ফুট করিয়া তুলিবার সুহৃৎ তুমি, সকলের শোকে সান্ত্বনা, নিরাশার আশা, নিরুদ্যমের সাহস ও উৎসাহ তুমি। তোমাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বন্দনা করি।

হে প্রিয়তম, তুমি যে আমাদের কতখানি প্রিয় তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার মতো ভাষা তুমিই এখনো আমাদিগকে দিয়া উঠিতে পারো নাই। তোমাকে আমরা ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, তুমি আমাদের আত্মার আত্মীয়, মনের মিতা, জীবনের নিয়ন্তা বন্ধু, তোমার নিকটে আমরা অজস্র দান গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞ। কিন্তু ইহা বলিয়াও তোমার প্রতি আমাদের মনের নিগূঢ় প্রীতিটিকে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তুমি আমাদের মুগ্ধ মনের বন্দনা ও অভিনন্দন গ্রহণ করো।

হে যশস্বী, তুমি অমর, তুমি অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়াছ, তোমার প্রাণ-সঞ্জীবনী-শক্তি তোমার স্বদেশে ও স্বজাতির মধ্যে অমৃত হইয়া চিরবিরাজ করিবে। যে বাণী ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আকাশে নিত্যবিরাজিতা, তাঁহাকে তুমি নবভূষণে ভূষিতা করিয়াছ, সেই বাক্‌দেবীই নিত্য তোমার আরতি করিবেন, তোমাকে বিজয়-মাল্য দিয়া স্বয়ম্বরসভায় যে কাব্যলক্ষ্মী বরণ করিয়াছেন তিনি

তোমাকে চিরকাল জয়যুক্ত করিয়া রাখিবেন।

হে নবীন, তোমার মনে চিরযৌবন ও চিরবসন্ত বিরাজিত। তুমি জরাকে পরাজিত করিয়াছ, অস্বীকার করিয়াছ, যৌবনের জয়টীকা তোমার ললাটে সুশোভিত। শত বসন্ত ও শত শরৎ তোমার কণ্ঠের সঙ্গীতে মুখরিত ও ধন্য হোক, শত বর্ষা তোমার কণ্ঠের সুরধুনীকে সঙ্গীত-মুখর করিয়া রাখুক। শঙ্কর তোমাকে নিরাময় রাখুন, যিনি শিব, শিবতর, ময়স্কর, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

রমণা, ঢাকা
২৭এ বৈশাখ ১৩৪০

প্রণত সেবক
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ মে ১৯৩৩

ময়মনসিংহে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ

রবীন্দ্র-পরিচয়

আমি যখন সাবেক হিসাবে স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমার বয়স বড় জোর বারো বৎসর হবে। আমি সেই বয়সে আর সেই বিদ্যা নিয়ে তখনকার সকল বড় সাহিত্যিকের বই প'ড়ে শেষ করেছিলাম। বঙ্কিম-বাবুর সকল উপন্যাস, মাইকেল, হেম, নবীন প্রভৃতি কবির কাব্য, দীনবন্ধু, গিরিশ ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির নাটক আমি পেটুক ছেলের মতনই গিলেছিলাম। বঙ্কিমবাবুর 'সীতারাম' উপন্যাস সদ্যঃ প্রকাশিত হ'লে আমার সেখানি পড়বার আগ্রহ এমন প্রবল হয়েছিল যে দোকানে বই কিন্‌তে যাবার বিলম্ব আমার সয়নি; বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর কাছেই আমরা থাকৃতাম; তাই তাড়াতাড়ি আমি স্বয়ং বঙ্কিমবাবুর কাছে বই কিন্‌তে গিয়ে তাঁর ধমক খেয়ে এসেছিলাম, এবং তিনি যদিও আমাকে বলেছিলেন যে, এ বই তো তোমার মতন ছেলেমানুষের পড়্‌বার নয়, তবু আমি তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়েই দোকান থেকে সেই বই কিনে প'ড়ে তবে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছিলাম। আমার বই পড়ার জন্য এই রকম লোভ থাকা সত্ত্বেও আমি রবীন্দ্রনাথের কোনো বই বা রচনা বি.এ. ক্লাসে পড়ার আগে পড়িনি, এমন কি রবীন্দ্রনাথ নামে যে একজন কবি আছেন এ সংবাদও আমার কাছে পৌছেনি।

বাংলা ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে, ইংরেজী ১৮৯৩ সালে, বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুতে কল্‌কাতায় ষ্টার থিয়েটারে একটি শোকসভা হয়। তখন আমি ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি। বঙ্কিমবাবুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকাতে আমি সেই সভায় উপস্থিত হই, যদিও তখন আমার পায়ের নখে একটা ঘা হ'য়ে আমি এক রকম পঙ্গু হয়েই ছিলাম। সেই সভায় বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ, আর সভাপতি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সেই দিন আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখ্‌লাম, এবং তাঁর মধুর

অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে ও সুন্দর চেহারা দেখে একটু আকৃষ্ট হলাম। তাঁর বক্তৃতার পর সমস্ত শ্রোতা এক বাক্যে চীৎকার করতে লাগলেন—"রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গান।" আমি তখন পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ঐ চীৎকারের কোনো মর্মই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। শোকসভার গাম্ভীর্যহানির আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই গান গাইলেন না। আমিও রবিবাবুর বিশেষ কোনো পরিচয় না পেয়েই বাড়ী ফিরে এলাম।

তার পর দ্বিতীয় দিন রবিবাবুকে দেখলাম আমি যখন ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়ি, ১৮৯৬ সালে, ইউনিভারসিটি ইন্ষ্টিটিউট্ হলে; সকল কলেজের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার সভায় তিনি অন্যতম বিচারক ছিলেন, অপর দুজন বিচারক ছিলেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। সেদিনও সকল শ্রোতা ও দর্শকেরা সভার কার্যশেষে চীৎকার জুড়ে দিলেন, "রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গান!" রবিবাবু অনুরোধ অস্বীকার ক'রে লজ্জাস্মিত মুখে কেবলই ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছেন, আর জনতার চীৎকারও চলছে। আমি জনতার অভদ্রতা দেখে বিরক্ত হ'য়ে উঠে-ছিলাম, একজন ভদ্রলোক কিছুতেই গান গাইবেন না, তবু তাঁকে গাইতে পীড়াপীড়ি করা আমার কাছে অত্যন্ত বেয়াদবী ব'লে মনে হলো। আর মনে হলো যে এমনই বা কি গান যে শোনবার জন্য এমন কাঙ্লামি করতে হবে। আমি বিরক্ত হ'য়ে সভাত্যাগ ক'রে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, দ্বারের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার কানে অশ্রুতপূর্ব মধুর কণ্ঠের স্বরমূর্ছনা ভেসে এসে প্রবেশ করল, আমি অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নীত হ'য়ে চট্ ক'রে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলাম রবিবাবু গান গাইতে আরম্ভ করেছেন। আমি সভায় সাম্নের দিকেই বসেছিলাম, কিন্তু উঠে চ'লে আসার পর আমার সম্মুখে অগ্রসর হবার পথ রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, আমি জনতার ব্যূহ ভেদ ক'রে ভিতরে প্রবেশ করতে না পেরে সেই দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েই মন্ত্রমুগ্ধ স্তম্ভিতের মতন গান শুনতে লাগলাম। সে যেন মনুষ্যকণ্ঠের স্বর নয়, যেমন মধুর তেমনি তীক্ষ্ণ স্পষ্ট, আর গানের

ভাষা সুরের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে। তিনি সেদিন গাইলেন—

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না!
এ কি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা!
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম-বেদনা!
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালী,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে, মিছে যশ ল'য়ে,
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।

তখন আমার নবীন মনে স্বদেশপ্রেমের রঙীন নেশা নূতন লেগেছিল, তাই রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীত আমাকে একেবারে মোহাবিষ্ট ক'রে ফেল্‌লে।

তার পরে আবার আর একদিন ঐ ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ হলে রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদন' নামক নাটিকা পাঠ করেন। তার অল্পদিন আগেই আমার সহপাঠী বন্ধু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ঐ হলেই রবি-বাবুর কবিতার এক সমালোচনা পাঠ করেন। এই দুই সভাতেই

সভাপতি ছিলেন গুরুদাসবাবু। রবিবাবু তাঁর নবরচিত নাটিকা পাঠ করতে উঠে ভূমিকা স্বরূপ বলতে লাগলেন—"কয়েক বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু আমাকে এই হলে কোনো লেখা পড়তে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা করবার সুযোগ আমার হয়নি। সম্প্রতি আজকার মাননীয় সভাপতি মহাশয় আমাকে এখানে কিছু পাঠ করতে অনুরোধ করেন। আমি মনে করলাম যে এই সুযোগে বঙ্কিমবাবুর অনুরোধের ঋণ পরিশোধ করতে পারব, তাই আমি আমার লেখা পাঠ করতে সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার লেখা এখানে পাঠ করতে আমার স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কারণ, অল্প কয়েক দিন আগে এই হলে, এই সভাপতির অধীনে হয়তো বা ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কবিতার বিরুদ্ধ সমালোচনা পাঠ হয়ে গেছে। যিনি সমালোচক, তিনি বয়সে তরুণ। তরুণ বয়স যথার্থ সমালোচনার সময় নয়। তরুণ বয়সে লোকে কবি হতে পারে, কিন্তু সমালোচক হতে হ'লে প্রবীণ বয়সের দরকার। কাঁচা বাঁশে বাঁশী হতে পারে বটে, কিন্তু লাঠি হ'তে হ'লে পাকা বাঁশের দরকার। মানুষকে ভাইপো হয়েই জন্মাতে হয়, কিন্তু অনেক লোকে জ্যাঠা হবার পূর্বেই জ্যাঠাইয়া যান। সকল মানুষের মধ্যে সকল গুণ থাকে না, আর তা প্রত্যাশা করাও যায় না। ময়ূরের পুচ্ছ আছে কিন্তু তার কণ্ঠে কোকিলের সুস্বর নেই, আবার কোকিলের কণ্ঠ আছে, তার ময়ূরের মতন সুন্দর পুচ্ছ নেই। ইক্ষুদণ্ডে আম্রফল ফলে না, আর আম্রশাখায় ইক্ষুরস পাওয়া যায় না। অতএব কবির কাব্যে কি আছে তারই বিচার না ক'রে, কি নাই তাই নিয়ে তাকে দোষারোপ করলে তার প্রতি অবিচার করা হয়। তাই আজ আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এখানে এসেছি আমার লেখা পাঠ করতে।"

এই ভূমিকা ক'রে তিনি গান্ধারীর আবেদন পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। সে কী কণ্ঠস্বর, কী সুন্দর উচ্চারণ, কী কবিত্বমধুর ওজস্বী ভাষা! সমস্ত শ্রোতা স্তব্ধ হ'য়ে শুনতে লাগলেন।

সেই সময় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের পত্নীর অপমানসূচক লেখা প্রকাশ ক'রে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। গান্ধারীর উক্তির মধ্যে আমরা রবিবাবুর ধিক্কার অনুমান ক'রে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলাম, যখন শুন্‌লাম রবিবাবু গান্ধারীর জবানী বল্‌ছেন—

পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ ল'য়ে বাধে অহরহ,— ভালো মন্দ
নাহি বুঝি তার,— দণ্ডনীতি ভেদনীতি
কূটনীতি কত শত,— পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে'— মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহ কর্মে শান্ত অন্তঃপুরে।
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ-অনল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হ'তে,—পুরুষেরে ছাড়ি'
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ 'পরে
কলুষ পরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ,— পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে-নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ,
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ!

এই নাটিকা পাঠ শেষ হ'লে গুরুদাসবাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবুকে দিয়ে রবিবাবুকে ধন্যবাদ দেওয়ালেন। হেমেন্দ্রবাবু প্রথমে কিছুতেই সম্মত হচ্ছিলেন না, শেষে গুরুদাসবাবুর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হ'য়ে ধন্যবাদ দিলেন, সে যেন বেহুলার অনুরোধে চাঁদ সদাগরের হাতে মনসাদেবীর পূজা পাওয়া।

যখন রবিবাবু হেমেন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ ক'রে কবিত্বরসালো তিরস্কার করছিলেন, তখন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি হেমেন্দ্রবাবুর কয়েকজন বন্ধু সভাগৃহ ত্যাগ ক'রে চলে গিয়ে নিজেদের বিরক্তি ও প্রতিবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

ধন্যবাদ প্রভৃতি শেষ হলে, সমস্ত শ্রোতা আবার চীৎকার আরম্ভ কর্‌লে— রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গান!

আমি এর পূর্বে একদিন রবিবাবুর গানের আস্বাদ পেয়েছি, আজ আর জায়গা ছেড়ে নড়্‌বার নামও কর্‌লাম না। অনেক অনুরোধের পর রবিবাবু গাইলেন—

কে এসে যায় ফিরে ফিরে,
আকুল নয়নের নীরে।
কে বৃথা আশাভরে
চাহিছে মুখ 'পরে।
সে যে আমার জননী রে।
কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি।
　　কাহার ভাষা হায়,
　　ভুলিতে সবে চায়।
সে যে আমার জননী রে।
ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি
চিনিতে আর নাহি পারি।
　　আপন সন্তান
　　করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননী রে।
বিরল কুটীরে বিষণ্ণ,
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন।

সে স্নেহ উপহার
রুচে না মুখে আর।
সে যে আমার জননী রে।

সেই সভায় অনেক বিলাতফেরত ইঙ্গবঙ্গ না-ইংরেজ না-বাঙালী গোছের বিদেশী পোষাক-পরা ও বিদেশী ভাষায় কথা বলায় চেষ্টিত লোক ছিলেন, তাঁদের অবস্থা দেখে আমরা তখন অত্যন্ত সুখ অনুভব করেছিলাম। আমাদের মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন স্বদেশভক্ত কবির তীব্র তিরস্কারে লজ্জিত হ'য়ে নিজেদের গায়ের বিদেশী পোষাক গা থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লে বাঁচেন।

'গান্ধারীর আবেদন' নাটিকাটির মধ্যে আমরা সাময়িক ইতিহাসের ছায়াপাত দেখ্‌তে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলাম। তখন আমাদের মনে হয়েছিল ধৃতরাষ্ট্র হচ্ছেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, দুর্যোধন Bureaucracy, গান্ধারী ইংরেজ জাতির ন্যায়নিষ্ঠা (British sense of Justice), ভানুমতী British prestige, পাণ্ডবেরা স্বাধিকার-বঞ্চিত ভারতবাসী এবং দ্রৌপদী ধর্মপথে চলার শাস্তি ও গৌরব!

এর পরে তখনকার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নার উড্‌বার্ন সাহেব একবার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সকল মেম্বরকে তাঁর বেল্‌ভিডিয়র প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন। সেই দিন রবিবাবু সুশুভ্র ঢাকাই মস্‌লিনের একটি প্রচুর কুঁচি-দেওয়া ঘাঘরার মতন মুসলমানী জামা নামক একটি জোব্বা গায়ে দিয়ে ও পাঞ্জাবী নাগরা জুতা পায়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন তাঁকে কেমন দেখ্‌তে হয়েছিল তা তাঁরা বুঝ্‌তে পারবেন যাঁরা বাংলার ইতিহাসে ইংরেজ আমলের পূর্ব্বের নবাবদের ছবি দেখেছেন। সেইদিন হেমেন্দ্রবাবুও গিয়েছিলেন, রবিবাবু তাঁকে কাছে ডেকে আলাপ করেন, এবং যখন ফটো তোলা হয় তখন হেমেন্দ্রবাবু বেছে বেছে রবিবাবুরই পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলান।

আমি তখনো রবিবাবুর কোনো বই চোখেও দেখিনি। আমি

প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. পড়্‌তে ভর্তি হয়েছি, আর থাকি হিন্দু হোষ্টেলে। সেখানে একদল লোক ছিল যারা রবিবাবুর কাব্যকে অস্পষ্ট ও অর্থহীন ব'লে নিন্দা করত, এবং আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিতাম, রবিবাবুর কোনো লেখা না প'ড়েই।

একদিন এক মজ্‌লিশে রবিবাবুর নিন্দা হচ্ছিল। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে তাতে যোগ দিচ্ছিলাম। সেখানে মুখ বুজে বসেছিলেন আমাদের সহপাঠী অধুনা স্বর্গগত নলিনীকান্ত সেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের নিন্দাসভা ভেঙে গেলে নলিনী নিজের ঘরে চ'লে গেল এবং তখনই আমার ঘরে ফিরে এসে আমার বিছানার উপর রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী ফেলে দিয়ে কোনো কথা না ব'লে ঘর থেকে চ'লে গেল। নলিনী বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে কি বই দিয়ে গেল দেখ্‌বার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে দেখ্‌লাম রবিবাবুর গ্রন্থাবলী। তার প্রথম পৃষ্ঠা খুলেই পড়লাম--

শুন নলিনী খোলো গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি।
দেখ তোমারি দুয়ার 'পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি।

কয়েক পৃষ্ঠা উল্টেই আবার পড়্‌লাম—

শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার
শুনেছি শুনেছি তাহা!
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী—
কেমন মধুর আহা!
নলিনী নলিনী বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী নলিনী নলিনী নাম।

তরুণ বয়সে প্রাণে যে কবিত্ব জাগে, যে আকূতি প্রকাশ করবার জন্য মূক মন ভাষা খুঁজে ব্যাকুল হয়, আমার প্রাণের সেই কবিত্ব ও আকূতি যেন এই কবির লেখায় ভাষা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। আমার মনে হলো আমি যে কথা বল্‌তে চাই অথচ পারি না, সেই কথাই তো এই কবি আমার জবানী ব'লে রেখেছেন। আমার মনের এই কথাটিও কবি পরে 'ক্ষণিকা' কাব্যে বলে চুকেছেন—

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে।
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার প্রাণমন হরণ কর্‌ল। আমি আর পরের বই পড়্‌তে পারলাম না। নলিনী সেনকে তার বই ফিরিয়ে দিয়ে তখনই ছুট্‌লাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বইয়ের দোকানে। একখানি টালী আকারের গ্রন্থাবলী কিনে নিয়ে হোষ্টেলে ফির্‌লাম এবং সেই দিন থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ আমার জীবনের আনন্দ বন্ধু শিক্ষক গুরু সহচর হ'য়ে আছে।

এই সময়ে আমাদের সহপাঠী সুরেশচন্দ্র আইচ আমাদের সঙ্গে হিন্দু হোষ্টেলে বাস কর্‌ছিলেন। আমি শুন্‌লাম তিনি রবিবাবুর গান গাইতে পারেন। এর পরে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'তে অধিক বিলম্ব হয়নি। কত সন্ধ্যা আমরা ইডেন গার্ডেনে গিয়ে সুরেশের মধুর কণ্ঠের গান শুনে অতিবাহিত করেছি, তার স্মৃতি আজও মনকে হর্ষবিষাদে অভিভূত করে— সুরেশ আজ পরলোকে, কিন্তু সে আমাকে যে অমৃতের আস্বাদ দিয়ে গেছে তা আমার জীবনকে মাধুর্যে অভিষিক্ত ক'রে রেখেছে।

এই সময়ে বা এর পরে এখন তা ঠিক মনে নেই, এবং কি উপলক্ষে তাও এখন স্মরণ নেই, কল্‌কাতায় লোকমান্য টিলক, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি দেশনেতারা সমবেত হয়েছিলেন।

তাঁদের জন্য এল্‌বার্ট হলে সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় আর কি কি হয়েছিল এবং কে কি বলেছিলেন তা আজ আর কিছুই মনে নেই, কেবল মনে আছে রবিবাবু গান গেয়েছিলেন—

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে!
থেকো না থেকো না ওরে ভাই
মগন মিথ্যা কাজে।

রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গান—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!"

আমি তাঁর কণ্ঠ থেকে ঐ সময়েই ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ হলে কোনো উপলক্ষে শুনেছিলাম।

বাংলা ১৩০৮ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় মজুমদার লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন ও নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের আয়োজন কর্‌তে থাকেন। আমার বই কেনার প্রবল ঝোঁক ছিল। আমি বই কিন্‌তে যাওয়া উপলক্ষে মজুমদার মহাশয়দের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হই। সেই সময়ে শ্রীশবাবুর ভাই-পো প্রবোধবাবু ফরাসী লেখক থিওফিল গ্যাতিয়ের লেখা মধুর উপন্যাস মাদ্‌মোয়াজেল্‌ দ্য মোপ্যাঁ পুস্তকের একটি প্রশংসাসূচক পরিচয় পাঠ করেন, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে। মিটিং শেষ হ'য়ে গেলে আমি প্রবোধবাবুকে তাঁর লেখার প্রশংসা জানিয়ে ফরাসী বইখানির ইংরেজী তর্জমা আছে কি না জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। এই সূত্রে প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, এবং তিনি আমাকে সন্ধ্যাকালে মজুমদার লাইব্রেরীতে যেতে নিমন্ত্রণ করলেন, এই বলে যে, "সন্ধ্যাবেলা আস্‌বেন না আমাদের ওখানে, অনেকে আসেন, সাহিত্য আলোচনা হয়।"

এর পর থেকে আমি মজুমদার লাইব্রেরীর সান্ধ্য মজ্‌লিশের একজন সদস্য ব'লে গণ্য হ'য়ে গেলাম। এখানে "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার হয়।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি মজুমদার লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি পাশের ঘরে রবিবাবু ব'সে আছেন। আমি লাইব্রেরী ঘরে বস্‌লাম, এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভে ভাগ্যবান্ লোকদের ঈর্ষ্যার দৃষ্টিতে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। একটু পরেই সুবোধ মজুমদার লাইব্রেরী ঘরে এলেন, এবং আল্‌মারী থেকে রবিবাবুর 'কাহিনী' বইখানি বাহির ক'রে নিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "সুবোধবাবু, এ বই কি হবে?" তিনি বললেন—"রবিবাবুকে দিয়ে 'পতিতা' কবিতাটা পড়াব।" আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে নিতান্ত সঙ্কোচ ও কুণ্ঠার সহিত তাঁকে বল্‌লাম—"সুবোধবাবু, আমি যাব?" তিনি বললেন—"আসুন না।" আমি কৃতার্থ হ'য়ে সেই ঘরে গেলাম।

অপরিচিত আমাকে যেতে দেখে রবিবাবুর মুখে একটি লাজুক হাসি ফুঠে উঠ্‌ল, এবং তাঁর মুখ অপ্রতিভ হয়ে উটল। 'পতিতা' কবিতাটি পড়বার কথা আগেই স্থির হ'য়ে ছিল। কিন্তু অপরিচিত আমার সাম্‌নে 'পতিতা' সম্বন্ধে কবিতা পড়তে তাঁর লজ্জা বোধ হচ্ছে ব'লে আমার মনে হলো। তিনি মাথা নত ক'রে নতনেত্রের উর্ধ্বদৃষ্টি আমার মুখের দিকে প্রেরণ ক'রে বলতে লাগ্‌লেন—"এ কবিতাটা কি বোঝা যায়?" আমি বল্‌লাম, "বোঝা যাবে না কেন? এ কবিতা তো চমৎকার!" তখন বুঝি নি যে রবিবাবু আমার মতের জন্য ঐ কথা বলেন নি, তিনি কবিতা পাঠের ভূমিকা স্বরূপ নিজের কাছেই নিজে ঐ কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। তিনি আমার কথা কানে না তুলেই নিজের মনে ব'লে যেতে লাগলেন—"আমি এই কবিতায় বল্‌তে চেয়েছি—রমণী পুষ্পতুল্য—তাকে ভোগে ও পূজায় নিয়োগ করা যেতে পারে। তাতে যে কদর্যতা বা মাধুর্য প্রকাশ পায় তা ফুলকে বা রমণীকে স্পর্শ করে না,—রমণী বা ফুল চির-অনাবিল,—তাতে ফুল বা রমণীর কোনো ইচ্ছা মানা হয় না ব'লে সে ভোগে বা পূজায় নিয়োজিত হয়, তাতে নিয়োগকর্তার মনের কদর্যতা বা

মাধুর্য মাত্র প্রকাশ পায়। যে সহজ-পূজ্য তাকে ভোগ্যের পদবীতে নামিয়ে আনে যে সেও একটা আনন্দ পায় বটে, কিন্তু সে আনন্দ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। পতিতা হলেও নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, অনুকূল অবস্থা পেলে সে পুনর্বার পবিত্রতা লাভ করতে পারে। পাপের অন্যায়ে সে তার আত্মাকে কলুষিত করেছে মাত্র, কিন্তু তার আত্মা একেবারে নষ্ট হয়নি—তার আত্মা বাষ্পাচ্ছন্ন দর্পণের মতো হয়ে আছে। ঋষির কুমারই পতিতার কলুষ-তামস জীবনের মধ্যে প্রেমের জ্যোতি বিকীর্ণ ক'রে প্রকৃত জীবনপথের সন্ধান তাকে দেখিয়ে দিলেন। ভক্ত যখন জাগায় তখনই তো ভগবান জাগেন, তাই তো আমরা বলি জাগ্রৎ ভগবান্! পতিতার নারীত্বের পূজারী কেউ ছিল না, ঋষিকুমার তার প্রথম পূজারী হ'য়ে তাকে তার নারীত্বের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলেন। সৎগুণ সে পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় যে পর্যন্ত না ভাবের ভাবুক এসে তার উপাসনা করছে। শক্তিমানের পূজা না পেলে শক্তি জাগরিত হয় না।"

এই ভূমিকা ক'রে তিনি কবিতাটি পড়্‌তে আরম্ভ করলেন। সে স্বর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া গো আকুল করিল মোর প্রাণ।

পতিতা কবিতাটি পড়া হ'লে সুবোধবাবু অনুরোধ করলেন 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতির উক্তি পাঠ করতে।

এর পূর্ব রাত্রেই সঙ্গীতসমাজে 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় হ'য়ে গেছে, বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড়ের সম্বর্ধনা উপলক্ষে। রবিবাবু তাতে রঘুপতির ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করেছিলেন। তিনি রঘুপতির উক্তি পড়্‌তে অনুরুদ্ধ হ'য়ে বল্‌লেন, "নাটকের পাত্র-পাত্রীর কথা কেবল পড়্‌লে তার যথার্থ ভাবটি প্রকাশ করা যায় না। নাটক অভিনয়ে যে অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি থাকে তাতে ভাব প্রকাশে সাহায্য করে। ইংরেজী ড্রামা মানে একশান, মোশান।"

তার পর তিনি রঘুপতির উক্তি পাঠ করলেন।

পাঠ শেষ হ'লে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ব্রাহ্মণ" কবিতার মধ্যে, যে আছে—

'যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি তাত।'

এর অর্থ কি? আমার এক বন্ধু এর অর্থ করেন যে অনেক দেবারাধনা মানত্ করার পর তোমাকে পেয়েছি। কিন্তু আমি বলি ওর অর্থ বহু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যভিচারের মধ্যে তোমার জন্ম, তাই আমি জানি না তুমি কার পুত্র। আমাদের মধ্যে কার অর্থ সঙ্গত?"

রবিবাবু অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু ক'রে মৃদু স্বরে বল্লেন—"আপনি যে অর্থ করেছেন তাই ওর অর্থ।" অপরিচিত আমার কাছে ঐ কথার আলোচনায় তিনি অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করছেন বুঝ্‌তে পেরে আমি আর কোনো কথা বল্লাম না।

এই আমার রবিবাবুর কাছে প্রথম যাওয়া।

এই সময় মজুমদার লাইব্রেরীর উদ্যোগে পক্ষান্তে একটি ক'রে সাহিত্যিক সভা হতো। তাতে গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ, আলোচনা প্রভৃতি হতো। সেই সভায় রবিবাবু, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি যশস্বী সাহিত্যিকেরা যোগ দিতেন। একদিন রবিবাবু গান গাইতে আরম্ভ ক'রে একটা কলি পুনঃপুনঃ ফিরে ফিরে গাইছেন আর লজ্জিত ভাবে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছেন দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি গানের পদ ভুলে গেছেন, ও মনে করবার চেষ্টা করেও মনে করতে পারছেন না। তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে গানের পদ চেঁচিয়ে ব'লে দিতে লাগ্‌লাম, ও তিনি গাইতে লাগ্‌লেন। আমি তাঁকে বিপদ্ থেকে উদ্ধার করাতে তিনি আমার দিকে এমন কোমল দৃষ্টিতে একবার চাইলেন যে আমার মন আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে গেল। তাঁর সেই দৃষ্টিতে লজ্জা,

কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ফুটে উঠেছিল।

এই সময় আমি আমেরিকার কবি অলিভার ওয়েণ্ডেল হোল্‌মস্‌ সাহেবের একটি কবিতা অনুবাদ করেছিলাম "বৃদ্ধের স্বপ্নদর্শন" নাম দিয়ে। আমি সেই কবিতাটিতে সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষর ক'রে 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের নামে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেটি ছাপা হলো দেখে আমার আর আনন্দের সীমা রইল না। রবিবাবুর বিচারে যে কবিতা উত্তীর্ণ হয়ে গেল্‌ সে তো দিগ্‌বিজয়ী হ'তে পারে। তখন আমি শৈলেশবাবুকে বল্‌লাম যে সেটি আমারই লেখা, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরই রূপান্তর মাত্র। রবিবাবু শৈলেশবাবুর কাছে আমার কথা শুনে বলেছিলেন যে আমার আত্মগোপন ক'রে ছদ্মনাম নেবার কোনো আবশ্যক ছিল না।

এই সময়ে আমি লেখ্‌বার চেষ্টা করেছিলাম। আমি একটি প্রবন্ধ "দাবার জন্মকথা" লিখে 'বঙ্গদর্শনে' ও "লিখনসৃষ্টির ইতিহাস" লিখে 'ভারতী'তে ভয়ে ভয়ে দিয়েছিলাম। দুটিই আমার স্বনামে ছাপা হলো। শ্রীমতী সরলা দেবী আমাকে নিজে ডেকে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং আমি তাঁকে ভারতী সম্পাদনে সাহায্য করতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তখন বি.এ. পাস ক'রে বেকার ব'সে ছিলাম, কেবল দুপুর বেলা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়্‌তে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিল না। আমি সরলা দেবীকে সাহায্য করতে সম্মত হলাম। আমি শুধু লেখক হওয়ার সুযোগ পেলাম না, বহু বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে লাগ্‌লাম এবং বহু লেখকের লেখা আমার হাত দিয়ে মার্জিত হ'য়ে প্রকাশিত হ'তে লাগ্‌ল।

কাশীতে সাহিত্য-পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানকার সেক্রেটারী আমাকে অনুরোধ করলেন উদ্বোধনের উপযোগী একটি গান লিখে দিতে হবে। আমি কবিতা লিখ্‌বার দুশ্চেষ্টা মাঝে মাঝে করলেও আমার কবিত্বের প্রতি আমার কোনো দিনই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না।

তখনো রবিবাবুর পরবর্তী কবিদের অভ্যুদয় হয় নি। আমি কাশীর সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারী মহাশয়কে লিখ্‌লাম যে "আমা হতে এই কার্য হবে না সাধন। তবে আমি হয় রবিবাবুকে দিয়ে অথবা সরলা দেবীকে দিয়ে আপনাদের একটি গান লিখিয়ে দেবো।" সেক্রেটারী মহাশয় অপ্রত্যাশিত ও আশাতীত লাভের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হ'য়ে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে পত্র লিখ্‌লেন। আমিও দুই জনের কাছে গান রচনা ক'রে দেবার অনুরোধ ক'রে পাঠালাম। রবিবাবু ছিলেন তখন শিলাইদহে। তিনি আমাকে পত্র লিখ্‌লেন যে তিনি শীঘ্র কল্‌কাতায় আসছেন, এবং কোনো নির্দিষ্ট তারিখে জোড়াশাঁকোর বাড়ীতে যদি আমি যাই তা হ'লে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তে পারবে।

আমি নির্দিষ্ট দিনে বিকাল বেলা জোড়াশাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে দ্বারোয়ানকে দিয়ে আমার নামের কার্ড রবিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তখনই নীচে নেমে এলেন। তাঁর পরনে একটা ঢিলা পাজামা, ঢিলা পাঞ্জাবী গায়ে আর পাঞ্জাবীর জামার গলার বোতামটি খোলা। পরে লক্ষ্য করেছি তিনি কখনই জামার গলার বোতাম দেন না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"আপনি আমাকে কি ফর্‌মাস করেছিলেন না?" আমি বল্‌লাম—"সরস্বতীবন্দনা সম্বন্ধে একটা গান লিখে দিতে বলেছিলাম।" আমার কথা শুনেই তিনি ব'লে উঠলেন—"ওরে বাস্‌ রে! গান লেখ্‌বার সাধ্য কি আমার আছে আর! গান-টান আর আমার আসে না।—

চলে গেছে মোর বীণাপাণি। (চৈতালি)

আমার একটা পুরাণো গান আছে—

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয় কমল বন মাঝে!

সেই গানটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবেন।"

আমি ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে ফিরে এলাম। কবির বীণাপাণি কবিকে

ত্যাগ ক'রে গেছেন ব'লে কবি ১৩০২ সালে বিলাপ করেছিলেন। কিন্তু তার পরে হাজার গান রচনা করেছেন আর হাজার খানেক কবিতাও লিখেছেন।

১৩১২ সালে আমি "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী" নামে একটি গল্প লিখে প্রকাশ করবার জন্য 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। রামানন্দবাবু গল্পটি ফেরৎ দিয়ে অনুরোধ করলেন গল্পটির আয়তন সংক্ষেপ ক'রে দিলে ছাপা হ'তে পারবে। দীনেশবাবু আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় অবধি খুব স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। তাঁকে ঐ গল্পটির কথা বলাতে তিনি বল্‌লেন—"তুমি ঐ গল্পটি রবিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দাও, আর তাঁকেই বলো সংক্ষেপ ক'রে দিতে।"

দীনেশবাবুর পরামর্শ অনুসারে তাঁর নাম করেই গল্পটি রবিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তখন শিলাইদহে। তিনি আমাকে লিখ্‌লেন, তিনি শীঘ্রই কল্‌কাতায় ফিরে আস্‌ছেন, তখন তাঁর সঙ্গে জোড়াশাঁকোর বাড়ীতে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি মোকাবেলায় আমার সঙ্গে আমার গল্প সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

একদিন প্রাতে রবিবাবুর জোড়াশাঁকোর নূতন লাল বাড়ীতে গেলাম। নীচে পূর্বদিকের কোণের ঘরে তিনি বসে ছিলেন, আর সেখানে ছিলেন —শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি। আমি নমস্কার ক'রে রবিবাবুর ডান দিকে ফরাসের একপ্রান্তে বস্‌লাম। তখন 'বঙ্গদর্শনে' রবিবাবুর 'চোখের বালি' শেষ হয়ে 'নৌকাডুবি' বাহির হচ্ছে। তার সম্বন্ধেই কথা চল্‌ছিল। আমি যখন গেলাম তখন শুন্‌লাম দীনেশবাবু বল্‌ছেন— "আপনি তো দুটি মেয়ে এনে উপস্থিত করেছেন। ওদের কার সঙ্গে শেষকালে রমেশের প্রণয় প্রবল হবে? দুজনের মধ্যে রমেশকে ফেলে যে গোলমালের সৃষ্টি করলেন, তা থেকে উদ্ধার পাবেন কেমন ক'রে।"

রবিবাবু হেসে বললেন—"আমি তো তা কিছুই জানি না যে রমেশ

কমলা আর হেমনলিনীর মধ্যে পড়ে কি যে করবে। আমি তো কখনো আগে ভেবে চিন্তে কিছু লিখি না, লিখ্‌তে লিখ্‌তে যা হ'য়ে দাঁড়ায়। দেখা যাক শেষে কি হয়।

আমি বল্‌লাম—যদি তেমন তেমন কোনো গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তা হ'লে একজনকে মেরে ফেল্‌লেই হবে।

এর উত্তরে তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—এ বয়সে আর আমাকে স্ত্রীহত্যা কর্‌তে বল্‌বেন না।

তাঁর এই কথা সকলের মনে লাগ্‌ল, কারণ এর অল্পদিন আগেই তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল।

যতক্ষণ কথাবার্তা চল্‌ছিল ততক্ষণ রবিবাবু মাঝে মাঝে আমার দিকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম যে তিনি আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না, অথচ চিনিচিনি কর্‌ছেন, এবং আমি কে হ'তে পারি তা মনে মনে মিলিয়ে বেছে বেছে দেখ্‌ছেন। তিনি নিশ্চয় ভাব্‌ছিলেন যে এই প্রগল্‌ভ লোকটি কে যে বিনা পরিচয়ে আমাকে পরামর্শ দিতে সাহস করে। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর কথার মধ্যেই রবিবাবু হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"আপনি কি চারুবাবু?" আমি তাঁর অনুমান মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিতেই তিনি আবার যে কথা চল্‌ছিল তারই আলোচনায় যোগ দিলেন।

যখন সভা ভঙ্গ হলো তখন তিনি আমাকে বল্‌লেন আমি আপনাকে যা বল্‌বার তা শৈলেশকে দিয়ে ব'লে পাঠাব।

এর পর আমি অবস্থাবিপর্যয়ে কয়েক বৎসর কলকাতাছাড়া হ'য়ে ছিলাম। রবিবাবুর সঙ্গে আমার আর দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি।

ইংরেজী ১৯০৮ সালে আমি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের তরফ থেকে কল্‌কাতায় ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস নামে একটি পুস্তক প্রকাশের ও বিক্রয়ের দোকান খুলি। আমার উপরে ভার ছিল সকল প্রসিদ্ধ লেখকের বই প্রকাশের অধিকার সংগ্রহ করার। অমি রবিবাবুকে দিয়ে

বউনি কর্‌ব সঙ্কল্প ক'রে রামানন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে রবিবাবুর কাছে গেলাম। রামানন্দবাবু আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত কর্‌লে রবিবাবু বল্‌লেন—"এর জন্য আপনার কোনো সুপারিশ আন্‌বার আবশ্যক ছিল না। কেউ যদি আমার এই সমস্ত কুকর্মের ভার নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করেন সে তো আমার পরম উপকার করা হবে। আপনি যবে বল্‌বেন আমার সব বই আপনার হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো।"

এই হলো তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সূত্রপাত।

এই সময় সত্যেন্দ্র দত্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন তাঁর 'তীর্থসলিল' ছাপা চল্‌ছে। তিনি প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা প্রেস থেকে প্রুফ নিয়ে আমার বাসায় আস্‌তেন আর আমাকে তাঁর কবিতা শোনাতেন। একদিন আমি তাঁর 'বেণু ও বীণা' উৎসর্গ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন কর্‌লাম "এ বইটা আপনি কাকে উৎসর্গ করেছেন?"

সত্যেন্দ্র বললেন—"আপনিই বলুন না।"

সেই উৎসর্গে লেখা আছে—

যিনি জগতের সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন
যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন
যিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক
সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন
কবির উদ্দেশে
এই সামান্য কবিতাগুলি সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।

আমি বল্‌লাম—"ইনি হয় শেক্‌স্‌পীয়ার, আর নয় রবিবাবু।"

সত্যেন্দ্র উত্তর কর্‌লেন—"স্বদেশের কবি থাকৃতে আমি বিদেশে যাব কেন?"

আমার আনন্দের অবধি থাকৃল না। আমার মনে মনে ধারণা ছিল যে রবিবাবু জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তখনও আমাদের দেশে তাঁর প্রতিভা সর্বজনসমাদৃত হয় নি, একদল নিন্দক প্রবল হ'য়ে তাঁকে খাটো

করবারই ব্রত গ্রহণ করেছিল। তাই আমার মনের ধারণা লোকের কাছে আমি প্রকাশ ক'রে কখনো বল্‌তে সাহস করি নি। আজ সত্যেন্দ্রকে আমারই মতানুকূল পেয়ে আমি আনন্দিত হলাম, আমার পৃষ্ঠপোষক পেয়ে আমার সাহস বাড়লো, আমি মনে জোর পেলাম।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ পাকে-চক্রে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমাকে জানাতে লাগ্‌লেন যে আমাকে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে চান। আমাকে একদিন বল্‌লেন—"চারু, তুমি কি আমাকে একজন এমন লোক দিতে পারো যে একটু সংস্কৃত জানে, ইংরেজীটাও নেহাৎ ভুল করে না, আর আমার লেখাগুলোকে নিতান্ত তুচ্ছ ব'লে অবহেলা করে না।"

বন্ধুবর অজিত চক্রবর্তী আমাকে বললেন—"গুরুদেব তোমাকেই চান।"

আমি তখন সদ্যঃ ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস খুলেছি, আমার উপর নির্ভর ক'রে ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণিবাবু অনেক টাকা ব্যয় করেছেন, এখন আমার তাঁর কর্ম ত্যাগ ক'রে বোলপুরে চ'লে যাওয়া উচিত হবে না ব'লে আমার মনে হলো। আমি রামানন্দবাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলাম; তিনি বল্‌লেন—"না, আপনি এখন যেতে পারেন না।"

আমি বাধ্য হয়ে কবিগুরুর আমন্ত্রণ স্বীকার করতে না পেরে খুবই ক্ষুণ্ণ হলাম। তখন কবিকে বল্‌লাম—"আপনি যদি লোক চান তো আমার চেয়ে বহু গুণে ভালো লোক আপনাকে এনে দিতে পারি।"

তিনি লোক চাওয়াতে আমি বন্ধুবর বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেনকে শান্তিনিকেতনে আস্‌তে প্ররোচিত করি।

আমি একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে ক্ষিতিমোহনের আশ্রমে আমার জিনিষপত্র রেখে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। ক্ষিতিমোহন বল্‌লেন—"তুমি যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি, তার পর একসঙ্গে বেড়াতে যাব।"

ক্ষিতিমোহনের প্রতি আমার প্রীতির প্রবল টান কবি টের পেয়ে-

ছিলেন। আমি ক্ষিতিমোহনের কাছে আগে গিয়ে পরে তাঁর কাছে এসেছি এই নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করে বল্‌লেন—"ক্ষিতিমোহনের মোহ এতক্ষণে কাটল।"

আমি লজ্জিত হয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর কাছে বসলাম।

তিনি তখন শান্তিনিকেতনে শালবীথির ধারে মাঠে একখানা তক্তপোষের উপর একলা ব'সে ছিলেন। অল্পক্ষণ পরে ক্ষিতি এসে আমার পাশে ব'সে বল্‌লেন—"চারু, চলো বেড়াতে যাই।"

কবি হেসে বল্‌লেন—"হাঁ, যখনি চারুচন্দ্র ক্ষিতি আর রবির মাঝখানে পড়েছেন, তখনই জানি যে রবির গ্রহণ লাগ্‌বে।"

ক্ষিতিমোহন আমার আশা ত্যাগ করে পলায়ন কর্‌তে কর্‌তে ব'লে গেলেন—"না না, আমি চারুকে নিয়ে যেতে চাইনে, ও আপনার কাছেই থাক।"

'শারদোৎসব' নাটক সদ্যঃ লেখা হয়েছে, শান্তিনিকেতনে ছাত্রশিক্ষকে মিলে তার অভিনয় কর্‌বেন, তার আগে বইখানি শোভন রূপে ছেপে প্রকাশ কর্‌বার জন্য আমার ডাক পড়েছে। কবি বই প'ড়ে আমাদের শোনালেন। কথা হলো যে প্রারম্ভে একটি মঙ্গলাচরণ দিতে হবে। কবি অনুরোধ কর্‌লেন, শাস্ত্রী মহাশয় একটা সংস্কৃত মঙ্গলাচরণ লিখে বা বেদ থেকে খুঁজে দেবেন। আমি বল্‌লাম—"যাঁর লেখা বই সেই কবিই মঙ্গলাচরণ লিখ্‌বেন, আর কারো অনধিকার প্রবেশ এখানে খাটবে না।"

কবি হেসে বল্‌লেন—"আমার প্রকাশকের তো বড় কড়া শাসন দেখি। তা তোমরা যদি আমাকে এখন ছুটি দাও তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি যে আমার প্রকাশকের হুকুম তামিল করিতে পারি কি না।"

তিনি নিজের ঘরে চ'লে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এলেন—গান তৈরী ও সুর সংযোজনা সব হয়ে গেছে। সে গানটি শারদোৎসবের প্রথমেই আছে—

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে
এস গন্ধে বরণে এস গানে।

রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে একবার শিলাইদহে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি কাছারীর পরপারে চরের গায়ে বজরা বেঁধে বাস করছিলেন। দুখানি বজরা পাশাপাশি বাঁধা, একখানিতে কবি নিজে বাস করেন, আর অন্যখানিতে অজিতকুমার পীড়িত হ'য়ে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য বাস করছিলেন। আমি অজিতের বজরায় বাসা পেলাম। আমি কবিকে প্রণাম ক'রে স্নান করবার জন্য আমার বাসা বজরায় যাব বলে উঠলাম। কবির বজরা থেকে অজিতের বজরায় যাবার জন্য একটি তক্তা এক বোট থেকে আরেক বোট পর্যন্ত ফেলা ছিল। আমি যখন অপর বজরায় যাবার জন্য উঠলাম, কবি আমাকে বললেন—"চারু, দেখো সাবধানে যেয়ো, এখানে জোড়াসাঁকো নেই, এক সাঁকো দিয়েই পার হ'তে হবে।"

সে সময়ে তিনি আমাকে যে যত্ন করেছেন তা আমার জীবনের মহার্ঘ সম্বল হ'য়ে আছে। নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়ানো, আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে সর্বদা উৎসুক থাকা, অজিতকে ক্রমাগত বলা, দেখো অজিত, তোমার বন্ধুর যেন কোন অসুবিধা না হয়।

পরদিন রাত্রে আমাকে তাঁর বোটে থাকতে অনুরোধ করলেন। এত বড় লোকের অত কাছে থাকতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হ'তে লাগল। আমি বললাম—আমি তো অজিতের সঙ্গেই বেশ আছি, এখানে শুলে আড়ষ্ট হ'য়ে আমারও অসুবিধা হবে আর আপনারও বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে।

কিন্তু কবি কিছুতেই শুনলেন না, অজিতকে বললেন—"অজিত, তোমার বন্ধু তোমাকে ছেড়ে থাকতে চান না। অতএব তুমিও তোমার বাসা বদল ক'রে এই বোটে এসো।"

সন্ধ্যার সময় খুব ঝড়জল আরম্ভ হলো। কবি বললেন—"অজিত অতিথির সম্বর্ধনা করো, গান ধরো।"

কবি গান ধর্‌লেন, অজিত সঙ্গে যোগ দিলেন—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার

পরাণসখা বন্ধু হে আমার !

তারপরে আবার গান ধর্‌লেন—

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো !

বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো !

এই দুটি গানই আমি 'প্রবাসী'র জন্য চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম, এবং কবির হাতে লেখা কাগজের টুক্‌রা দুটি এখনো আমার কাছে আছে।

এই সময় 'প্রবাসী'তে 'গোরা' বাহির হচ্ছিল। তিনি আমাকে বল্‌লেন আরো একদিন থেকে 'গোরা'র কপিও সঙ্গে নিয়ে যেতে। আমি তাঁর কাছে থেকে 'গোরা' লেখার পদ্ধতিও দেখ্‌বার সৌভাগ্যলাভ কর্‌লাম। ঘাড় কাত ক'রে ঘস্‌ঘস্‌ ক'রে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন, আর খানিক লিখে ফিরে প'ড়ে অপছন্দ অংশ চিত্রবিচিত্র ক'রে কেটে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কত সুন্দর সুন্দর রচনাংশ যে কেটে উড়িয়ে দিয়েছেন তা দেখে আমাদের কষ্ট হয়েছে। আমি বল্‌লাম যে, আপনি যা লিখে ফেলেন তাতে আর তো আপনার অধিকার থাকে না, তা বিশ্ববাসীর হ'য়ে যায়, অতএব সব থাক।

কবি হেসে বল্‌লেন—"তুমি বড় কৃপণ। সব রাখ্‌লে কি চলে। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস না থাকলে কি সৃষ্টি কখনো সুন্দর হতে পারে।"

শিলাইদহে থাক্‌বার সময় আমি কবির খুব ঘনিষ্ঠ সংসর্গ লাভ কর্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। সেই সময় তাঁর উপাসনায় তন্ময়তা আর গভীর ধ্যান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভোর-রাত্রে একখানি চেয়ার বোটের সাম্‌নে পেতে পূর্বদিকে মুখ ক'রে তিনি ধ্যানে বসতেন, আর বেলা হ'লে সূর্যের আলোক প্রতপ্ত হ'য়ে তাঁর মুখের উপর এসে না পড়া পর্যন্ত তাঁর ধ্যানভঙ্গ হতো না। তাঁকে সেই তন্ময় অবস্থায় দেখে আমার মনে হতো 'নৈবেদ্যে'র সেই কবিতাটি যেটি তিনি তাঁর পিতা মহর্ষিকে

লক্ষ্য ক'রে লিখেছিলেন—

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন তুই জোড় কর করি
কর তাহা দরশন।
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি,
বহিয়া যেতেছে অমৃতলহরী,
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া, লহ রে
শুভাশিস্-বরিষণ।
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।
ওই যে আলোক পড়েছে তাঁহার
উদার ললাটদেশে,
সেথা হতে তারি একটি রশ্মি
পড়ুক মাথায় এসে।

বোলপুরেও আমি তাঁকে এমনি ধ্যানরত অনেকদিন দেখেছি। তখন তিনি 'শান্তিনিকেতন' নামক পুস্তকাবলীতে প্রকাশিত উপদেশাবলী প্রতি সপ্তাহে মন্দিরে বল্‌তেন আর প্রত্যহ প্রত্যুষে মন্দিরের পূর্বদিকের বারান্দায় ব'সে ধ্যানস্থ হতেন, এবং মুখে রোদ এসে না পড়া পর্যন্ত তাঁর ধ্যানভঙ্গ হতো না। 'গীতাঞ্জলি' রচনার সময় আমি লক্ষ্য করেছি তিনি কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ যেন সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হ'য়ে যেতেন। কোনো এক উৎসব উপলক্ষে আমরা বহু লোকে বোলপুরে গিয়েছিলাম। খুব সম্ভব 'রাজা' নাটক অভিনয় উপলক্ষে। বসন্ত কাল, জ্যোৎস্না রাত্রি। যত স্ত্রীলোক ও পুরুষ এসেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই পারুলডাঙ্গা নামক এক রম্য বনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কেবল আমি যাইনি রাত জাগ্‌বার ভয়ে। রাত্রিতে আমার

ঘুমভেঙে গেল গায়ে কিসের স্পর্শ লেগে। জেগে দেখি স্বয়ং কবি এসে আমার গায়ে তাঁর নিজের গায়ের মলিদা চাদর ঢাকা দিয়ে দিচ্ছেন। আমি ধড়মড় ক'রে উঠে বস্‌লাম। কবি আমাকে বল্‌লেন—"তুমি উঠো না, ঘুমোও, তোমার শীত কর্‌ছে, তাই গায়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি।"

আমি শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম আমার সৌভাগ্যের কথা। কোন্ সুকৃতির ফলে আমার মতন গুণহীন এত বড় কবি ঋষির স্নেহভাজন হ'তে পারল।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি। গভীর রাত্রি। হঠাৎ আমার ঘুম আবার ভেঙে গেল, মনে হলো যেন শান্তিনিকেতনের নীচের তলার সামনের মাঠ থেকে কার মৃদু মধুর গানের স্বর ভেসে আস্‌ছে। আমি উঠে ছাদে আলসের ধারে গিয়ে দেখ্‌লাম, কবিগুরু জ্যোৎস্নাপ্লাবিত খোলা জায়গায় পায়চারি কর্‌ছেন আর গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাইছেন। আমি খালিপায়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেলাম। আমি গুরুদেবের কাছে গেলাম, কিন্তু তিনি আমাকে লক্ষ্য কর্‌লেন না, আপন মনে যেমন গান গেয়ে পায়চারি কর্‌ছিলেন তেমনি পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে গান গাইতে লাগ্‌লেন। গান গাইছিলেন খুব মৃদুস্বরে। আমি পিছনে পিছনে বেড়াতে বেড়াতে গানের কথা ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম। তিনি গাইছিলেন—

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
যাব না গো যাব না যে,
থাক্‌ব প'ড়ে ঘরের মাঝে,
এই নিরালায় রব আপন কোণে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥
আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।

আমারে যে জাগ্‌তে হবে,
কি জানি সে আস্‌বে কবে—
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥

এই গানটি পরে 'গীতালি'তে স্থান পেয়েছে, এবং সেখানে তারিখ দেওয়া আছে ২২এ চৈত্র ১৩২১ সাল।

অনেকক্ষণ পরে গান থাম্‌লে তিনি অতি মৃদুস্বরে বল্‌লেন—"চারু এসেছ?"

আমি তাঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলাম। তিনি তেমনি মৃদু স্বরে বল্‌লেন—"যাও তুমি শোও গে।"

বুঝ্‌লাম তিনি একলা থাকতে চান। আমি চ'লে এলাম। 'গীতালি'র গানগুলি রচনার সময় আমি কবির কাছে ছিলাম। অনেকগুলি গান রচিত হ'লে তিনি আমাকে বল্‌লেন—"চারু, তুমি আমার এই গানগুলি নকল ক'রে দিতে পারো, তা হলে ছাপ্‌তে দিতে পারি। যে খাতায় গান লিখেছি সেটা প্রেসে দেওয়া চল্‌বে না, খাতাখানা রথী চেয়েছে।"

আমি গানগুলি নকল ক'রে দিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তোমার কেমন লাগ্‌ল?"

আমি বল্‌লাম—একটা গান একটু অস্পষ্ট হয়েছে, মানে ঠিক ধরা যায় না।

কবি চ'টে গেলেন। বিরক্ত স্বরে বল্‌লেন—"তুমি কিচ্ছু বোঝো না, ও ঠিক আছে।"

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লাম—আমি বুঝ্‌তে পারিনি সেই কথাই বল্‌ছিলাম, কবিতার কোনো ত্রুটির কথা আমি বলি নি।

কবি গম্ভীর ও নীরব হ'য়ে রইলেন। আমি প্রণাম করে চলে এলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

আমি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে গেছি। রাত্রে আমার বাসা বেণুকুঞ্জে কবির

কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম ভেঙে গেল—"চারু, তুমি ঘুমিয়েছ ?"

আমি ধড়মড় ক'রে উঠে পড়্‌লাম, এবং মশারির দড়ি ছিঁড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি মশারি সরিয়ে কবিগুরুকে বস্‌বার জায়গা ক'রে দিলাম।

তিনি আমাকে বল্‌লেন—"চারু, তুমি ঠিকই বলেছ, ঐ গানটার কোনো মানেই হয় না, আমি প'ড়ে দেখি যে আমি নিজেই তার মানে বুঝ্‌তে পারি না, কি ভেবে যে লিখেছিলাম তা এখন আর ধর্‌তেই পারি না। সেটাকে বদ্‌লে এনেছি, দেখো তো এটার কোনো মানে হয় কি না।"

আগের গানটি কেটে সেই কাগজে সেই গানের পাশে নূতন ক'রে আর একটি গান লিখে এনেছেন, কেবল আমাকে তিরস্কার করায় আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছি ভেবে আমাকে সান্ত্বনা দেবার সেটি যে কৌশল মাত্র তা আমার বুঝ্‌তে বাকী রইল না। আমার মনের ক্লেশ দূর কর্‌বার জন্য নিজের ত্রুটি স্বীকার ক'রে এত রাত্রি পর্যন্ত জেগে থেকে আবার একটি নূতন গান রচনা করেছেন। ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম তখন ১১টা বেজে গেছে।

নিম্নে প্রথম লিখিত কবিতাটি তার সংশোধন সমেত দিলাম এবং তার পরে পরিবর্ত্তিত ও 'গীতালি' পুস্তকে প্রকাশিত কবিতাটিও তার সকল সংশোধন সমেত দিলাম—

কেন আর মিথ্যা আশা
বারে বারে
হাত ধরে
ওরে তোর সঙ্গে যে কেউ
যাবে না রে
এ তোমার রাত্রিশেষের ভোরের পাখী
তোমারেই একলা কেবল গেল ডাকি,
যা রে তুই বিজন পথে চ'লে যা রে।

ওদের ঐ　　হৃদয়-কুঁড়ি　　শিশির রাতে
ব'সে রয়　　চোখের জলের　　অপেক্ষাতে।
মেটাতে　　পারবে না যে　　আঁধার নিশা
তোমার এই　ফোটা ফুলের　　আলোর তৃষা,
　　সে যে তাই　চেয়ে আছে　পূবের পারে॥

২

যে থাকে থাক না
ওরা থাকে ঘরের দ্বারে
যে যাবি যা না
যা না তুই আপন পারে।
যদি ঐ ভোরের পাখী
তোরি নাম গায় রে
তোমারেই গেল　ডাকি,
　　একা তুই চ'লে যা রে।
কুঁড়ি চায় আঁধার রাতি
　　বসে মাতি।
শিশিরের অপেক্ষাতে।
　　চায় না নিশা
ফোটা ফুল আলোর তৃষায়
প্রাণে তার আলোর তৃষা
কাঁদে সে অমানিশায়
　　সে কাঁদে সে অন্ধকারে॥

'গীতালি'র উৎসর্গের কবিতাটিতেও বহু পরিবর্তন করা হয়েছিল, তার কাটা কপিও আমার কাছে আছে। এই রকম বহু কবিতার সংশোধন-সাক্ষী কাটা কপি আমার কাছে আছে। সেগুলিকে প্রকাশ করতে পারলে কবির মনের চিন্তার একটু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। আমার

খাতিরে যে কবিতাটিকে একেবারে বর্জন ও লোকলোচন থেকে বিসর্জন করেছেন সেটিও যে একটি উৎকৃষ্ট কবিতা তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

যখন 'গীতালি'র গান নকল করছিলাম সেই সময় একদিন বন্ধুবর অসিতকুমার হালদার আমাকে বল্‌লেন—"চলো গয়া বেড়িয়ে আসি।" অসিতের প্রস্তাব রবিবাবুর জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ও শুনে তিনিও যেতে প্রস্তুত হলেন। শেষে কবিও যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, এবং ক্রমে আমাদের দল বেশ পুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল, শ্রীমতী হেমলতা দেবী ও মীরা দেবীও চল্‌লেন। যাত্রার সময় রবিবাবু আমাকে বল্‌লেন—"চারু, আমিও তোমাদের সঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট্ ক্লাসে যাব।"

আমি অনেক অনুরোধ ক'রে তাঁকে ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করালাম, তাঁকে এই বলে বুঝিয়ে বল্‌লাম—তাতে আপনার তো কষ্ট হবেই, আর আপনার কষ্ট হচ্ছে ভেবে আমাদেরও শান্তিস্বস্তি কিছু থাকবে না।

গয়ায় তখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন। তাঁরা সহরে একদিন রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা করলেন। সেই সভায় বসন্তবাবু গান গাইলেন আর এক ভদ্রলোক হারমোনিয়াম বাজালেন। একটি কচি মেয়ে আবৃত্তি করলে। তার প্রথম লাইনটি মনে আছে—

তবু মরিতে হবে।

সভা থেকে বেরিয়ে বুদ্ধগয়ায় আস্‌বার রাস্তায় গাড়ীতে রবিবাবু আমাকে বল্‌লেন—"দেখেছ চারু, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমি না হয় গোটাকতক গান কবিতা লিখে অপরাধ করেছি, তাই বলে আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে এ রকম যন্ত্রণা দেওয়া কি ভদ্রতাসঙ্গত! গান হলো, কিন্তু দুজনে প্রাণপণ শক্তিতে পাল্লা দিতে লাগ্‌লেন যে কে কত বেতালা বাজাতে পারেন আর বেসুরো গাইতে পারেন, গান যায় যদি এপথে তো তার বাজনা চলে তার উল্টো পথে। গায়ক বাদকের এমন স্বাতন্ত্র্য

রক্ষার চেষ্টা আমি আর কস্মিন্ কালেও দেখিনি। তার পর ঐ একরত্তি কচি মেয়ে তাকে দিয়ে নাকি সুরে আমাকে শুনিয়ে না দিলেও আমার জানা ছিল যে তঁবু মঁরিতেঁ হঁবেঁ।"

রবিবাবু বুদ্ধগয়ায় পাণ্ডার অতিথি হ'য়ে বুদ্ধগয়াতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর বাসায় একদিন নন্দলাল ব'লে এক ভদ্রলোক এসে 'বরাবর' পাহাড় দেখে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে তিনি সেখানকার এক জমিদারের প্রধান কর্মচারী, তিনি সেখানে থাকবার তাঁবু যান বাহন আহারাদির সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, কবি শুধু কষ্ট ক'রে গিয়ে দেখে আসবেন বৌদ্ধ আমলের গিরিগুহা।

আমরা সবাই রওনা হলাম। কবির দৌহিত্রের জ্বর হওয়াতে মেয়েরা আস্‌তে পারলেন না, এবং তাঁদের জন্য নগেনবাবুরও আসা হলো না। গয়া থেকে রেলে বেলা নামক ষ্টেসনে নেমে আমরা এক হাতীতে রওনা হলাম। রবিবাবু পাল্কীতে যাবেন, কিন্তু পাল্কী তখনও আসে নি, নন্দলালবাবু আশ্বাস দিলেন—"আপনারা চ'লে যান, হাতী আস্তে আস্তে যাবে, আর পাল্কী পরে রওনা হলেও আগে চ'লে যাবে।"

আমরা চ'লে গেলাম। নন্দলালবাবু আমাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ফল দিয়ে দিলেন পাথেয়, এবং ব'লে দিলেন সেখানে তাঁবু পড়েছে এবং সেখানে পাচকেরা অন্ন প্রস্তুত ক'রে রেখেছে।

আমরা বরাবর পাহাড়ের নীচে পৌঁছে দেখি মাঠ ধূ ধূ করছে, কোথাও তাঁবু বা খাদ্যপানীয়ের কোনো আয়োজন নেই। কবির আস্‌তে দেরী হচ্ছে দেখে আমি প্রস্তাব করলাম আমরা আগে গিয়ে গুহাগুলো দেখে আসি, কবি যে আস্‌বেন তার কোনো লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না, আর যদি আসেনই তবে তাঁর সঙ্গে আর একবার দেখা যাবে, তাতেও কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা গুহা দেখে নেমে এলাম। তখনো কবির পাল্কীর পাত্তা নেই। ক্ষুধায় নাড়ী চোঁচোঁ করছে। সঙ্গীরা অল্প-বয়সী, তাদের ক্ষুধার তাড়না বেশী। তারা ফলের খাঞ্চা আক্রমণ করলে।

আমি তাদের মুখ থেকে কেড়ে একটি নাসপাতি ও একটি কলা রক্ষা কর্‌লাম কবির জন্য।

অনেকক্ষণ পরে কবির পাল্কী এলো। কবি এসে যখন শুনলেন মাঠের মাঝখানে একটি গাছ ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই, এবং বিশুদ্ধ মেঠো বাতাস ছাড়া আর কিছু খাদ্য সংগ্রহের সম্ভাবনা নেই, তখন তিনি বল্‌লেন—"ভাগ্যে মেয়েরা আর শিশুটি আসেনি। আর পাহাড় দেখে দরকার নেই, ফেরো।"

আমি বল্‌লাম—এতদূর যখন এলেন তখন গুহা না দেখেই ফিরে যাবেন?

তিনি পাল্কী থেকে নাম্‌তে কিছুতেই রাজী হলেন না। তখন আমি জোর ক'রে তাঁকে কিছু খাওয়ার জন্য অনুরোধ কর্‌লাম। তিনি কেবল একটি কলা খেলেন। আমি নাসপাতি ছাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না ক'রে বল্‌লেন—"আমার কি শক্ত জিনিস খাবার জো আছে। তোমরা যদি কিছু খেতে পাও তবে উমাচরণকেও একটু দিও।"

আমি বল্‌লাম—উমাচরণকে আমি খেতে দিয়েছি।

উমাচরণ তাঁর ভৃত্য, বালককাল থেকে তাঁর পত্নীর কাছে আদরে যত্নে কাজ শিখে মানুষ হয়েছে। ভৃত্যের প্রতি কবির সন্তানবাৎসল্য ছিল।

সন্ধ্যাবেলা বেলা ষ্টেসনে ফিরে গেলাম। কবির সমস্ত দিন স্নান হয়নি, আহার হয়নি, রৌদ্রে পথে যাতায়াতে ও মনের বিরক্তিতে তাঁর চেহারা অত্যন্ত ম্লান ও গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। তিনি ষ্টেসনের এক ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত প্লাটফর্মের উপর পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লেন।

আমরা কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস কর্‌ছিলাম না। অনেকক্ষণ পরে আমি আস্তে আস্তে তাঁর পিছনে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগ্‌লাম। তিনি আমাকে নিকটে দেখে বল্‌লেন—"জীবনে দুঃখ পাওয়ার দরকার আছে।"

আমি তাঁর কথা সমর্থন ক'রে কি বল্‌তে গেলাম। তিনি সে কথা গ্রাহ্য না ক'রে দুঃখ সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব অবতারণা ক'রে অনর্গল বলে

যেতে লাগ্‌লেন। আমি বুঝ্‌লাম, ঐ যে দার্শনিকতা তা কেবল নিজের বিরক্ত মনকে সান্ত্বনা দেবার ও রুষ্ট মনকে শান্ত কর্‌বার উপায় মাত্র, তাঁর ঐ উক্তি স্বগত, আমাকে উপলক্ষ ক'রে নিজেকে বলা। অতএব আমি চুপ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে শুন্‌তে লাগ্‌লাম মাত্র। আমার অত্যন্ত দুঃখ হয় যে ঐ চমৎকার উক্তির একবর্ণও আমার এখন মনে নেই; যদি তা প্রকাশ কর্‌তে পার্‌তাম তবে সেটি তাঁর 'ধর্ম' নামক পুস্তকে যে দুঃখ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে তার চেয়েও উৎকৃষ্ট ব'লে গণ্য হতো।

আমাদের বরাবর যাত্রার কাহিনী 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। যা সেখানে নেই তাই আমি বল্‌ছি।

কবি অনেকক্ষণ কথা কয়ে ক্লান্ত হ'য়ে স্তব্ধ হলেন।

আমি ওয়েটিং রুম থেকে একখানা চেয়ার প্লাট্‌ফর্মের মধ্যখানে পেতে দিয়ে তাঁকে বস্‌তে অনুরোধ কর্‌লাম। তখনো আমাদের ট্রেন আস্‌তে দেরী আছে। অল্পক্ষণ পরে গয়া থেকে একখানা ট্রেন এলো। গেঁয়ো ষ্টেসনের প্লাট্‌ফর্মের উপর ঐ অসাধারণ চেহারার ও পোশাকের লোককে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে দেখে ট্রেনের সকল গাড়ীর জানালা থেকে মুখ ঝুঁকে পড়্‌ল। ট্রেন চ'লে গেল। কয়েক জন গেঁয়ো লোক সেই ষ্টেসনে নেমেছিল। তারা বাইরে বেরিয়ে যাবার পথে সৌম্যমূর্তি কবিকে সমাসীন দেখে তাঁর থেকে দূরে অথচ তাঁর সাম্‌নে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের একজন দেখে দেখে গম্ভীরভাবে বল্‌লে— কোই রৈস (সম্ভ্রান্তব্যক্তি) হৈঁ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বল্‌লে— নেই, কোই রাজা হোঁইহেঁ। তৃতীয় ব্যক্তি দুজনেরই অনুমান না-পছন্দ ক'রে মাথা নেড়ে বল্‌লে— নেহি, কোই সাধু হৈঁ জরুর।

আমার মনে হলো ঐ তিনজনেরই অনুমান সত্য— তখন কবির মুখে আভিজাত্যের গাম্ভীর্য, রাজসিক তেজ, আর সাত্ত্বিক ভাবের স্নিগ্ধতা মিলে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। কবির মনে তখন যে সাত্ত্বিক ভাবের কি ঢেউ চলছিল তার সম্বন্ধে তাঁর 'গীতালি' পুস্তকের শেষের

কয়েক পৃষ্ঠা চিরকাল সাক্ষী হ'য়ে থাকবে।

পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।
হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
পেয়ে আবার হারাই মিলন ঘোরে।

বুদ্ধগয়ায় একদিন তিনি সমস্ত দিন অস্নাত অভুক্ত থেকে ঘরে দরজা দিয়ে কেবল গান লিখে লিখে ভগবানের সঙ্গে মিলন অনুভব করেছিলেন। তারও একটু পরিচয় 'গীতালি'র পাতায় লেগে আছে।

তোমার কাছে চাইনে আমি অবসর।
আমি গান শোনাব গানের পর।
বাইরে হোথায় দ্বারের কাছে
কাজের লোকে দাঁড়িয়ে আছে,
আশা ছেড়ে যাক্না ফিরে
আপন ঘর।
আমি গান শোনাব গানের পর।

গয়া থেকে রবিবাবু এলাহাবাদ গেলেন। আমাকেও সঙ্গে যেতে হলো। আর সবাই শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। এই যাত্রায় ১৩২১ সালে এলাহাবাদে 'বলাকা'র জন্ম হয়। যখন তিনি ফিরে কল্‌কাতায় এলেন তখন মাঘ মাস। তিনি আমাকে বল্‌লেন—"দেখ চারু, আস্‌বার সময় রেল লাইনের দুধারে দেখ্‌লাম কত ফুল ফুটে রয়েছে। তারা সব বসন্তের অগ্রদূত। তাদের ওপর আমার একটা কবিতা লিখ্‌তে ইচ্ছে

করছে। কিন্তু আমাদের দেশের বুনো ফুলের তো কোনো নাম নেই। অভিধানে পণ্ডিত মশায়রা পুষ্পবিং বলেই খালাস। তাদের পরিচয় জানবার জন্য কারো মনে যদি এতটুকু আগ্রহ থাকত, তাহলে য়ুরোপীয় ফুলের মতন তাদেরও নাম গোত্র সব নির্ণয় হ'য়ে যেত।"

আমি বল্‌লাম—আপনি ওদের নামকরণ করে ওদের জাতকর্ম করে দিন, ওরা ঐ নামেই চিরকাল পরিচিত হবে।

কবি কবিতা লিখ্‌লেন, কিন্তু প্রচলিত ফুলের বেনামীতে।—

ওরে তোদের ত্বর সহে না আর।
  এখনো শীত হয়নি অবসান।
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
  সবাই মিলে গেয়ে উঠিস্ গান।
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল।

আমার স্মৃতি থেকে লেথার সময়ের পৌর্বাপর্য সব ঘটনায় রক্ষা ক'রে বল্‌তে পারছি না। একটু আধটু উল্টাপাল্টা হ'য়ে যাচ্ছে। পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে দেখে শুনে লিখ্‌লে হয় তো কতকটা পৌর্বাপর্য রক্ষা হ'তে পারত। কিন্তু আমি তো ইতিহাস লিখ্‌ছি না, আমি লিখ্‌ছি আমার মনে রবীন্দ্রনাথের ছবি। তাই ঘটনার ওলোট পালোটে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

একবার এক উৎসব উপলক্ষে আমরা অনেকে শান্তিনিকেতনে গেছি। কবি আমার সঙ্গী বন্ধুদের বল্‌লেন—"দেখো, তোমরা যেখানে থাক্‌বে সেখানে চারুকে আর সত্যেন্দ্রকে নিয়ে যেয়ো না। তোমরা সমস্ত রাত গোলমাল করবে, ঘুমুবে না। চারু বড় ঘুমকাতুরে আর সত্যেন্দ্রের শরীর ভালো নয়। তোমরা ওদের আমাকে দিয়ে যাও। আমি ওদের থাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে রাখবো।"

বন্ধুরা আমাদের আশা ত্যাগ ক'রে তাঁদের বাসায় চ'লে গেলেন। আমরা কবির সঙ্গে আহার ও আলাপ ক'রে শয়ন কর্‌লাম কবিরই শয়ন-

কক্ষের পাশের ঘরে, তাঁরই বিছানায় তাঁরই মশারি খাটিয়ে। অল্প দু-একটা কথা বলার পর সত্যেন্দ্র ও আমি নীরব হ'য়ে গেলাম। খানিক পরে সত্যেন্দ্র মৃদুস্বরে আমাকে ডাক্‌লেন—"চারু, ঘুমিয়েছ?"

আমি বল্‌লাম—না।

সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কি ভাব্‌ছ?"

আমি পাল্টে প্রশ্ন কর্‌লাম—তুমি কি ভাব্‌ছ?

সত্যেন্দ্র বল্‌লেন—"আমি ভাবছি যে আমাদের কী সৌভাগ্য। আমার আনন্দে ঘুম আস্‌ছে না।"

একবার ১৩২২ সালে বা ১৩২১ সালের শেষে 'প্রবাসী'র জন্য একখানি উপন্যাস আবশ্যক হয়। রবিবাবুকে অনুরোধ করবার জন্য আমি আর সত্যেন্দ্র তাঁর কাছে গেলাম। রবিবাবুকে আমাদের আবেদন জানালে তিনি আমাকে বল্‌লেন—"তুমি নিজে লেখ না।"

আমি বল্‌লাম "আমার প্লট মনে আসে না। প্লট পেলে লিখ্‌তে চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি।"

কবিগুরু বল্‌লেন—"তোমরা সব বড় পরে জন্মেছ। বছর কুড়ি আগে যদি জন্মাতে তাহলে তোমাদের আমি দেদার প্লট দিতে পার্‌তাম। তখন আমার মনে হতো আমি দুহাতে প্লট বিলিয়ে হরির লুট দিতে পারি। একটা প্লট আমি নিজে লিখ্‌ব ব'লে ভেবে রেখেছিলাম, সেইটেই তোমাকে দিই। ধরো একটি শিক্ষিত মেয়ে এক অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে গিয়ে পড়্‌ল। তার আদর্শের সঙ্গে ওদের কি রকম বিরোধ বেধে যাবে তাই দেখাও...

ঐ প্লটটি আমার 'স্রোতের ফুল' নামক উপন্যাসের ভিত্তি।

এর পরেও আমি তাঁর কাছ থেকে প্লট পেয়েছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য তাঁর জোড়াশাঁকোর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। কবি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"চারু, কি লিখ্‌ছ?"

আমি তো সর্বদাই কিছু না কিছু লিখি, বেকার ব'সে কখনো থাকি না। কিন্তু সেসব লেখা কি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা ব'লে গণ্য হবার যোগ্য। তাই তিনি আমাকে যখনই জিজ্ঞাসা করেন আমি কিছু লিখ্‌ছি কি না, তখনই আমি আমার লেখার বিষয় গোপন ক'রে বলি, না আমি কিছুই লিখ্‌ছি না। আমি কিছুই লিখ্‌ছি না শুনে তিনি বল্‌লেন—"দেখ, সরস্বতী স্ত্রীলোক, তাকে বশ করতে হলে কেবল সাধ্যসাধনায় তার মন পাওয়া যাবে না, তার উপরে মাঝে মাঝে কড়া হুকুম করাও দরকার। জানো তো যে মেয়েরা কড়া স্বামী ঝাল লঙ্কা আর জোঁদা টক পছন্দ করে। তুমি একটু হুকুম ক'রে দেখো, ঠিক বশ মানাতে পারবে।"

আমি বল্‌লাম— একটা প্লট পেলে লিখ্‌তে চেষ্টা করতে পারি।

কবি একটু উন্মনা হয়ে বল্‌লেন—"প্লট! আচ্ছা ধরো..."

তার পর যে গল্পের কাঠামো বল্‌লেন তাকে আমি 'দুই তার' নামক উপন্যাসে রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। এর পরে আমার 'হেরফের' উপন্যাসের প্লট বোলপুরে পেয়েছিলাম, আর 'ধোঁকার টাটি'র প্লট তিনি আমাকে শিলং পাহাড় থেকে পত্রে লিখে পাঠিয়েছিলেন, যদিও রামযাত্রার চিত্র এঁকে আমি অনেকের বিরাগভাজন হয়েছি।

একবার মাঘোৎসবের দিন আমি জোড়াশাঁকোর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। আমি যেতেই দারোয়ান আমাকে বল্‌লে—"বাবুমশায় আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।"

বন্ধুরা সব সভায় গেল, আমি কবির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ীর উপরতলায় একেবারে পশ্চিমের দিকের ঘরে গেলাম। কি জন্যে আমাকে ডেকেছিলেন তা আমার এখন মনে নেই, কিন্তু সেদিন আমি আর একটি যে দৃশ্য দেখেছি তা আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে।

দারোয়ান এসে খবর দিলে একজন লোক বাবুমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কবি বল্‌লেন—"তাকে বলো, এখন তো আমার সময় নেই। উপাসনা আরম্ভ হবার সময় হয়ে এসেছে, আমাকে সভায় যেতে হবে।"

দারোয়ান বল্‌লে— সেই লোকটিকে এ কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি বল্‌লেন তিনি বেশীক্ষণ বিলম্ব করাবেন না, তিনি কেবল মাত্র প্রণাম করেই চ'লে যাবেন।

কবি তাঁকে আস্‌তে অনুমতি দিলেন।

যিনি এলেন, দেখ্‌লাম, তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ, অপর একজন তাঁর হাত ধ'রে নিয়ে আস্‌ছে। তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি কি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে এসেছি।"

কবি বল্‌লেন—"হাঁ, আমি রবীন্দ্রনাথ।"

বৃদ্ধ ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বল্‌লেন—"আমি অন্ধ, আমার এক মেয়ে সম্প্রতি বিধবা হয়েছে। কিন্তু বিধবা হ'য়ে সে কয়েকদিন কান্নাকাটি ক'রে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। আমার কৌতূহল হলো জান্‌তে যে তার কি হলো যে হঠাৎ কান্না বন্ধ হয়ে গেল। তাকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। সে বল্লে—'আমি রবিবাবুর "নৈবেদ্য" বই প'ড়ে তা থেকে পরম সান্ত্বনা পেয়েছি, আর আমার শোক দুঃখ কিছু নেই।' আমি তাকে বল্‌লাম—'দারুণ শোক তাপ দূর হয়ে যায় এমন যে বই তুমি পেয়েছ, তা আমাকেও প'ড়ে শোনাও।' মেয়ে আমাকে সেই বই প'ড়ে প'ড়ে শোনালে। আমি তা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি আর বড় সান্ত্বনা লাভ করেছি। এই কথাটি বলে আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবার জন্য আমি কল্‌কাতায় এসেছি।"

এই কথা ব'লে অন্ধ আবার কবিগুরুকে প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে চ'লে গেলেন। আমি 'নৈবেদ্যে'র ভাব হৃদয়ে ধারণ ক'রে কবির সঙ্গে মাঘোৎসবের উপাসনায় যোগ দিতে গেলাম।

রবীন্দ্রনাথের বিনয় ও ধৈর্য অসাধারণ। কল্‌কাতায় এলে তাঁর কাছে দর্শকের আনাগোনার আর অন্ত থাকে না। সকাল সাতটা থেকে লোক

আস্‌তে আরম্ভ করে, আর রাত নটা দশটা পর্যন্ত আস্‌তে থাকে। যার যখন অবসর ও ইচ্ছা সে তখন আসে, কিন্তু কবির যে বিশ্রাম করার অবসর পাওয়া দর্‌কার, তাঁর যে স্নানাহার আবশ্যক, এ সম্বন্ধে কারুরই হুঁশ থাকে না। আমারও থাকৃত না সে অপরাধ স্বীকার ক'রে রাখি, আমাদের মনে হতো যে আমাদের যখন অবসর আছে তখন তাঁরও আছে। এক একদিন দেখেছি, লোকের পরে লোক আস্‌ছে, কবি ঠায় ব'সে আছেন, নড়া নেই চড়া নেই বসার ভঙ্গী পরিবর্তন করা নেই, ভৃত্য এসে দূরে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে যে আহার অপেক্ষা কর্‌ছে, কবি তার দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে নীরবে তিরস্কার করেছেন আর সে বেচারা মুখ কাচুমাচু ক'রে পলায়ন করেছে। আমি অনেক সময় আগন্তুকদের কৌশলে বিদায় ক'রে দিয়ে কবিকে উদ্ধার করেছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা গেছি, লোকের পরে লোক আস্‌ছেন, কেউ নূতন গান শিখে নিচ্ছেন, কেউ তাঁকে দিয়ে কিছু পড়িয়ে শুন্‌ছেন, কেউ নানা বাজে কথা পেড়ে বকর বকর কর্‌ছেন। আর কবি অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের সকলের মন রক্ষা কর্‌ছেন। রাত্রি আটটা বেজে গেল, আমরা উঠি উঠি কর্‌ছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"আচ্ছা আপনার ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে মত কি? আমার তো মনে হয়"—চল্‌ল তাঁর অনর্গল বক্তৃতা। কবি তাঁকে বল্‌লেন—"দেখ, তোমার সঙ্গে বুঝি চারুর পরিচয় নেই, ও সম্পাদক মানুষ, ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে রাখ্‌লে তোমার ফ্রয়েডের কিছু হিল্লে লাগ্‌তে পারে।" সে ভদ্রলোক কবির ব্যঙ্গ বুঝতে পার্‌লেন না। তিনি কেবল এক "ও" বলে আবার বকতে লাগ্‌লেন। তাঁর বকুনি আর থামে না দেখে আমি উঠবার উপক্রম কর্‌লাম, তখন প্রায় রাত্রি দশটা। আমাকে চ'লে যেতে উদ্যত দেখে কবি আমাকে বল্‌লেন, "চারু, তুমি চলে যেও না, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে, তুমি আর একটু বোসো।"

এতক্ষণে সে ভদ্রলোক উঠ্‌লেন। তিনি চ'লে গেলে কবি কুপিত ভাবে আমাকে বল্‌লেন—"চারু, তোমাকে আমি আমার বন্ধু ব'লে জান্‌তাম, কিন্তু সে ভ্রম আজ আমার ঘুচ্‌ল।"

আমি তো অবাক্। ভীত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চাইতেই তিনি রেগে বল্‌লেন—"তুমি আমাকে ঐ ফ্রুডের ভূতের হাতে অসহায় ফেলে রেখে চ'লে যাচ্ছিলে কোন্ আক্কেলে।"

আমি তো এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে হেসে বাঁচলাম।

সেই ভদ্রলোক এতক্ষণ ফ্রয়েড নামকে ফ্রুড উচ্চারণ ক'রে ক'রে আমাদের মনের মধ্যে যে হাস্য জমা ক'রে তুলেছিলেন, তা এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে গেল।

এর পরে একদিন আমি রাত নটার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে দেখলাম তাঁর ঘরে তখনো অনেক লোক ব'সে রয়েছেন। আমাকে দেখে রথীবাবু আমাকে বাইরে ডেকে বল্‌লেন—"সকাল থেকে বাবা এই ঘরে ব'সে আছেন, তাঁর এখনো স্নানাহার হয় নি, আপনি যদি পারেন সব লোককে বিদায় কর্‌তে একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন।"

আমি তখন নিতান্ত অসভ্যের মতন ঘরের সব লোককে ডেকে ডেকে কবির অবস্থা জ্ঞাপন কর্‌তে লাগ্‌লাম। রূঢ় হবে ব'লে বাড়ীর লোকেরা যে কথা বল্‌তে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন, আমি বাইরের লোক হওয়াতে তা অনায়াসে ব'লে সকলকে বিদায় কর্‌তে লাগ্‌লাম। সকলকে বিদায় ক'রে আমিও বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিয়েছি, দেখ্‌লাম আর একজন ভদ্রলোক তখন সিঁড়িতে উঠ্‌ছেন, রাত দশটা হয়েছে, তাঁর ডাক্তারী ব্যবসায়ের বিশ্রামের অবসরে তিনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। আমি তাঁকে সিঁড়িতেই গেরেপ্তার ক'রে কবির দুরবস্থার সংবাদ দিলাম, কিন্তু তাঁর অনুকম্পা উদ্রেক কর্‌তে পার্‌লাম না। তিনি আবার ভয়ানক বাচাল ও গল্পে ; তিনি একবার কথা ফেঁদে বস্‌লে কোথায় যে তাঁর কমা সেমিকোলন পড়বে তা কেউ বলতে পারে না,

তাঁর কথায় তো কোথাও দাঁড়ি ছেদ নেই-ই। তাঁকে নাছোড়বান্দা হ'য়ে ঘরে প্রবেশ কর্‌তে দেখে রথীবাবু যেরকম হতাশ নিরুপায় ভাবে আমার দিকে চাইলেন তাতে আর আমার চ'লে যাওয়া হলো না, আমি কবিকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য আবার ঘরে ফিরে গেলাম এবং পাঁচ মিনিট পরেই আগন্তুককে স্পষ্ট ব'লে দিলাম যে রাত অনেক হয়েছে, এখন আমাদের চলে যাওয়া নিতান্ত উচিত।

রবীন্দ্রনাথের ধৈর্যের পরিচয় আমি আর একদিন পেয়েছিলাম, তা যথাস্থানে বল্‌তে ভুলে গেছি। ১৩২১ সালে যখন 'গীতালি'র গান রচনা চল্‌ছিল, তখন আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছুদিন ছিলাম তা আগে বলেছি। তার কিছুদিন আগে কবি সুরুলে নূতন বাড়ী কিনেছেন, যেখানে এখন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত আছে। একদিন কবি বল্‌লেন, "চলো চারু, তোমাকে আমার নূতন বাড়ী দেখিয়ে নিয়ে আসি।" আমরা এক ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে রওনা হলাম। বোলপুর বাজারের কাছে গিয়ে একটা অপরিসর রাস্তার মধ্যে গাড়ীর মোড় ফেরাবার দরকার হলো। কবি গাড়ীর ভিতর থেকে চীৎকার ক'রে কোচমান্‌কে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"ওরে এখানে মোড় ফেরাবার চেষ্টা করিসনে, করিসনে, গাড়ী উল্‌টে যাবে, গাড়ী উল্‌টে যাবে।"

কোচমান তাঁর নিষেধ না শুনে গাড়ী ঘোরাতেই লাগ্‌ল। কবি শান্ত ভাবে আমাকে বল্‌লেন যে গাড়ী উল্‌টে যাবে, তুমি ভয় পেয়ো না, গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়্‌বার চেষ্টা করো না। এই ব'লে তিনি আমার হাত চেপে ধর্‌লেন পাছে আমি তাঁর নিষেধ না মেনে লাফ দিতে যাই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ী সত্যিই উল্টে গেল। আমাদের কিছুমাত্র আঘাত লাগেনি। আমরা গাড়ীর খোল থেকে গর্তের ভিতর থেকে উপরে ওঠার মতন ক'রে বেরিয়ে এলাম। তার পর হেঁটে শান্তিনিকেতনে ফির্‌লাম, সেদিন আর সুরুলে যাওয়া হলো না।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ যেদিন এল, সেদিন কবির

বিচলিত ভাব আর অধৈর্য দেখেছি। সমস্ত দিন অনাহার অস্নাত। রুক্ষ শুষ্ক চেহারা, মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে, কারো সঙ্গে কোনো কথা নেই, কেবল বারান্দার একধার থেকে আরেক ধার পর্যন্ত পায়চারি করছেন। কাছে কেউ যেতে সাহস করছে না, কেবল এণ্ড্রুজ সাহেব একবার তাঁর কাছে গিয়ে কি বল্লেন, আর কবি উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠ্লেন—"ও নো নো নো!"

তার পর তাঁর লেখ্বার টেবিলে ব'সে খস্খস্ করে লর্ড হার্ডিংকে পত্র লিখে নিয়ে এসে এণ্ড্রুজ সাহেবকে দেখ্তে দিলেন। এণ্ড্রুজ সাহেব সেই চিঠি প'ড়ে বল্লেন বড় উগ্র হয়েছে। চিঠিটা আরো মোলায়েম করা দর্কার। কবিকে অনেক সাধাসাধি ক'রে সাহেব কিছু পরিবর্তন করতে সম্মত করালেন। কিন্তু যা পরিবর্তন হলো তাও সকলের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করতেই লাগ্ল। কবি আর মোলায়েম করতে রাজী হলেন না। সেই চিঠিই বোধ হয় লাট সাহেবের কাছে গিয়েছিল, এবং সমস্ত ভারতবাসীর আহত আত্মসম্মান রক্ষা করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ পূর্তি হ'লে সত্যেন্দ্র প্রস্তাব করেন যে সাহিত্য-পরিষৎকে দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করাতে হবে। সত্যেন্দ্র আর মণিলাল পরম উৎসাহ সহকারে টাকা সংগ্রহ করতে ও লোকমত গঠন করতে লেগে গেল। আমি বরাবর তাদের সহকারী হ'য়ে কাজ ক'রে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন ক'রে তুলেছিলাম। ভাগ্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে আমরা তাঁকে দেশের সাহিত্য-পরিষৎকে দিয়ে সম্বর্ধনা করাতে পেরেছিলাম, তাই দেশের ইজ্জৎ রক্ষা হয়েছে, নইলে আমাদের লজ্জা রাখ্বার আর জায়গা থাকৃত না।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আহার কর্বার সৌভাগ্য আমার কয়েকবার হয়েছে। কবির সবই কবিত্বময়। আহার-স্থান সজ্জিত করা হয়েছিল যেন এক পরীস্থান রূপে। দুটি নিমন্ত্রণসভার বর্ণনা দেবার ক্ষীণ চেষ্টা আমি করেছি আমার 'যমুনাপুলিনের ভিখারিণী' আর 'জোড়-বিজোড়' নামক উপন্যাসের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ এমনি বিনয়ী যে 'প্রবাসী'র জন্য কোনো লেখা আমার হাতে দিয়ে বা চিঠিতে পাঠিয়ে আমাকে বল্‌তেন—দেখো 'প্রবাসী'তে চল্‌বে কি না।

আমি বাংলা বানান সম্বন্ধে অনেক চিন্তা ক'রে বানান সংস্কার কর্‌বার চেষ্টা করেছি। আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার যে আমি রবীন্দ্রনাথকে আমার মতাবলম্বী করতে পেরেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তোমার এক 'মতো' ছাড়া সব বানান আমি মেনে নিলাম, তবে যদি সুনীতি চাটুজ্জেও তোমাকে সমর্থন করেন তবে অগত্যা আমাকে সেটাও মেনে নিতে হবে।

তিনি কল্‌কাতা ইউনিভার্সিটিতে তিনটি বক্তৃতা করেন এবং সেগুলি পরে 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়। তিনি এই সময় চীনদেশে যাবেন ব'লে বড় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি শ্রীমান্ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ব'লে দিলেন যে প্রুফ চারুকে দিয়ে দেখিয়ে নিলে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিদেশে যেতে পারব। প্রথম প্রবন্ধের প্রুফ যেদিন আমার কাছে এলো তার পর দিন কবি চীনে যাবেন। আমি রাত্রে তাড়াতাড়ি প্রুফ দেখে সকালেই কবিকে একবার দেখিয়ে নেব ব'লে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। প্রুফের মধ্যে আকূতি শব্দটা আকুতি হ'য়ে থেকে গিয়েছিল, আমি সংশোধন করিনি। কবি আমাকে বল্‌লেন—"চারু, তোমার দেখা প্রুফে ভুল থেকে গেল কেমন ক'রে!"

এই তিরস্কারও আমার কাছে পরম পুরস্কার ব'লে মনে হলো।

চীন থেকে যেদিন ফিরে এলেন, সেদিন আমিও ষ্টিমার-ঘাটে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলাম। আমি তখন কঠিন পীড়াগ্রস্ত, একরকম চলচ্ছক্তিহীন। কবিগুরু ডাঙায় নেমেই আমাকে দেখে সস্নেহে আমার পিঠে হাত রেখে আমাকে বল্‌লেন— "চারু, তোমার একি দশা হয়েছে! প্রতিপচ্চন্দ্রমা ইব!" সেই স্নেহ স্পর্শ আজও আমার অঙ্গের ভূষণ হ'য়ে রয়েছে।

তখন 'পূরবী'তে প্রকাশিত কবিতা লেখার পালা চলেছে। আমাকে কবি পত্র লিখে জানালেন—"চারু, কয়েকটা কবিতা লেখা হয়েছে, খদ্দের অনেক, আগে তোমাকে প'ড়ে শোনাতে চাই, দেখে যেতে পারো যদি কোনোটা তোমাদের 'প্রবাসী'তে চলে।" আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে প'ড়ে শোনালেন অনেকগুলি কবিতা। আমি বল্‌লাম—এ যে দেখি আপনার আবার 'মানসী' 'সোনার তরী'র যুগ ফিরে এসেছে!

কবি হেসে বল্‌লেন—"তবে যে তোমরা বলো যে আমি আর কবিতা লিখ্‌তে পারি না। তবে ভালো হয়েছেই বলে তুমি বেশী লোভ কোরো না, একটা—গোণা একটা—বেছে নাও।"

আমি দুটি কবিতা বেছে তাঁকে বল্‌লাম—এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি আমি নেবো, তা আর আমি স্থির কর্‌তে পারছি না, আপনিই দিন যেটা হয়।

কবি হেসে বল্‌লেন—"তুমি ভারি চালাক, দুটো নেবারই ফন্দি; তবে ঐ দুটোই নাও।"

সেই সব কবিতার কবির হাতে লেখা কপি আমার কাছে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

যখন আমি কবির কবিতা থেকে চয়নিকা প্রথম প্রকাশ করি, তখন কবির সঙ্গে বহু কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়। পরেও ঢাকায় শিক্ষকতা করার উপলক্ষে অনেক কবিতার মর্ম আমি তাঁর কাছ থেকে জেনে নেবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পেয়েছি। সে গুলিও আমার কাছে লেখা আছে। যদি অবসর পাই তবে কবির কাব্যের মর্মকথা প্রকাশ কর্‌বার বাসনা আছে।

সেই সময় আমি তাঁর সমস্ত গানেরও একটা সংগ্রহ প্রকাশ করি। আমি তখন তাঁকে অনুরোধ ক'রে ক'রে বহু গান তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। প্রেমের গানও বাদ দিই নি। আমি তাঁকে যেদিন "বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল, সে কি আমারই পানে ভুলে চাহিবে না" গানটি গেয়ে শোনাতে অনুরোধ কর্‌লাম, সেদিন আমাকে তিনি বল্‌লেন

—"চারু, তুমি আমার মান মর্যাদা আর কিছু রাখ্‌লে না। তবে দরজা দাও, তোমার কাছে তো খেলো হয়েইছি, আর অপরের কাছে আমাকে খেলো কোরো না।"

কবি যখন কল্‌কাতায় 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় করেন, তখন তাঁর হুকুমে আমার মতন মুখচোরা অক্ষমকেও রঙ্গমঞ্চে নাম্‌তে হয়েছিল। শেষ দৃশ্যে যখন কবি-বাউল সকলের সঙ্গে মিলে বসন্তের বন্দনা গান কর্‌ছিলেন তখন আমি তাঁকে দেখার প্রলোভন ত্যাগ কর্‌তে না পেরে পকেট থেকে আমার চশমা বার ক'রে চোখে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। কবি নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমার কাছে এসেই দিলেন এক ধমক— চশমা খুলে ফেল বল্‌ছি!

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একজন বাংলার উপাধ্যায় চাই জেনে আমি সেই পদের জন্য প্রার্থী হবো স্থির ক'রে রবীন্দ্রনাথের সুপারিশ পাবার জন্য তাঁকে শান্তিনিকেতনে পত্র লিখ্‌লাম। তিনি তখন কল্‌কাতায় এসেছেন, আমি পীড়িত ছিলাম ব'লে খবর পাই নি। দুদিন পরে খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলাম। আমি তাঁকে আমার আবশ্যক নিবেদন কর্‌লে তিনি বল্‌লেন—"দেখো দেখি তোমার কাণ্ড, তোমার কি সব অসাময়িক, যদিও তুমি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক! এতদিন তুমি কী কর্‌ছিলে? আজই সকালে আমি একজনকে ঐ কাজের উপযুক্ত ব'লে প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছি, এখন আমি তোমাকে কি ব'লে সুপারিশ করি বলো তো। তুমি আমাকে কী মুস্কিলেই যে ফেল্‌লে তার আর ঠিকানা নেই।"

আমি বল্‌লাম—আপনি আমাকেও একটা যা হয় লিখে দিন। তার পর আমার গুণপনা আর আপনার প্রশংসা আর অপর প্রার্থীর গুণপনা ও আপনার প্রশংসা যাচাই হ'য়ে যার ভাগ্যে হয় জয় জুটে যাবে।

কবি চিন্তিত হ'য়ে গম্ভীর হলেন। আমি বুঝ্‌লাম যে আমার অনুরোধ তাঁকে বিপন্ন করেছে। তখন আমি প্রশংসাপত্র বিনাই বিদায়

নেবো ভাবছি, এমন সময় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমার যাও ক্ষীণ আশা ছিল, তাও আর রইল না, আমার স্থির ধারণা হলো যে আর আমার কোনো প্রশংসাপত্র পাওয়ার পথ খোলা রইল না।

কবি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়্‌লেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেলেন—"চারু, তোমরা বোসো, আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে, আমাকে কাপড় বদ্‌লে এখনি বেরুতে হবে।"

অল্পক্ষণ পরেই কবি কাপড় বদ্‌লে আলখাল্লা প'রে ফিরে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে আমার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়াতে তিনি চোখের ইসারায় আমাকে তাঁর অনুসরণ ক'রে যেতে বল্‌লেন। আমি উঠে বেরিয়ে পড়লাম, এবং কবির সঙ্গে তাড়াতাড়ি মোটরে চ'ড়ে রওনা হলাম—কোথায় তা তখনো জানি না। মোটর জোড়াশাঁকো থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলে তিনি শোফারকে আদেশ করলেন গাড়ি বিশ্বভারতীর আপিসে নিয়ে যেতে। সেখানে গিয়ে কবি আমার জন্য সুপারিশ ক'রে ভাইস চ্যান্সেলার হার্টগ সাহেবকে এক পত্র লিখে দিলেন, তাতে আমাকে যে প্রশংসা করলেন তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সেই পত্র আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"দেখো তো, হবে?"

আমার মন আনন্দে এমন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে আমি কথা বল্‌তে পার্‌লাম না। তখন কবি আমাকে বল্‌লেন—"দেখ চারু, তোমার জন্যে আমি আজ যা কর্‌লাম তা আমার অতি নিকট কোনো আত্মীয়ের জন্যেও কর্‌তাম না।"

কবীন্দ্রের সেই পত্রের প্রশংসার জোরেই এখানে আমার চাকরী হ'য়ে গেল এবং সেই চাকরী আমি এখনো কর্‌ছি।

কবি-মানুষটিরই পরিচয় বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল। কবি-মানসের পরিচয় দেবার আর স্থান নেই। শুধু তাঁর কবিমনের কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ ক'রেই আমার প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

রবির উদয়ে যেমন বিশ্ববাসী নবচেতনা লাভ করে, আমাদের রবির উদয়েও তেমনি আমাদের দেশের এক অপূর্ব চেতনা লাভ হয়েছে। তিনি নরোত্তম, তিনি আমাদের দেশের তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতিভূ, তিনি সত্য শিব সুন্দরের উপাসক কবি। তিনি ব্যক্তিজীবনে ও জাতিজীবনে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হওয়ার বাণী শুনিয়েছেন। তাঁর জীবন-দেবতা তাঁকে ক্রমাগত "শঙ্খ" বাজিয়ে "আবার আহ্বান" করেছেন—আগে চল আগে চল! তিনি সুন্দর ভুবনকে ভালোবেসেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছে শ্যাম সমান—

সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।

ইহপরকালকে সুন্দর আনন্দময় ব'লে যিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে অভয় দিয়ে কেবল মাত্র সত্যের পথে চল্‌তে বলেছেন বন্ধন থেকে মুক্তিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, তাঁর আশীর্বাদ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে সত্য হোক্।

পরিশিষ্ট ২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত -লিখিত পত্র ও প্রাসঙ্গিক রচনা

১

৫ সেপ্টেম্বর ১৯২১

৪৬, মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট
২০শে ভাদ্র ১৩১৯

পূজ্যবরেষু—

চারু ও মণিলালের চিঠিতে আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ পাইয়াছি। আনন্দে মনে মনে প্রণাম করিয়াছি ; কিন্তু, চিঠি লিখি নাই। কারণ বিলাতের অতিব্যস্ত জীবনের মধ্যে, correspondenceএর বোঝা বাড়াইয়া, আপনাকে আর অধিক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নাই।

আজ আমার নূতন প্রকাশিত "কুহু ও কেকা" এবং "জন্মদুঃখী" পাঠাইলাম ; এবং সেই ছুতায় আপনাকে চিঠি লিখিয়া ধন্য হইলাম।

বাংলার কবির বিলাতে সংবর্দ্ধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কাগজে পড়িয়াছি, কিন্তু উহা এতই সংক্ষিপ্ত যে উহাতে তৃপ্তি হয় নাই। সে যাহা হোক্, কবির দিগ্বিজয় জগতের ইতিহাসে, বোধ হয়, একেবারে নূতন জিনিস। কিন্তু, প্রতিভার এই প্রাপ্য পূজায় বিস্মিত হইবার বড় বেশী কিছু নাই। আমি জানিতাম, যে, আপনার কবিতার অমৃত আস্বাদ যে পাইবে, সেই আপনার বিশ্বজনীনতার অপূর্ব্ব সুরে মুগ্ধ হইবে। তা' সে ইংলণ্ডের লোকই হোক আর ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডেরই হোক্।

"জগৎ-কবি সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব ;
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী ! তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব।"

আপনার সম্মানে দেশের সকলেই সম্মানিত অনুভব করিতেছে। কেহ বলিতেছে, এই ব্যাপারে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, বাঙালী নূতন গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছে, আমাদের কবি-সংবর্দ্ধনার তরঙ্গ বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; আবার কেহ বলিতেছে, মহম্মদ মক্কার চেয়ে মদিনায় গিয়া বেশী সম্মানিত হইয়াছেন। এ সব বাহিরের কথা। এ ছাড়া, আমাদের পাঁচ সাত জনের ব্যক্তিগত একটি পরম লাভ হইয়াছে। আমরাও যে প্রকৃত সাহিত্যরসের আস্বাদ জানি এবং কবি ও অকবির প্রভেদ বুঝিতে পারি, তাহা ইংলণ্ডের সাহিত্য-রসিকেরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে।

Yeats, Pater, Rothenstine প্রভৃতির আপনার কবিতার উপর ভক্তির কথা পড়িয়া অবধি আমার একটি কথা মনে হয়। মনে হয়, যে, গোত্রগত প্রাধান্য এবং কুলদেবতার সঙ্কীর্ণ পূজাবিধি উল্টাইয়া দিয়া, সাম্রাজ্য-সম্ভব সমন্বয় এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ বা জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের বিশ্বজনীন পূজাবিধি, যেমন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনা করিয়াছিল, তেমনি cultureএর আধার বড় বড় Idealist বা কবিরাই বর্ত্তমান যুগের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, যুগধর্ম্মের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে মহামিলনের রাখীসূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া দিতেছেন। ইহাতে যে বিশ্বজনীনতার সূত্রপাত হইতেছে তাহার তুলনায় বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা মহম্মদের এক এক মহাদেশ-ব্যাপী মিলন-সঙ্ঘ ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাত্র। হয় তো, আমার এই সিদ্ধান্ত ভুল; তবুও ইহা আপনাকে নিবেদন করিলাম। সুবিধামত এ সম্বন্ধে একটু লিখিলে আনন্দিত হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

স্নেহার্থী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২

৫ নভেম্বর ১৯১২

৪৬, মস্‌জিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২০শে কার্ত্তিক ১৩১৯

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি দু'খানি যথাসময়ে পৌঁছেচে। 'কুহু ও কেকা' সম্বন্ধে আপনি যা' লিখেচেন তাতে আমি আপনার স্নেহেরই পরিচয় পেয়েছি। আশীর্ব্বাদের করুণ হস্তের স্পর্শই লাভ করেছি। আর আপনার কাছে এও আমাকে স্বীকার কর্ত্তে হবে, যে, মনে মনে একটু গর্ব্বও অনুভব করেছি। ভাল লিখ্‌তে পারি বলে নয়,— বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির স্নেহ লাভ কর্ত্তে পেরেছি বলে।

যখন 'তীর্থসলিল' এবং 'তীর্থরেণু'র জন্যে নানা দেশের কবির কবিতা সংগ্রহ ও অনুবাদ করছিলুম তখন ভেবেছিলুম, যে, আপনার রচিত যদি কোনো ইংরাজী কি সংস্কৃত কবিতা পাই তা' হলে সেটিকে অনুবাদ ক'রে আমার বিশ্ব-কবিসভা উজ্জ্বল ক'রে তুলি। কিন্তু, তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় আমার সেই মানসী কবি-সভায় একটি উচ্চতম আসনই শূন্য ফেলে রাখ্‌তে হ'ল। সেই অবধি মনটা ক্ষুণ্ণ এবং বইটায় খুঁৎ থেকে গেছে। এবারে আপনি ইংরেজীতে অনেক বই লিখেছেন এবং লিখ্‌ছেন; এই সময়ে যদি মৌলিক কোনো কবিতা,— অন্ততঃ Whitmanএর ধরনের গদ্য-কবিতা,— বাংলায় না লিখে একেবারে ইংরেজীতে লেখা হ'য়ে পড়ে তবে সে লেখাটি যেন আমি একবার দেখ্‌তে পাই। তা' হলে আমার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ কর্ত্তে পারব।

কলেজ ছেড়ে পর্য্যন্ত ইংরেজীতে কাউকে চিঠি পর্য্যন্ত লিখি নি, নইলে আর এক রকমেও ঐ সাধটা মিটতে পারত। অন্ততঃ আপনার অমূল্য সময় এবং অনুবাদের শ্রম অনেক পরিমাণে বাঁচিয়ে দিতে পারতুম; —অবশ্য আমার নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধ্যের অনুপাতে। কিন্তু, দুঃখের

বিষয় artistic expression আয়ত্ত করা দূরে থাক, ইংরেজীরচনার Idiom পর্য্যন্ত একরকম ভুলেই গিয়েছি। সুতরাং ইংরেজীতে কাব্যানুবাদের চেষ্টা, এখন আমার পক্ষে বিড়ম্বনা।

সর্ব্বশেষে আমার একটি নিবেদন আছে। য়ুরোপীয়েরা আমাদের আনন্দের অংশী হয়,— আমাদের কবির কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয় এতে আমাদের একটুও হিংসা হবে না, বরং আনন্দই হবে। আর সেই অমৃতের আস্বাদ যত বেশী পায় ততই ভাল। কিন্তু, আপনার অসুস্থ শরীরের কথাটাও একেবারে ভুল্‌লে চল্‌বে না। ইতি

প্রণত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৩

১৯ ডিসেম্বর ১৯১২

৪৬, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট

১৯শে ডিসেম্বর ১৯১২

শ্রীচরণেষু—

"গীতাঞ্জলি"র ইংরাজীটি পেয়ে অনুগৃহীত হলুম। *Nation*, *Times* ও *Atheneum*এর সমালোচনাও দেখিচি।

'জলে না নাব্‌লে সাঁতার শেখা যায় না' আমাদের স্বদেশী নেতারা যখন বিশেষ কোনো রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্যে সোরগোল সুরু করে থাকেন তখনই ঐ কথাটার উপরে বেশী ক'রে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কথাটা, একসময়ে, আমারও খুব ভাল লাগ্‌ত এবং ঠিক বলেই মনে হ'ত। কিন্তু, এখন দেখ্‌ছি, জলে নাবাটাও যেমন দরকারী, যে লোকটা সাঁতার শিখ্‌তে চাইছে তার ব্যক্তিগত শক্তি সামর্থ্যের ওজন বোঝাটাও তেম্‌নি দরকারী। আমাদের দেশে খবরের কাগজের অভাব নেই, কিন্তু সমঝদার সমালোচক

কই? অবশ্য, সবাই যে Matthew Arnold হ'বে কি Walter Pater হ'বে তা' আশা করা যায় না; Creative Criticism করবার মত প্রতিভা চিরকালই দুর্লভ আছে এবং থাক্‌বে। কিন্তু যেটুকু উচ্চ শিক্ষিত লোকদের কাছে স্বভাবতঃ আশা করা যেতে পারে তাই বা কই?

Nation বা *Times*এ যাঁরা গীতাঞ্জলির সমালোচনা লিখেছেন তাঁরা কেউ Matthew Arnold নন্, এ কথা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাঁদের মত লেখকই বা আমাদের দেশে কই? তাঁরা যে কথাটি বল্‌তে চেয়েছেন, তা' বেশ অনায়াসেই পরিষ্কার ক'রে বল্‌তে পেরেছেন, যা' বুঝেচেন তা অপরকেও বোঝাতে সমর্থ হয়েছেন; আমাদের সে সামর্থ্য কই?

আমাদের চেয়ে যে ওঁরা বেশী রসগ্রহণ করেছেন এ কথা আমি সহজে স্বীকার করতে পারি নে; কিন্তু যেটুকু পেরেছেন সেইটুকুতেই যশ্‌গুল্ হয়ে উঠেছেন; সেটুকু একলা ভোগ করেন্ নি, সকলকে বেঁটে দিয়েছেন, এইটেই তাঁদের বিশেষত্ব, এইটেই গৌরব। ওখানকার তুলনায় আমাদের দেশে cultureএর হাওয়া বইছে না বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না! এখানে ভাবের ব্যাপারীরা মাড়োয়ারী মহাজনদের মত নিজের নিজের পুঁজিটুকু নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করছে; লেনাদেনা একরকম বন্ধ; কোনো কিছুই ফলাও হ'তে পাচ্ছে না; আড়ৎদার চিরকাল আড়ৎদারই থেকে যাচ্ছে; হৌস্‌ওয়ালা সওদাগর হ'তে পাচ্ছে না। ভারি Depressing.

আপনার শরীর এখন কেমন? ওদিকেও একটু নজর রাখ্‌তে হ'বে; এটি আমাদের সকলের অনুরোধ!

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

স্নেহার্থী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পুনশ্চ—

এবার মাঘোৎসবে আমরা আপনাকে লাভ করতে পেলুম না। ভারি ফাঁকা বোধ হল।

৮ মে ১৯১৫

দেশমাতৃকার মনস্বী সন্তান সাহিত্য-সম্রাট কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথির পরমায়

ফুল ফোটানো আবহাওয়া এই
করলে কে গো সৃষ্টি ?
মধুর তোমার দৃষ্টি।
প্রণাম তোমায় করি,
আমরা কমল, ভুঁইচাঁপা, যূঁই
কুন্দ, নাগেশ্বরী।

মন-হরিণের মনোহরণ
বাজাও তুমি বংশী ;
মানস-সরের হংসী,
তোমার পানে চায় গো,—
উল্লাসেরি কলধ্বনি
কণ্ঠে তাহার ছায় গো।

সত্য-যুগের আদিম!— গ্রহ-
ছত্রপতি সূর্য্য!
তোমার সোনার তূর্য্য
ব্যক্ত চরাচরে,—
বাষ্প-গোপন-শক্তিতে সে
বজ্র সৃজন করে!

সত্য-মণি জাগাও তুমি,
　　চারু তোমার কর্ম্ম
ফুল ফোটানো ধর্ম্ম,—
　　জাগরণের সঙ্গী !
বিশ্বে তুমি নিত্য কর
　　নূতন রঙে রঙ্গী !

তোমার প্রকাশ মহোৎসবে
　　আমরা মিলি হর্ষে—
　　মিলি বরষ-বর্ষে ;
　　নাই আমাদের স্বর্ণ,
আমরা আনি অন্তরেরি
　　প্রীতির পরম-অন্ন !

জন্মতিথির পরম প্রসাদ
　　দাও আমাদের ভক্তি,—
　　প্রাণে পরম শক্তি ;
　　দেখাও তুনিরীক্ষ্য
অন্তরে যাঁর আরাম এবং
　　আসন অন্তরীক্ষ।

২৫শে বৈশাখ
১৩২২

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৮ মে ১৯১৮

মালা-চন্দন

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে)

বাংলাদেশের হৃদ্‌কমলে গন্ধরূপে নিলীন হ'য়ে ছিলে,
মূর্ত্তি কখন্ নিলে ?
কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে
ওগো কবি ! তোমার আগমনে—
নিখিল হৃদয় উঠ্‌ল দুলে নূতন স্ফূর্ত্তিভরে,
কাননে ফুল ফুটল থরে থরে,—
চাঁপার হ'ল তড়িৎ-কান্তি, অশোক যেন আলোয় আলো করে,
ওগো চমৎকার !
কানায় কানায় উঠ্‌ল ভ'রে আনন্দে সংসার !
গুমট্ কেটে বইল দখিন হাওয়া !
পাথর-চাপা কপাল যাদের তুমি তাদের নিধি হঠাৎ-পাওয়া
ওগো গন্ধরাজ !
এ কি পুলক রাজে তোমার ওই পরিমল-মণ্ডলেরি মাঝ !
স্বর্গে মর্ত্ত্যে এ কি আসা-যাওয়া !
তুমি এলে, বইল যেন বোধন-বেলার হাওয়া !
হাজার পাখীর কূজন-গানে শেষ অবসাদ—
কোথায় গেল ভেসে—
বিস্মরণী-লতায় ঘেরা কোন্ স্বপনের দেশে !

*

ছয় ঋতু গায় তোমার আগে ফুল্-মুকুলে-পল্লবিত পালা,
স্থবির স্থাবর জগৎ জাগে, উচ্চকিত চক্ষে কি তার আলা !
মৃত্তিকাময় পৃথ্বী-ছাড়া দূর গগনে কৃত্তিকা ছয় বোন্

পীযুষ-ব্যথা বক্ষে নিয়ে হ'ল যে উন্মন
ধাত্রী তোমার হ'তে
হৃদয়-রসের সকল ধারা তোমায় ঘিরে বইল উছল স্রোতে ;
পান ক'রে তায়, স্নান ক'রে তায়
দান ক'রে তায় দু' হাত ভ'রে ভ'রে
তৃষার্ত্ত প্রাণ সুধার ধারায়
দিলে সরস ক'রে।
সরস্বতীর হরষ-বীণায় স্পন্দ-রূপে লুকিয়ে ছিলে তুমি
কোন্ উষসী জাগিয়ে দিল চুমি'—
তোমায় ওগো মঞ্জু-গায়ন্ কবি !
ভালে কি তার এম্নিধারা চাঁপার দিনের চাঁপার বরণ রবি
মূর্ত্তি ধ'রে সপ্তম রাগ উদয় হ'লে রাগ-রাগিণীর মেলায় !
বাঁশীতে বশ কর্‌লে বিশ্ব হেলায় !
তোমার গানের পেতে সুধার কণা
এল বনের হরিণ ধেয়ে, সাপ নোয়াল ফণা।

*

দূর-গমনে নিকট করে তোমার গানের আলো,
ভালোবেসে যে দীপ তুমি জ্বালো—
অচেনারে চিনিয়ে সে ত্যায়, পরকে আপন করে,
তোমার হিয়ার চিন্তা-মণি-ঘরে
বিশ্ব-মানব জল্‌সা করে, ওঠে বিপুল হর্ষ-ব্যাকুল গীতি
দুখের মূল্যে আনন্দ-ক্রয় চল্‌ছে সেথা নিতি ;
ছন্দে নাচে জন্ম-মরণ, পতন-অভ্যুদয়,
মিলিয়ে হাতে হাত,
ছন্দ-ছাড়া নয় সেথা কেউ নয়।
মন্ত্রে পূত রাখীর সূতায় সেথা সবাই মিল্‌ছে সবার সাথ।

বিশ্ব-নরের জীবন-যজ্ঞে দীপ্ত ভালে তারার তিলক এঁকে
চক্ষুর পাত্র হাতে—
উঠ্‌লে তুমি, কবি!
সকল হানাহানির উর্দ্ধে থেকে, দৃষ্টি হানো নিশাচরের নৃশংস উৎপাতে
দিব্য পাবক ছবি!
তোমায় হেরে হাল্‌কা হ'ল চির-ব্যথার জগদ্দলন শিলা,
অন্তরায়ণ-অন্তরালে বন্দীমনের শিকল হ'ল ঢিলা।

*

অসুন্দরের শোধন তুমি, অসত্য আর অমঙ্গলের অরি
তোমায় বরণ করি।
আশার গানে আলোর বানে সকল দিলে ভরি'
প্রাণের প্রভায় সংশয়েরি ঘুচালে শর্ব্বরী!
নূতন আলো দিলে নূতন আঁখি,
উর্দ্ধ-শিকড় অধঃশাখা অশথ্‌-চারী পাখী!
মুগ্ধ হৃদয়—হারাই ভাষা—মূর্চ্ছি' পড়ে মন—
বনের পুলক ফুল দিয়ে তাই মনের পুলক কর্‌ছি নিবেদন
প্রণাম তোমায় কর্‌ছি অনুপ কবি!
যার হৃদয়ের মুকুর-আগে বিশ্বপতি ছাখেন্‌ বিশ্বছবি
নিত্যদিনই নূতন রূপে নূতনতর ছাঁদে
চিত্তলোকে পুলক যে ছায়—
নূতন আলোক পৌর্ণমাসী চাঁদে।

২৫শে বৈশাখ
১৩২৫

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৬

৪ জুন ১৯১৯

শ্রীচরণেষু—

আজ নীরবে যাব প্রণাম ক'রে
একটু শুধু নিয়ে পায়ের ধূলো,
সঁপে মোদের প্রাণের অর্ঘ্য, কবি,
বল্‌ব নাকো বাক্য কতকগুলো!
বাক্য যে আজ শুধুই জ্বালার মালা,
হৃদয় সে যে রুদ্ধ ব্যথার ডালি,
মৌন মুখে তাই তোমারে দেখি
তিরিশ কোটির নয়ন দিয়ে খালি।
শঙ্কামূঢ় স্বদেশবাসীর পাশে
দেখি তোমায় আত্ম-বোধের ঋষি,
অভিচারের মন্ত্রে যখন ঘোলা
আকাশ জুড়ে নামে অকাল নিশি;—
জগৎ যখন নিচ্ছে বিভাগ ক'রে
মারণ এবং উচ্চাটনে মিলে,
সে সঙ্কটে সত্য-অনুরাগী!
আত্মপ্রদ মন্ত্র তুমি দিলে।
আত্মনিষ্ঠ মানুষ স্বয়ম্প্রভু,
মন ব'লে তার একটা মহাল আছে,—
ভয়ঙ্করের ভোজবাজীতে কভু
খাজ্‌না আদায় হয়নাকো তার কাছে।
সেই মহালের খবর তুমি দিলে,
সূর্য্য জাগে তোমার তূর্য্যরবে
মানুষ ব'লেই প্রাপ্য যে মর্য্যাদা

সে মর্য্যাদা পেতে হবেই হবে।
সত্যকথা সত্য যুগের কথা ;
কলি যুগে চার দিকে তার ঘাঁটি,
কলির মানুষ— আমরা— ভাবি মনে
কামান যা' কয় সেই কথাটাই খাঁটি।
গোলন্দাজের গোলা যে বোল্ বলে
সেই বুলিটাই বুঝি চরম বলা,
আজ দিয়েছ তুমি সে ভুল ভেঙে
তিরিশ কোটির ঘুচিয়ে মনের মলা।
অপ্রমত্ত তোমার সরস্বতী
ভূভারতে দান করে আজ ভাষা,
সঞ্চারে বল আত্মাতে আত্মাতে,
বাক্যে মনে সত্য হবার আশা।
সাঁচার আদর জাগছে তোমায় হেরে
মিথ্যাচারের মহাজনীর হাটে,
কুণ্ঠিত দীন মনের উপর থেকে
ভ্রূকুটিময় মেঘলা বুঝি কাটে।
জীবন যাদের অসম্মানের বোঝা,
তলিয়ে যারা আছে অবজ্ঞাতে,
ইচ্ছা করার সহজ শক্তিটুকু
লুপ্ত যেন পঙ্গু পক্ষাঘাতে;—
তাদের তুমি মুখ রেখেছ, কবি,
হাল্কা ক'রে দিয়েছ ঢের লাজে,
সবার দুখের ভাগ নিয়ে স্বেচ্ছাতে
তক্‌মা ছেড়ে এসে সবার মাঝে।
সারা ভারত ঋদ্ধ তোমার ত্যাগে,

ঘুচল এবার টুটল মনের জরা,
তিরিশ কোটির প্রাণের স্পন্দ, কবি,
তোমার প্রাণের ছন্দে প'ল ধরা।

২১শে জ্যৈষ্ঠ
১৩২৬

প্রণত
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২২ ডিসেম্বর ১৯১৮

৭ই পৌষ
১৩২৫

শ্রীচরণেষু—

যেদিন জ্যোতির দীক্ষা
পেলেন পরম পুণ্যবান্
অন্তরের পদ্মদলে
আনন্দের পেলেন সন্ধান
সে অমৃত-সিক্ত দিনে
হে কবি! হে বিশ্বের আহ্লাদ!
পুণ্যহীন যাচে তব
পদধূলি আর আশীর্ব্বাদ।

প্রণত
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি-প্রশস্তি

(ঋষি কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত)

বাজাও তুমি সোনার বীণা, হে কবি! নব বঙ্গে;
মাতাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি রঙ্গে!
তোমার গানে তোমার সুরে
উঠিছে ধ্বনি বঙ্গ জুড়ে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠিছে তব সঙ্গে।

কমলে তুমি জাগালে প্রাতে, নিশীথে নিশিগন্ধা,
পূর্ণা তিথি মিলালে আনি' রিক্তা সাথে নন্দা!
যে ফুল ফুটে স্বর্গ-বায়ে
আহরি' দিলে প্রিয়ের পায়ে,
মিলালে আনি' অনাদি বাণী নবীন মধুচ্ছন্দা!

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার কর গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী! তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব।

জীবন ব্রতে পঞ্চাশতে পড়িল তব অঙ্ক,
বঙ্গ-গৃহ জুড়িয়া আজি ধ্বনিছে শুভ শঙ্খ।
পান্থ! এসে পুষ্প-রথে
পৌঁছিলে হে অর্দ্ধ পথে,—
সারথি তব শুভ্র-শুচি কীর্ত্তি অকলঙ্ক।

অর্দ্ধশত শরতে সোনা ঢেলেছ তুমি নিত্য,
অর্দ্ধশত মিলিলে হেন তবে সে পূরে চিত্ত ;
সোনার তরী দিয়েছ ভরি'
তবুও আশা অনেক করি ;—
ভরিয়া ঝুলি ভিখারী সম ফিরিয়া চাহি বিত্ত।

চাতক ! তুমি কত না মেঘে মেখেছ বারি-বিন্দু,
কত না ধারে ভরিয়া তুমি তুলেছ চিত-সিন্ধু !
মরাল ! তুমি মানস-সরে
ফিরেছ কত হরষ-ভরে !
চকোর ! তুমি এসেছ ছুঁয়ে গগন-ভালে ইন্দু।

বঙ্গ-বাণী-কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভ লগ্ন,
বাজালে বেণু মোহন তানে পরাণ হ'ল মগ্ন !
বিষাণ যবে বাজালে, মরি,
গলিয়া শিলা পড়িল ঝরি'
মিশিল স্রোতে বদ্ধ ধারা, পাষাণ-কারা ভগ্ন।

গভীর তব প্রাণের প্রীতি, বিপুল তব যত্ন,
দিশারি ! তুমি দেখাও দিশা, ডুবারি ! তোলো রত্ন !
যে তানে টলে শেষের ফণা
পেয়েছ তুমি তাহারি কণা ;
অমৃত এনে দিয়েছে শুনে,— নহে সে নহে প্রত্ন।

অমৃত এনে দিয়েছে প্রাণে পরাণ-শোষী দুঃখ,
গৌণ যাহা না গণি' তাহে চিনিয়া নিলে মুখ্য ;

শোকের রাতে রহিলে ধ'রে,
হিরণ্ময় মৃণাল-ডোরে
রুদ্রে নিলে বরণ ক'রে রসায়ে নিলে রুক্ষ।

রেখেছ তুমি দৈবী শিখা হৃদয়ে চির-দীপ্ত,
অবিশ্বাসে হতাশ্বাসে জগত যবে ক্ষিপ্ত;
মত্ততারে করেছ ঘৃণা,
চাহ না তবু মুক্তি বিনা;
উজল মনোমুকুর তব হয় নি মসীলিপ্ত।

বাজাও কবি! অলোক-বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয়-শতদল সে তুমি ফুটাও সুধা গন্ধে;
সে ভাবই ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলি আছে;
তোমার নামে মেতেছে দেশ, মিলেছে মহানন্দে।

মলিন মেঘে বিজলি সম উজলি' আছ বঙ্গ!
মাতাও কভু কাঁদাও তুমি হাসাও করি' রঙ্গ!
সূর্য্য সম উজলি' ভূমি
সপ্ত ঘোড়া ছুটাও তুমি,
তৃপ্ত হ'ল হৃদয়-প্রাণ লভিয়া তব সঙ্গ।

বরণ

তোমারে বরি হে কবিসম্রাট

কবিসূয় মহাযজ্ঞে কবি!

বঙ্গবাণীর হে বরপুত্র!

প্রতিভা-প্রতিমা অরূপ রবি!

কবি হোতা কবি উদ্গাতা হেথা

মিলিয়াছে কবি-কুঞ্জ-ধামে;

যজ্ঞ-নিপুণ বুধমণ্ডলী

আজি একত্র তোমার নামে।

বঙ্গদেশের ইঙ্গিতে মোরা

হে কবি! তোমায় বরি হে আজি—

বঙ্গের ফুলে মাল্য রচিয়া

বঙ্গের ফুলে ভরিয়া সাজি।

অযুত আঁখির উজল আলোকে

হে কবি! তোমায় আরতি করি,

অযুত হিয়ার শুভ-কামনার

শুভ্র-শোভন চাঁদোয়া ধরি।

গান গেয়ে তুমি গানের রাজারে

গঙ্গারে পূজি গঙ্গাজলে;

পঞ্চাশতের পান্থশালায়

সাজাই তোমারে পুষ্পদলে।

বঙ্গের কবি-মনীষীরা আজি

ব্যাপৃত নূতন সবন-কাজে,

কবি-নৃপমণি! তব আগমনী

ধ্বনিছে লক্ষ হৃদয় মাঝে!

অর্ঘ্য

কবি-সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্যাদিগের পক্ষ হইতে প্রদত্ত)

পাই নাই খুঁজে নেতের পাছুড়ি,
'বিশ আড়া ধান' আনি নি, কবি !
এনেছি কেবল হৃদয়ের প্রীতি
বিকচ কমল কোমল-ছবি।
পরগণা লিখে সঁপিতে কবিকে
কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গে নাহি ;
আঁখিজলে শুধু করি' অভিষেক
দর্ভ-আসনে বসাতে চাহি।
জীবনের বহু শূন্য প্রহর
ভরিয়া তুলেছ বীণার তানে,
অন্ধ যামিনী হেসেছে পুলকে,—
যে হাসি হাসিতে অন্ধ জানে।
তোমার যোগ্য কি দিব অর্ঘ্য ?—
কোথা পাব মোরা ?— ভাবি গো তাই !
জনক রাজার মত কোথা পাব
হিরণ-শৃঙ্গ হাজার গাই ?
ব্রহ্মে যখন আছ নিমগন
কাব্য-লোকের লোচন রবি !
স্বর্গে বসিয়া আশিসিছে তোমা
ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী।
শ্রদ্ধার স্রক্ চন্দন আর
অনুরাগ-ধারা এনেছি মোরা,
—তোমার যোগ্য নাহিক' অর্ঘ্য,—
তবু লও প্রীতি-রাখীর ডোরা।

গান

কীর্ত্তি-গগন-সূর্য্য হে !
বঙ্গ-ভুবন-পূজ্য হে !
প্রতিভা তোমার
করিল প্রচার
আঁধারে যা' ছিল উহ্য, হে !
পূজ্য হে !

যা' ছিল অজানা তুচ্ছ, হে !
কর কটাক্ষে উচ্চ সে ;
জগতের কবি—
সভামাঝে রবি !
বাজাও বঙ্গ-তূর্য্য হে
পূজ্য হে !

দিগ্বিজয়ী

দেশে আসে দিগ্বিজয়ী— দিগ্বিজয়ী কবি,
জয়োদ্ধত পশ্চিমের জয়মাল্য লভি ।
দেশে দেশে দিগ্বিজয়ী— কত কথা জাগে আজি মনে,
রঘুর বিজয়-যাত্রা ফুটে ওঠে কল্পনা-নয়নে,
শত্রুর প্রাসাদ-শীর্ষে রোপিয়া অশথ
হূন পারসীকে দলি' চলে মহারথ;

তবু সে রাজার দিগ্বিজয়
সেই জয় বাহুবলে হয়।
চিত্তে জাগে আরেক বারতা
শঙ্করের দিগ্বিজয়-কথা,
তপ্ত তৈলে কটাহ ভরিয়া
তর্ক যুদ্ধে বেলাস্ত ধরিয়া
পণ্ডিতের সেই দিগ্বিজয়
বুদ্ধিবলে সম্ভব সে হয় ;—
দায়ে ঠেকি' বড় বলে পরাস্ত যে জন
সে কথায় সায় নাহি দেয় প্রাণমন।
কবি রবি কবি শুধু— রঘু নয়, শঙ্কর সে নহে,
তবুও সে দিগ্বিজয়ী, বিশ্ব-কবি ছত্র তার বহে—
মুগ্ধ মনে, আনন্দে স্পন্দিয়া তোলে বিশ্বের পরাণ
বঙ্গ-রবি,— অস্তভূমি পশ্চিমের স্পর্শে সে অম্লান।

আভ্যুদয়িক

(রবীন্দ্রনাথের "নোবেল প্রাইজ" পাওয়াতে)

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্ত সাগর মিলল আসি'।
কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি— কোথায় শুভ্র তুষার-পুরী,
কি মন্তরে মিল্‌ল তবু অন্তরে কে টান্‌ল ডুরি!
কোলাকুলি কালায় গোরায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,
রাজার পূজা আপন রাজ্যে, কবির পূজা সব দেশে।

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্ম ফোটে,
পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্ত্তা ছোটে,
জন্ম যাহার শান্ত জলে সুপ্ত লহর স্নিগ্ধ বাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে ;
তুষারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,
রঙীন ক'রে প্রাণের রঙে অরুণ-রাণী অরোরায়।

'রাজার পূজা আপন দেশে কবির পূজা বিশ্বময়'—
চাণক্যের এই বাক্য প্রাচীন মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয়।
পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গসাগর থেকে,
গল্‌ল এবার কঠোর তুষার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে ;
বাতাসে আজ রোল উঠেছে "নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে।"
সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিন্ধু-ঘোটক হাঁকে !

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা' নিপ্পনিয়া,—
বাংলা আজি তাই করিল !— হিয়ায় ধরি' কোন্ অমিয়া !
মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে,—
মর্চ্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে।
তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে— উদ্বোধিত নূতন দিন,
ভুজঙ্গ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীর্য্যহীন।

জাদুর মুলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,
তাহার ক্ষুধা সুধার লাগি', সুধার লাগি' তার পিপাসা।
পূর্ব্বাকাশে গান গাহে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,
আজকে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে প্রহর গণি ;
অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তরে গো
অন্তরীক্ষে সদ্যোজাত নূতন তারা সন্তরে গো !

বাংলা দেশের মুখ পানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,
বঙ্গে ঝরে পরীর হাতের পুণ্য-পারিজাতের কলি !
"বঙ্গভূমি ! রম্য তুমি" বলছে হোরা, শোন্ গো তোরা,
"ধন্য তুমি বঙ্গকবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা ;
বিশ্বে তুমি বক্ষে বাঁধ, শক্তি তোমার অল্প নয়,
ধ্রুবতারার পিয়াসী গো, শুভ তোমার অভ্যুদয় ।"

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মুলুক থেকে ;
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী
সোনার বরণ ঝর্ণা ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ-ঝুরি ;
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,
পুষ্ট তোমার সুকৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু ।

ধন্য কবি ! কাব্য-লোকের ছত্রপতি ! ধন্য তুমি,
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি ।
বঙ্গভূমি ধন্য হ'ল তোমায় ধরি' অঙ্কে কবি !
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি !
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব-কবি সভায় ওগো ! বাজাও বীণা হাজার-তারা ।

রবীন্দ্র-মঙ্গল

গান

সাত সাগরের ঢেউয়ের মেলায় খুশীর কোলাহল !
(আমরা) জয়ধ্বনি কর্‌ব কি, বল্, চোখের কূলে জল !
দিগ্বিজয়ী ফির্‌ল ঘরে
হেম-অরোরার মাল্য প'রে,
মাথায় দধি-পাত্র করে বরণ হিমাচল !
নিমেষ-হারা থির-দামিনী
পূজ্‌ল ওরে দিন-যামিনী
অরুণ-রাণী আপন খোঁপার সঁপ্‌ল চাঁপার দল !
'নৈশ-ভানু'— অবাক্ ছবি—
তারেও অবাক্ কর্‌লে কবি
নুইয়ে শাখা পাইয়ে দিলে কল্পতরুর ফল !
ধ্রুব-তারার তিলক ভালে
অমর-তিলক কে পরালে,
(আজ) কাঙাল-দেশের মন্-মাণিকে ভুবন সমুজ্জ্বল !
প্রাণের পরাগ ছন্দে ঢেলে
বিশ্ব-কবিচ্ছত্র পেলে,
আমরা ওরে কি দেব, বল্, কি আছে সম্বল !
স্বদেশ, কবির বালাই নিয়ে.
ষাট বছরের 'ষাট' বানিয়ে
পথের ধুলায় স্নেহের আসন পেতেছে আঁচল !

নমস্কার

নমস্কার! করি নমস্কার
কবিতা-কমল-কুঞ্জ উল্লসিত আবির্ভাবে যার,—
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,—
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী রহে তরঙ্গিতে,—
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত্য হ'ল স্ফূর্ত্তি পারাবার,—
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

স্ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,—
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে;
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধা পান;
তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,—
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার
বেণু-বীণা জিনি মিঠা বাণী যার খনি সুষমার
চিত্ত-প্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অভিচার-নিশি,
আবেদনে-আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,

শোণিত নিষেক-শূন্য নৈষ্ক্র্যের নিত্য-পক্ষপাতী
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত-হার—
নমস্কার! করি নমস্কার!

রুদ্ধকণ্ঠ পঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী-অমারাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অত্যাচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল হে ধিক্কার,—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য-ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা!"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত পারা,—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র,— ত্যাখে নিজ রক্তের ফোয়ারা,—
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার আগে শান্তিবারি-ধার,—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশ দিক,—
বিশ্বকবিচ্ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,—
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,— বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,—
নিত্য-তারুণ্যের টীকা ভালে যার চিত্ত-চমৎকার
নমস্কার! তারে নমস্কার!

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার
নিশীথে মশাল জ্বেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতার
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
দ্বন্দ্ব ভুলি' 'হূন্' 'গল্' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার! তারে নমস্কার!

নয়নে শান্তির কান্তি হাস্যে যার স্বর্গের মন্দার
পক্ককেশে যে লভিল বরমাল্য রম্য অরোরার;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য-সহচর
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্তি স্বদেশ-আত্মার"—
বারম্বার! তারে নমস্কার!

চারি মহাদেশ যার ভক্ত,— করে ভক্তিনিবেদন;
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন;
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব-সাধনার,—
নমস্কার! নমস্কার! বারম্বার তারে নমস্কার।

শ্রদ্ধা-হোম

(কবিগুরু-প্রশস্তি ! গৌড়ী গায়ত্রী ছন্দ)

জয় কবি ! জয় জগৎ প্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয় !
অগম শ্রুতির শ্রোত্রিয় ! জয় ! জয় !
প্রাণ প্রণবের দ্রষ্টা নব ।
গান সে অসপত্ন তব,—
অমৃত-সমুদ্ভব ! জয় ! জয় !

যুবন্ প্রাণের গাও আরতি—
যে প্রাণ বনে বনস্পতি,
নবীন সবনের ব্রতী ! জয় ! জয় !
বাক্ তব বিশ্বস্তবা সে,—
নৃত্যে মাতায় বিশ্ব-রাসে—
চিত্তে দোলায় উল্লাসে ! জয় ! জয় !

পাবনী বাগ্‌দেবীর কবি
পাবীরবীর গায়ন রবি !
পুণ্য পাবকচ্ছবি ! জয় ! জয় !
জয় কবি ! জয় হৃদয়-জেতা !
দিগ্বিজয়ীদিগের নেতা !
চিদ্-রসায়ন প্রচেতা ! জয় ! জয় !

শ্রদ্ধা-হোমের লও আহুতি
মানস-হবি এই আকূতি ;
কবি ! সবিতা-দ্যুতি ! জয় ! জয় !

প্রাণের কাঙাল, মানের নহ,
মান ঠেলে পায় কুলির সহ
অসম্মানের ভাগ লহ! জয়! জয়!

তোমায় দেখে প্রাণ উথলে,
হাসি-উজল চোখের জলে,
অস্ফুট বোলে দেশ বলে—"জয়! জয়!"
তোমার সুব্রহ্মণ্য বাণী
তারার ফুলের মাল্যখানি
কণ্ঠে কবি স্থান্ আনি! জয়! জয়!

কবি-পূজা

কুবেরের রাজ্য ছাড়ি' উত্তরে যাদের বাড়ি
তোমারে পূজিল তারা স্বর্ণচম্পাদলে
বাল্মীকির সরস্বতী লভিলেন নব জ্যোতি
হে কবি। তোমার পুণ্যে পুনঃ পৃথ্বীতলে.
দুনিয়ার জ্ঞানীগুণী মুগ্ধ তব বীণা শুনি
আজি বিশ্বগুণী গণে গণনা তোমার
উজলিয়া মাতৃভূমি আজি উজলিছ তুমি
জগতের যতনের নব রত্নহার!
এ হার টুটিবে যবে এ কাল সে কাল হবে
লুকাবে জ্যোতিষ্ক বহু বিস্মৃতি-আঁধারে,
তুমি রবে অবিচল সূর্য্যকান্তি সমোজ্জল
অনন্ত কালের কণ্ঠে বৈজয়ন্তী-হারে,

বাণী তব বিশ্ব ছায়   কুবেরেরও পূজা পায়
পূজা পায় পুষ্পলাবী রতন কাঞ্চন,
তারি সঙ্গে অনুক্ষণ   মোরা করি নিবেদন
অনুরক্ত হৃদয়ের আরক্ত চন্দন।

কবি-জুবিলি

মিছিল্

প্রথম মুরৎ— স্বর্গদূত

উর্ব্বশী মোরে দিয়েছে পাঠায়ে
স্বর্গ-ভুবন হতে—
কবিরে পরাতে মন্দার-মালা
এসেছি মরাল-রথে!
জননী, জায়া, কি কন্যার মত
ভকতি কি স্নেহ, প্রেম
দেয় নি সে; দেছে স্মৃতির নিকষে
চির-উজ্জ্বল হেম!
জীবন-ভোরের সঞ্চয় সে যে
সে যে গো দিব্য দান,
ক্ষয় অপচয় হয় না তাহার
হয় না কখনো ম্লান।
অমরার সার মন্দার-হার
পর এ মর্ত্ত্যে বসি'
মর্ত্ত্যের কবি! এ মালা তোমারে
পাঠায়েছে উর্ব্বশী।

দ্বিতীয় মুরং— প্রকৃতি !

বরষায় বেণী এলাইয়া দাও,
শীতেরে কাঁদাও ফুলের ঘায়ে,
ভাসাও গো সাদা মেঘের ভেলাটি
শরতের সাথে গগন-গায়ে !
ফাল্গুনী ফুলে নামহারা কোন্
নায়িকার নাম দেখ গো লেখা,
অতীতের পুরে পশি হের কার
আঁচলে হংস-মিথুন আঁকা ;
পুষ্পের সাথে পুলকিয়া ওঠ,
ঝঞ্ঝার সাথে দাও গো দোলা ;
কিবা সে অতীত কিবা অনাগত
তব তরে সব দুয়ার খোলা !
দীপ্ত-লোচন লুপ্ত-বচন
তাপস গ্রীষ্ম ভীষণ-ছবি,
তাহারেও কথা কহাও গো তুমি,
ভাষা দাও তুমি তারেও, কবি !
অনাগত আর অতীতের মাঝে
বাঁধিয়া তুলিছ মানসী সেতু,
অচেত-চেতনে মিলায়ে যতনে
উড়ায়ে দাও হে বিজয়-কেতু !
বায়ু বহে' যায় ধীরে অতি ধীরে
কানে কহে' যায় তোমারি শুধু,
ওগো গগনের চির-আত্মীয়
ওগো জগতের পুরাণো বঁধু !
মৌন মাটিরে বাস তুমি ভালো—

মূক বলে' তারে কর না ঘৃণা ;
মুগ্ধ প্রকৃতি হৃদয়ের প্রীতি
নিবেদিছে তাই বচন-হীনা।

তৃতীয় মুরৎ— বালক

বাজিয়েছিলাম পাতার বাঁশী
রথের মেলায় গিয়ে,
আপনি নাকি তাই লিখেছেন
ছাপার হরফ দিয়ে ?
আমার ভেঁপুর আওয়াজ, সে কি
সব্বের উপর ওঠে ?
সোর্‌গোল আর খোল করতাল
ছাপিয়ে উধাও ছোটে ?
সব চেয়ে কম বেশী আমায়
জানে হাবুল টেঁপু ;
আপনি নাকি বাঁশী বাজান ?
আমিও বাজাই,— ভেঁ—পু !

চতুর্থ মুরৎ— বঙ্গের 'হাসি' 'তাতা'

বরষে বরষে সারা দেশ জুড়ি'
বলির রক্ত ছোটে,
সারা দেশ জুড়ি শিশুহিয়াগুলি
শিহরি শিহরি ওঠে !
দেবতা দেখিতে দেখে বিভীষিকা,
ঘুমাতে পারে না রাতে,
স্বপনে গড়ায় রক্তের ধারা,

মোছে তারা দুই হাতে!
সঙ্কোচে সারা প্রাণ ভরে' ওঠে,
ঘোচে না রক্তরাশি,
নিষ্ঠুর খেলা খেলে প্রবীণেরা,
শিশুর শুকায় হাসি,
ওগো কবি! ওগো তরুণ-হৃদয়,
করুণ তোমার গাথা—
করিছে স্মরণ অশ্রুনয়ন
বঙ্গের 'হাসি' 'তাতা'।

পঞ্চম স্বরৎ— ভিখারিণী মেয়ে

ছুটে এসেছিনু মা-হারা বালিকা
মায়ের মায়ার লোভে
পূজা-বাড়ী নাকি মা এসেছে, শুনি
ভরা ঘট দ্বারে শোভে!
অচল প্রতিমা ফিরে চাহিল না,
কথা কহিল না কেহ;
ক্ষুণ্ণ ফিরিয়া চলেছি;— সহসা
তুমি ডেকে দিলে স্নেহ;
যাহা দিলে, ওগো! ভিক্ষা সে নয়,
সে নহে অনুগ্রহ,
মমতায় করে' নিলে আপনার
আমারে,— ম্লানিমা সহ।
দেবতার মত ভালবাস তুমি
নাহিক তোমার তুলা,
সকলের সাথে তোমারে নমি হে
ভিখারী— পথের ধুলা।

ষষ্ঠ স্মরৎ— বঙ্গবধূ

বালিকা বয়সে মার কোল ছাড়ি
পর-বাসে বাঁধে যে জন গেহ,
পরথ যাহারে করে গো সবাই,
শাসন করে গো, করে না স্নেহ।
আগমনী শুনি ভিখারিণী-মুখে
মন ছুটে যায় বাপের ঘরে,
কুণ্ঠিত সেই বঙ্গের বধূ
হে কবি! তোমারে প্রণাম করে।
মূক বেদনারে ভাষা দেছ তুমি,
হাল্‌কা করেছ মনের ব্যথা,
মনে মনে তাই নিবেদি' চরণে
মালা এ অশ্রু-সলিলে গাঁথা।

সপ্তম স্মরৎ— উপেক্ষিত

মরিয়া যে শুধু দিতে জানে, হায়,
জীবনের পরিচয়,—
চোর নয় তবু চুরি যে করেছে
ভুলিয়া লজ্জা ভয়,—
'আপদ' বলিয়া দূর হ'তে যারে
লোকে করে বর্জ্জন,—
ভালবেসে কবি তাদেরো ফুটালে!
করি তোমা বন্দন!

অষ্টম স্মরৎ— ভৃত্য

চুরি অপবাদ ভূষণ যাহার
ত্রুটি অপরাধ নিত্য,

ঘোর নির্ব্বোধ, দেখিলেই যারে
রাগে জ্বলে' যায় পিত্ত,
উম্‌শেই বল, কেষ্টাই বল,
যা খুসী বলিয়া ডাক,
উত্তর দিবে, হইবে হাজির,
মোটে সে চটিবেনাক,
পোষা জন্তুর মত পোষ-মানা
সদা প্রফুল্ল-চিত্ত,
দেউড়িতে এসে গড় করে আজ
সেই পুরাতন ভৃত্য !
হইতে পারে সে ক্ষেত্রবিশেষে
মোহন কি শঙ্কর—
অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে ; তবু
নিরেট ভয়ঙ্কর ।

নবম মুরৎ— খুড়া মহাশয়

দু'কুড়ি ও দশ ?— তোমার বয়স ?
তুমি আরো ঢের বুড়া !
তোমার অনেক পরে জন্মেছে
চক্রবর্ত্তী খুড়া ।
তারি গোঁফ চুল ভুরু পেকে গেল,
টাকে মুড়াইল চূড়া ;
দু'কুড়ি ও দশ ? মোটে ? ভুল ! তুমি
ব্রহ্মার চেয়ে বুড়া ।

দশম মূরৎ— বৃদ্ধ

রায় বসন্ত দিয়েছে পাঠায়ে
এই অনন্ত বুড়ারে হেথা,
সেই মানুষটি দেখিতে এসেছি
ফাঁস করে যেই বুড়ার কথা !
শাদা মন আর শাদা মাথা নিয়ে
এসেছি অনেক দিনের পরে,
শুনে মধুবাণী দেখে হাসিখানি
ফিরে চলে' যাব দেশান্তরে !
আল্‌বোলা আর তব্‌লা সিতার
পাল্কীতে হোথা এসেছি রেখে
হেসে হেসে আর বাঁচিনে রে ভাই
বুড়োর নকল নাকাল দেখে।
(আমুদে বুড়ার নকল দেখে !)

একাদশ মূরৎ— গৌরাঙ্গভজা

জনম অবধি মোরে
গালি দেওয়া !
লাঞ্ছিত লজ্জিত করা খালি !
বিদ্রোহী করিয়া তোলা ?
আমার সে
ভগ্নীপতি-ব্রতা যত শালী,
না হয় গৌরাঙ্গে মজি
ভজি তারে ;
অভদ্র বিদ্রূপ তাই বলি' ?

জোন্স-স্মিথ-টম্‌সন
নামাঙ্কিত
উপহার দেওয়া নামাবলী ?
সিঁদুর মাথায়ে বুটে
হায় হায় !
মাথা হেঁট— অপমান করা ?
হায়রান শুধু শুধু
পাঠাইয়া
হাকিমের মিথ্যা হর্‌করা !
কংগ্রেসে দিলাম চাঁদা
তবু মিছে
ছল ধরা ? গেছি আমি চটে,
তোমাদের হুজুগেতে
আমি— আমি—
আমি যোগ দিবনাক মোটে !

দ্বাদশ মুরং— অপরূপ-রূপা বাংলা

বাংলাদেশের হৃদয়ের মাঝে
যে জন বিরাজ করে
ডান হাতে যাঁর খড়্গ জ্বলিছে
বাঁ হাত শঙ্কা হরে,
ললাট-নেত্রে বহ্নি যাঁহার
স্নেহ-বিভা দু'নয়নে,
হে কবি ! তোমারে দেছেন প্রসাদ
তিনি প্রসন্ন-মনে।

দেউলের দ্বার খুলেছে তাঁহার
মিলেছে মিলেছে দিশা।
তাঁর ইঙ্গিতে, সঙ্গীতে তব
হে কবি! পোহায় নিশা।

ত্রয়োদশ মুরৎ— বিশ্বযোগী— ভারত-মহিমা

বিতরিলে ব্রহ্মবিদ্যা, মিশাইলে সীমায় অসীমে!
রচিলে ভাবের সেতু যুক্ত করি পূরবে পশ্চিমে!
সমীপে আনিলে স্বর্গ, স্বদেশেরে জানিলে সুন্দর
স্বর্গ হ'তে গরীয়ান!— মূর্ত্ত যেন দেবতার বর!
প্রতিষ্ঠা করিলে প্রাণে ভারতের প্রাচীন সাধনা,
বহুর মাঝারে এক,— জগতের চির-আরাধনা,
সপ্তর্ষির পুণ্য-জ্যোতি সমর্পিলে বাঙালীর ভালে,
সত্যের নিষ্কাম ভায় লুপ্ত করি' দিলে দেশ-কালে!
বিশ্ব-যোগে মুক্ত হ'লে— বিশ্বনাথ প্রেরিল বারতা!
জগতে ঘোষিত হ'ল বিশ্বমানবের আত্মীয়তা!
"জ্যোতিষ্ক কুটুম্ব" যত হেরি তোমা' আনন্দিত-মন
নক্ষত্র অক্ষরে[১] লিখি পাঠাইল তোমারে লিখন!
কর্ম-ক্লিষ্ট কোলাহল মন্ত্রে যেন শূন্যে গেল মিশি;
মহাশান্তি এল নামি'[২] তব পুণ্যে, হে কবি! হে ঋষি

পাঠান্তর : ১ নক্ষত্র অক্ষরে— জ্যোতির অক্ষরে।
২ মহাশান্তি এল নামি— দিব্যশান্তি এল মর্ত্ত্যে।

চতুর্দশ মুরৎ— কাবুলিওয়ালা

প্রকাণ্ড এই চেহারাটায়
প্রকাণ্ড যে হৃদয় আছে,
বাংলাদেশের ওগো কবি!
গোপন সে নেই তোমার কাছে!
ভুষো মাথা পাঞ্জাখানি
ছাপা ছিল পাঁজর পরে,
কারেও তো সে দেখাইনিক,
দেখ্‌লে তুমি কেমন করে'?
বাংলা মুলুক যাদুর মুলুক
তুমি যাদুগিরের রাজা,
তোমার তরে বাবুসাহেব!
এনেছি এই আঙুর তাজা।

পঞ্চদশ মুরৎ— সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী

জীবন তিক্ত হ'য়ে উঠেছিল
সার্কাস করি শূন্যে;
পুরাণো গরিমা ফিরিয়া পেয়েছি
হে কবি! তোমারি পুণ্যে।
পুরাণো গরিমা সহজ মহিমা
প্রাণের রং-মহালে,
সার্থক ফিরে হ'ল এ জীবন
প্রাণের গভীর তালে।
সুরে ও কথায় মিলিয়া লতায়
নির্ঝরে রবিরশ্মি!

পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত শুধু
করিতেছে "হা হতোঽস্মি" !
পরাণের মাঝে জনম লভিয়া
সহজে পরাণে পশি,
আজিকে আবার চলনে আমার
শত চাঁদ পড়ে খসি'।

ষোড়শ মুরৎ— দাসী

রাণী নই, তবু রাজার প্রসাদ
মাথায় ধরেছি আমি,
সৌরভে তাঁর ভরি' আছে মম
জীবনের দিনযামী ;
আঁধারে শুনি সে চরণের ধ্বনি,
আঁধারে একেলা হাসি,
বাসক-সজ্জা করি আমি তাঁর
আঁধার ঘরের দাসী।

বন্দনা

কীর্ত্তি-গগন-সূর্য্য হে !
বঙ্গ-ভুবনে পূজ্য হে !
প্রতিভা তোমার
করিল প্রচার
আঁধারে যা ছিল উহ্য হে !
পূজ্য হে !
যা ছিল অজানা তুচ্ছ হে,
কর কটাক্ষে উচ্চ হে,

জগতের কবি-
সভা-মাঝে কবি,
বাজাও বঙ্গ-তূর্য্য হে!
পূজ্য হে!

জুবিলি

রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হ'তে পারবে সে,—
রাজার পূজা আপন রাজ্যে
কবির পূজা সব দেশে!
চাণক্যের এই প্রাচীন বাক্য
লক্ষ কথার এক কথা,
রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হতে পারবে তা।
নজীর খুঁজে নাই যদি পাই
নাই তাতে ভাই দুঃখলেশ,
পর্ব্ব নূতন করবে সৃজন
রঙ্গভরা বঙ্গদেশ!
রাজার প্রভাব আপন রাজ্যে
কবির প্রভাব সব দেশে,
রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হতে পারবে সে।
বিধান দিলাম পাঁতি লিখে
সই করিলাম নিম্নে তার;
কবির সেরা বঙ্গরবি
জানাই তাঁরে নমস্কার!

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের পক্ষে সংস্থার ম্যানেজার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থপ্রকাশের চুক্তিপত্র ১৯০৯

Agreement between *Babu Rabindranath Tagore* of the one part, and CHARUCHANDRA BANDYOPADHYAY, B.A., Manager of the INDIAN PUBLISHING HOUSE, Calcutta on behalf of its Proprietor, of the other part, dated *21st. June 1909.*

This agreement witnesseth that I, *Rabindranath Tagore* do hereby convey and assign to the INDIAN PUBLISHING HOUSE, Calcutta, for the space of five years the sole right of printing and publishing my works entitled *Bichitra Prabandha, Prachin Sahitya, Lok Sahitya, Adhunik Sahitya. Sahitya, Hasya Koutuk, Byanga Koutuk, Prajapatir Nirbandha, Prahasan, Raja Praja, Samuha, Swadesh, Samaj, Siksha, Sabdatatwa. Dharma, Galpaguchchha* (complete), *Rajarshi. Bou Thakuranir Hat, Chokher Bali, Nouka Dubi, Gora, Saradotsab, Mukut* and *Santi-niketan,* from the date of their publications, provided the INDIAN PUBLISHING HOUSE undertake to defray all the expenses for printing and publication of the said books. Provided further that the INDIAN PUBLISHING HOUSE shall not only publish and store the books but shall also make arrangements for the sale of those books, shall submit to me in the months of January and July of each year an account of all sales effected during the preceding six months, and shall pay

me a royalty of *25* per cent. of the actual price of the books at which they are sold. Provided also that in the event of the INDIAN PUBLISHING HOUSE failing to comply with any or all of the abovementioned conditions in any particular, or failing to print and publish any of the books after the edition is exhausted in a respectable garb, at least in the same style in which its previous edition was printed and published, or failing to supply without any reasonable cause the public demand for any book within a reasonable period, say six months from the date of receipt of the complete revised copy for the new edition from me or my representative, I shall be at liberty to resume all the rights in the abovementioned books hereby conveyed and assigned and to debar any further sale of such books by the said INDIAN PUBLISHING HOUSE through its Manager or Proprietor or his heirs or assigns, and further that in the event of the INDIAN PUBLISHING HOUSE faithfully conforming to and fulfilling all the conditions above laid down during the whole of the prescribed period of five years, its Proprietor or Proprietors shall have a right to continue to publish the books on the same terms and conditions so long as the copyrights of the works remain vested in the author or his heirs, executors or assigns.

And that I, Charuchandra Bandyopadhyay, on behalf of the Proprietor of the INDIAN PUBLISHING HOUSE, Calcutta, do hereby undertake the printing, publication and sale of the abovementioned books on the conditions and under the provisos above

set forth at the cost and risk of the INDIAN PUBLISHING HOUSE, the said *B. Rabindranath Tagore* being in no way liable for any expense thereby incurred, and that I agree to pay to the said *B. Rabindranath Tagore*, his heirs, executors or assigns, a royalty on every copy of the book *sold* according to the scale above prescribed, namely, *25* per cent. of the actual price at which each copy *sold.*

Given under our hands and seals this *21st day of June* in the year *one thousand nine hundred* and *nine* of the Christian era.

Witnesses :

(1) [স্বাক্ষর] *Ajitkumar Chakravarty*

(2)

[স্বাক্ষর] *Rabindranath Tagore*

(1) [স্বাক্ষর] *Ajitkumar Chakravarty*

(2)

[স্বাক্ষর] *Charuchandra Bandyopadhyay*
Manager, Indian Publishing House, Calcutta.

পরিশিষ্ট ৩/২

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলকাতার স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থপ্রকাশের চুক্তিপত্র ১৯১৪

Judicial stamp paper
26 March 1914

Articles of Agreement made and entered this day of 1914 between Rabindranath Tagore, son of Maharsi Debendranath Tagore, residing at No. 6 Dwarkanath Tagore Street in the town of Calcutta, by caste Brahmin, landholder and author of various works in Bengalee (hereinafter called the *Author*) *of the one part* and Chintamoney Ghosh, son of Madhab Chandra Ghosh, residing at Allahabad in the United Provinces of Agra and Oudh, by caste Kayastha, trader and owner of the Indian Press in Allahabad and Proprietor of the Indian Publishing House Calcutta (hereinafter called the *Publisher*) *of the other part*; **whereas** by an Agreement dated 14th July 1908 and made between the Author of the one part and Charuchandra Bandopadhya on behalf of the Publisher of the other part, the author gave permission and the publisher undertook to publish and sell the "Poetical works" of the author upon the terms and subject to the conditions therein mentioned and whereas by another Agreement of the same date and between the same parties the author gave permission and the publisher undertook to publish and sell the works of the author entitled "complete

Prose works" in 16 parts "Little stories" and "Novels" including "Gora" under the term and subject to the condition therein mentioned and whereas by another Agreement dated the 21st June 1909 and made between the same parties the author gave permission and the publisher undertook to publish and sell the author's works entitled "Bichitra Prabandha," "Prachin Sahitya," "Loka Sahitya," "Adhunik Sahitya," "Sahitya," "Hasya Kautuk," "Byanga Kautuk," "Prajapatir Nirbandha," "Prahasan," "Raja Praja," "Samuha," "Swadesh," "Samaj," "Siksha," "Sabdatatwa," "Dharma," "Galpaguchchha" complete, "Rajarshi," "Bow Thakuranir Hat," "Chokher Bali," "Nowkadubi," "Gora," "Saradotsab," "Mukut," and "Santi Niketan" under the terms and subject to the conditions therein mentioned and whereas since the date of the last Agreement the author has produced various and other works, and whereas in supersession of the said three several Agreements the author and the publisher have agreed to enter into these presents for the publication and sale of the works mentioned in the schedule hereto annexed and marked A in the manner hereafter appearing. Now these presents witness and it is hereby mutually agreed by and between the parties hereto for themselves their and each of their heirs executors administrators representatives and assigns as follows :—

1. That the said three Agreements dated respectively the 14th July 1908, 14th July 1908 and 21st June 1909 shall stand cancelled as from

the 1st of April 1914.

2. That on the 30th day of April 1914 the Publisher shall submit to the Author a true and faithful account of the copies published by the Publisher of the various works included in the said three Agreements and showing the number of copies thereof which remained unsold on the 1st of April 1914.

3. That the sale of all works and publications the sales whereof were authorised by the said three several Agreements and which were published before the said 1st day of April 1914 but which remained unsold on the said date shall be subject to the provisions contained herein.

4. The Publisher shall at his own risk and expense produce and publish all and every works of the Author mentioned in the said schedule A and before such publication have the quality of the printing and paper of such work or works approved by the Author.

5. The Author guarantees to the Publisher that the said works mentioned in the said schedule A or any of them are or is in no way whatever a violation of any existing copyright and that it contains nothing of a libellous or scandalous character and that he will indemnify the Publisher from all suits, claims, proceedings, damages, and costs which may be made taken or incurred by or against him or them on the ground that the said works mentioned in the said schedule A or any of them are or is an infringement of copyright or contains anything libellous or scandalous.

6. The Publisher shall during the legal term of unrestricted copyright have the exclusive right of producing and publishing the works mentioned in the schedule A hereto. The Publisher shall have the general control of the publication and sale of the works mentioned in the said schedule A and the Author shall not during the continuance of this Agreement (without the consent of the Publisher) publish or permit to be published any abridgment of the works mentioned in the said schedule A or any of the books mentioned in schedule A. All rights of translation, of dramatization of all and every the said works shall remain the property of the Author.

7. The whole right title and interest in the manuscript and in the copyright of the works shall remain the property of the Author who hereby empowers the Publisher to take in his (the Author's) name but at his (Pubiisher's) expense any action legal or otherwise that he (the Publisher) may consider necessary to protect his (Publisher's) rights under this Agreement, and also at his (the Publisher's) own expense to carry out or abide by any order that shall or may be made by any Court or Courts in action or legal proceedings whatsoever and for the purposes aforesaid the Author hereby constitutes nominates appoints the Publisher so long as these presents shall remain in force, his true and lawful attorney to use his name and to sign his name in any documents papers or writings that may be necessary in the premises.

8. The Publisher shall not assign the benefit of

or delegate his obligations as Publisher under this agreement except that the whole agreement may be assigned to such person or persons as may succeed to him in his business as a Publisher.

9. The Publisher shall pay to the Author a Royalty of Rupees Twenty Five per cent of the advertised retail price on all copies of the said works sold by him during the term aforesaid.

10. The Publisher shall submit monthly a true and faithful account of the copies of the said several works published and sold by him during the month preceding and such account shall be settled and adjusted each month as aforesaid by cash payment provided that in case of failure to submit accounts during the said time, owing to any unforeseen cirumstances, the Publisher will have thirty days of grace for submission of the said account and payment to the author.

11. If the Publisher should at any time commit any act of Insolvency the Author may by notice in writing terminate this Agreement.

12. If the Publisher shall at the end of three years from the date hereof or at any time thereafter give notice to the Author that in his or their opinion the demand for the work or works mentioned in the said schedule A or any of them has ceased or if the Publisher shall for six months after the work or any of them is or are out of print decline or after due notice neglect to publish a new edition or if the quality of the printing and paper of the work or works is such as is not approved by the author then and in either such case this Agree-

ment so far as it relates to such particular work or works shall terminate and the right to print and publish such work or works shall revert to the Author who shall be entitled to purhcase from the publisher forthwith (if he or they insist and they are at his or their disposal) the stereotype or electrotype plates and the blocks or plates used for illustrations for such work or works aforesaid and whatever copies the Publisher may have on hand of the said work or works at the net cost of production and if the Author does not within three months purchase and pay for the said stereotype or eleetrotype plates blocks used for illustrations and copies the Publisher shall be entitled to and any time therefore to dispose of such stereotype or electrotype plates blocks or plates used for illrstrations and copies or melt the plates paying to the Author 10 per cent of the net proceeds of such sale.

13. The Author may require an Inspection of the Publisher's Account Books every six months after the account has been renderd and also on termination of the Agreement by any cause whatsoever hereinbefore mentioned. On the Author demanding in writing an Inspection the Publisher shall forthwith permit the Author or his agent nominated by him to examine all Books and Documents relating to the Publication and Sale of the Books the subject matter of this Agreement. In Witness whereof

Witnesses :—

[স্বাক্ষর]
C. F. Andrews, Bolpur.

[স্বাক্ষর]
A. P. Sen, Lucknow

[স্বাক্ষর]
Apurva Krishna Bose
Printer, Indian Press

[স্বাক্ষর]
Nayan Chandra Mukerjee
Artist, Indian Press

[স্বাক্ষর]
Rabindranath Tagore
(Author)

[স্বাক্ষর]
Chintamoney Ghosh
Proprietor, Indian Press
Allahabad

and

Indian Publishing House,
Calcutta

SCHEDULE A.

PROSE WORKS

1. Bichitra Prabandha.
2. Prachin Sahitya.
3. Adhunik Sahitya.
4. Loka Sàhitya.
5. Sahitya.
6. Hasya Kautuk.
7. Byanga Kautuk.
8. Prahasan.
9. Prajapatir Nirbandha.
10. Raja PraJa.
11. Samuha.
12. Swadesh.
13. Samaj.
14. Shiksha.
15. Shabdatatwa.
16. Dharma.
17. Santiniketan Part I
18. " " II
19. " " III
20. " " IV
21. " " V
22. " " VI
23. " " VII
24. " " VIII
25. " " IX
26. " " X
27. " " XI
28. " " XII
29. " " XIII

30. Gora Vol. I

31. „ „ II

32. Nauka Dubi.

33. Chokher Bali.

34. Rajarshi.

35. Bauthakuranir Hat

36. Galpa Guchchha part I

37. „ „ II

38. „ „ III

39. „ „ IV

40. „ „ V

41. Rajah.

42. Saradotsab.

43. Mukut.

44. Vidyasagar Charit.

POETICAL WORKS

45. Atti Galpa

46. Chariti Galpa

47. Achalayatan.

48. Sandhya Sangit.

49. Provat Sangit.

50. Bhanu Shingher Padabali.

51. Chabi o Gan.

52. Kari o Komal.

53. Balmiki Prativa.

54. Chitrangada.

55. Viday Avishap.

56. Prakritir Pratishodh.

57. Malini.

58. Mayar Khela.

59. Bisarjan.
60. Raja o Rani.
61. Sonar Tari.
62. Manashi.
63. Chitra.
64. Chaitali.
65. Kanika.
66. Kshanika.
67. Kalpana.
68. Katha.
69. Kahini.
70. Katha o Kahini.
71. Sankalpa o Swadesh.
72. Sishu.
73. Naivedya.
74. Kheya.
75. Smaran.
76. Utsarga.
77. Dharma Sangit.
78. Gan.
79. Gitalipi Part I
80. " " II
81. " " III
82. " " IV
83. " " V
84. Gitanjali.
*85. Gitimalya. R.T.
86. Chayanika Royal edition.
87. " Popular "

---

* তালিকায় : 45. 46. 47. আসলে পূর্ব ভাগের অন্তর্গত, 85. Gitanjali 2nd part মুদ্রিত ছিল, কেটে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ *Gitimalya* লিখে R.T. সই করে দেন।—সঃ

ক

চিন্তামণি ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২*

ওঁ

কলিকাতা

বিনয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটিকে যথাবিধি সর্ব্বসাধারণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমার সমস্ত বাংলা বইগুলির স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্বভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লইয়াছি। এক্ষণে এই অধিকারের হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আমার গ্রন্থপ্রকাশের কোনো একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইতে পারিলে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। আশা করি বিশ্বভারতীর মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনি যথোচিত বিধান করিয়া দিবেন। এই কাজের জন্য আমার ও বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিস আপনার নিকট যাইতেছেন। ইঁহাদের সহযোগে আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহাতেই আমি সম্পূর্ণ সম্মত হইব। ইতি ১ আশ্বিন ১৩২৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পঞ্চাশৎ বর্ষ-পরিক্রমা পুস্তকে বলা হয়েছে: 'সুখের বিষয় এই পত্র ব্যবহার করারও প্রয়োজন হয় নি। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় জানতে পেরে চিন্তামণিবাবু তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হন।' এই পত্র পাঠানো না হয়ে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের পাঠানো প্রতিনিধিদের মুখে হয়তো এই পত্রের অভিপ্রায় চিন্তামণিবাবু জানতে পেরেছিলেন, অথবা অপর কোনো হাতচিঠি পেয়েছিলেন।—স.

খ

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে গ্রন্থস্বত্ব দান করলে সেই সূত্রে ইণ্ডিয়ান প্রেস -মুদ্রিত মজুত বইয়ের হস্তান্তর শর্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিযুক্ত অ্যাটর্নি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

Allahabad
4th October, 1922

Babu Chintamoney Ghose

Dear Sir,

With reference to the agreement between yourself and Dr. Rabindranath Tagore dated the 2nd June 1914, regarding the publication of his prose and poetical works therein mentioned, the situation in regard thereto has now changed owing to the copyright of these works having been made over by Dr. Tagore to Viswabharati.

Dr. Tagore is deeply sensible of the amicable relations subsisting between him and yourself and the efficient manner in which the Indian Press has done its part and now that he himself will no longer be the controlling authority he feels it would be better for both parties if the publishing and selling rights of the books comprised in the agreement as well as of those since published by you be now made over by you to Viswabharati.

I understand that you are willing to do this on Viswabharati paying to you an amount equal to one-third of the published retail price of the stock at present in your hands which stock will thereupon also become the property of Viswabharati. I also

understand that on this letter being confirmed by Dr. Tagore you are prepared to send your son who is your constituted attorney to Calcutta for the purpose of making over the stock to an agent appointed by Viswabharati on an undertaking being given by Dr. Tagore that the payment of the said one-third of the retail price shall be made to you within 3 months of the date of the delivery of the said stock.

Yours faithfully
(Sd) *Surendranath Tagore*
Constituted Attorney
of
Dr. Rabindranath Tagore

গ

চিন্তামণি ঘোষের পক্ষে তাঁর পুত্র হরিকিশোর ঘোষের পত্র

৪ অক্টোবর ১৯২২

Allahabad
4th October, 1922

Mr. Surendra Nath Tagore
6 Dwarakanath Tagore's Lane
Calcutta.

Dear Sir,

With reference to your letter dated 4th inst. I, on behalf of my father B. Chintamoni Ghosh, have the pleasure to intimate you that he agrees to the terms referred to in your above letter regarding the handing over of the Right of Publishing and Selling of all Bengali works of Dr. Tagore hitherto published by the Indian Press Allahabad to the Visvabharati.

Yours faithfully
(Sd) *H. K. Ghosh*

VISVA-BHARATI

(THE SANTINIKETAN UNIVERSITY)

PRATISTHATA-ACHARYA
(Founder-President)
RABINDRANATH TAGORE

Regd. Office
SANTINIKETAN
BENGAL, INDIA

Sravasti, Colombo Oct. 20. 1922

Srijut Chintamoni Ghosh
Indian Press
Allahabad

Dear Sir,

With reference to the arrangement entered into between yourself, the Visva-Bharati, and my nephew Surendranath Tagore, acting on my behalf, I have pleasure in confirming the terms of my nephew's letter dated the 4th. October, 1922, that is to say as President of the Visva-Bharati I accept with thanks your offer to make over to the Visva-Bharati your publishing and selling rights in respect of my books comprised in our agreement dated the 2nd. of June, 1914 as well as of those since published by you in consideration of receiving an amount equal to one-third of the retail price of the stock at present in your hands (which stock will thereupon become the property of Visva-Bharati). I also personally undertake that on your son who is your constituted attorney giving delivery of the stock

to the appointed agent of Visva-Bharati, on a suitable date to be arranged between them after the re-opening, I shall guarantee for the payment to you of the aforesaid amount within three months from the date of such delivery.

I should like to add my personal appreciation of the efficient manner in which you and your press have always performed your part of the agreement and to make it clear that the sole reason why I suggested this arrangement was that the copyright of my Bengali books having been made over to Visva-Bharati our future relations will no longer be in my own personal control and would feel very sorry should anything happen in the future to impair our past relations. It is clearly understood that this new arrangement does not in any way affect your right of translating my Bengali books into Hindi and of publishing and selling such translations on the former terms.

Yours faithfully,
(Sd.) Rabindranath Tagore

ঔ

Ref. No. 6634
D.O

VISVA-BHARATI
P.O. SANTINIKETAN
BENGAL

Please quote Ref. Number when replying. All letters to be addressed to the Secretary only.

To
Babu Chintamoni Ghosh,
Indian Press
Allahabad

Dated, November 24, 1922.

Dear Sir,

I am sorry for the delay owing to my absence from here in answering your last letter with regard to the fixing of date for taking delivery of the Bengali books of my father in your stock. As I shall be in Calcutta at the end of this month as well as about the middle of the next month it will be equally convenient for me to take delivery of the stock either on the 30th of this month or on the 14th of December.

Kindly let me know to my address in Calcutta which of these dates would be convenient for you, and I shall arrange accordingly.

M.D./R.T.

Yours faithfully
(Sd.) R. N. Tagore

VISVA-BHARATI

(THE SANTINIKETAN UNIVERSITY)

6710
V.P. Mis

PRATISTHATA-ACHARYA
(Founder-President)
RABINDRANATH TAGORE

Regd: Office
SANTINIKETAN
BENGAL, INDIA

Santiniketan December 5, 1922

To

The Indian Press
Allahabad

Dear Sir,

In compliance with your letter No. nil of the 29th ultimo I shall make arrangement to take over the charge of the books of my father from 13th inst. I shall try to be present personally. In case of failure I shall appoint a responsible man to take delivery.

With reference to your enquiry as to who will be responsible for payment of your dues, I am to inform you on behalf of Visvabharati, that the authorities of the Visvabharati will certainly be responsible for payment, my father having conveyed the copyright of his books to the said Visvabharati. I have been carrying on this correspondence with you on behalf of Visvabharati as its Secretary.

Yours fathfully,
(Sd.) R. N. Tagore

পরিশিষ্ট ৪

কলকাতা 'ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস' পরিচালনের অংশীদারী সম্বন্ধে এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষ ও কলকাতা কান্তিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে ১ জানুয়ারি ১৯১০এর চুক্তিপত্র।

This indenture made this First day of January one thousand nine hundred and ten between Chintamoney Ghosh, son of Madhab Chandra Ghosh deceased, residing at 3 Pioneer Road in the town of Allahabad in the United Provinces of Agra and Oudh, by caste Kayastha, by occupation Proprietor of the Indian Press Allahabad, of the one part **and** Manilal Ganguly, son of Abinas Chandra Ganguly deceased, of No. 6 Dwarka Nath Tagore's Lane in the town of Calcutta, by caste Brahmin, by occupation Proprietor of the Kantik Press Calcutta, of other part **Whereas** the said Chintamoney Ghosh has for sometime past carried on the business of a publisher and bookseller under the style of The Indian Publishing House at No. 22 Cornwallis Street in Calcutta aforesaid **and whereas** the said Chintamoney Ghosh has agreed to admit the said Manilal Ganguly into partnership in the said business of a publisher and bookseller as from the 1st day of August 1909 for the term and upon the conditions hereinafter contained **and whereas** upon the treaty of the said partnership it was agreed that all books already printed or hereafter to be printed at the costs and with the capital of the

said Chintamoney Ghosh should be considered to belong exclusively to him and all books already printed or to be printed hereafter at the cost and with the capital of Manilal Ganguly should belong exclusively to the said Manilal Ganguly **Now this indenture witnesseth** as follows:—

1. The said Chintamoney Ghosh and Manilal Ganguly will become and continue partners in the said business of a publisher and bookseller during their joint lives subject nevertheless to determination as hereinafter provided.

2. The business of the partnership shall be carried on at No. 22 Cornwallis Street aforesaid or at any other place the said parties may hereafter mutually agree upon.

3. Each partner shall on or before the 1st day of March 1910 pay the sum of Rupees 1000 into the Bengal Bank at Calcutta aforesaid and such sum together with all monies received on account of the partnership shall be paid therein from time to time and shall form and be deemed a floating capital of the said firm from which all payments made in the course and on account of the said business shall be drawn by Cheques by the said Manilal Ganguly. All future capital required for carrying on the said business shall be advanced by the said partners in equal moieties and if any partner shall with the consent of the other partner bring in additional capital or leave in the business as capital any part of the nett profits carried to his credit at any general account the same shall be considered as a debt due to him from the partnership and shall bear

interest after the rate of Rs. 6 per cent. per annum thereon until payment thereof payable half yearly but such additional capital shall not be drawn out by him without giving six calender months' written notice of his intention so to do to the other partner and he shall be bound to draw out the same on a like notice being given to him by the other partner and at the expiration of such last mentioned notice interest shall cease to be payable thereon.

4. The said capital and stock implements and utensils in trade and furniture and materials used in carrying on the said business purchased out of the partnership funds as well as the gains and profits of the said business shall belong to the said partners in equal moieties.

5. The said Manilal Ganguly shall be in charge of the said business and shall diligently employ himself in or about the business of the said partnership and carry on manage and conduct the same for the greatest benefit and advantage of the partnership and shall give such time attention and supervision as may be necessary for the efficient management thereof. The said Chintamoney Ghosh shall not interfere with the carrying on management or conduct of the said business and shall not during the continuance of the partnership either alone or in partnership with any other person or persons carry on or be concerned directly or indirectly in the business as a bookseller in Calcutta and its suburbs and shall not sign the name of the said firm.

6. The partners shall keep proper books of account and entries shall be made therein of all such matters dealings transactions and things as are usually entered in books of account kept by persons engaged in concerns of a similar nature and the same shall be posted up under the personal superintendence of the said Manilal Ganguly. The said books of account and all letters papers and documents belonging to the partnership except such as are to be kept at the Bankers shall be kept at the office of the partnership and each partner shall have full and free access thereto at all times but shall not remove the same from such depository.

7. No partner shall be at liberty to draw from the partnership for his own private use on account.

8. The said Manilal Ganguly shall be entitled to an amount equivalent to Rs. 15 per cent. on the total profit at the end of each year as an allowance for the management of the firm which will be considered as part of the working expenses.

9. All books of which the partners are or shall be the proprietors shall be sold by the firm and the firm will be entitled to a commission at a rate varying from 10 to 33⅓ per cent. as settled about individual books on the published price or the retail selling price at which the books will be sold. Such commission together with the commission on the sale proceeds of all books of other publishers shall be considered as receipts and earning of the partnership, the amount will be accounted for in the annual account.

10. The rent of the premises used for the purposes

of the said business and all rates and taxes payable in connection therewith and the allowance as aforesaid and the salaries and wages of all clerks and persons employed in the said business and all expenses losses and damages which shall be incurred in carrying on the same or in anywise relating thereto and the interest if any on the capital payable to either of the partners shall be paid out of the receipts and earnings and capital of the said business and in case of deficiency thereof then by the said partners in equal moieties.

11. The said Manilal Ganguly shall send an account to the said Chintamoney Ghosh by the 15th of every English month of all the receipts earnings and capital and debts and outstandings of the said partnership for the month immediately preceding.

12. The partners shall be entitled to the nett profits of the said partnership in equal shares and the said nett profits shall be divided between the partners as soon after as the general yearly account shall have been taken and settled as hereinafter provided.

13. An account of the stock implements and utensils of trade belonging to the said partnership and of the book debts and capital shall be taken and the statement of the affairs of the said partnership made yearly to be computed from the date hereof. But if at the end of any one year of the said partnership it shall be found to be unprofitable the said partnership shall thereupon be dissolved if mutually agreed upon, otherwise the partnership will be considered to be a floating one.

14. Each party shall sign duplicate copies of each of such statements of affairs and shall retain one of them for his own use and another copy thereof shall be written in a fair hand in one of the partnership books and likewise signed by each of them and such account shall not again be opened unless some manifest error shall be discovered in either of them within one month thereafter and then so far only as respects the correcting of such error and every such statement of affairs shall in all other respects be conclusive evidence between and binding on the said partners.

15. Either party may determine the partnership hereby created on breach of any of the conditions herein contained or otherwise on giving unto the other of them three calender months' notice thereof in writing.

16. Neither party shall become bail or surety for any other person nor lend spend give or make away with any part of the partnership property or draw or accept any bill note or other security in the name of the said firm except in due course of the said partnership nor without the consent of the other of them give credit to any person forbidden by the other or borrow money or goods or enter into any contract or engagement on account of the said firm.

17. The death of any partner shall not dissolve the partnership but the representatives of the deceased partner shall have the option to be declared by notice in writing to be given to the surviving partner within three calendar months

after his death of succeeding to his share in the said partnership as from his death as sleeping partners and if such option shall be exercised the said partnership shall be carried on as from the death of such deceased partner as nearly as may be according to the provisions of these presents but so that the representatives of the deceased partner shall succeed to his share in the said partnership and be substituted for him as sleeping partners only without any right to interfere in or have any control over the conduct or management of such business but with power for them or for some person nominated by them at all reasonable times to have access to and examine and copy the books documents and papers of the partnership and to join in taking general account and valuation **provided also** that in case the representatives of a deceased partner shall elect to become sleeping partners by virtue of such option as aforesaid all proper instruments for carrying the provisions of this present clause into effect shall be executed and made between them and the surviving partner, when it would be mutually settled who would be the managing partner.

18. At the termination of the said partnership a valuation and account of the stock effects and capital and good will, if any, of the said firm similar to the yearly account hereinbefore mentioned shall be taken copied and signed in like manner and become equally conclusive and the balance of such account then found to exist shall belong to the said partners in equal moieties and

be realised and divided accordingly and thereupon they shall execute mutual releases.

19. The term "partners" unless repugnant to the context shall also include their respective heirs executors administrators and representatives.

20. That if any dispute doubt or difference shall arise either before or after the expiration or determination of the said co-partnership between the said parties or the representatives of either of them under or the touching or relating to the construction of these presents or to the said partnership property rights credits or effects or to any of the partnership accounts business or transaction whatsoever every such dispute doubt or difference shall within 30 days after the same shall arise be referred to the arbitration of two indifferent persons and an umpire to be chosen by the referees before entering upon such reference ; and the award of such referees or umpire in the matters of such reference shall be made within 30 days next after the first reference to them or within such enlarged time or times as shall be allowed by the said referees and endorsed on these presents and shall be final and conclusive on both parties respectively and their respective representatives and in case either party shall for the space of 15 days after request in writing refuse or neglect to nominate his referee or in case the referees or either of them when chosen shall for the like space of time neglect or refuse to choose an umpire as aforsaid or to act the referee of the other party may proceed alone in the business of the reference and his award if made within the time

aforesaid shall in like manner be conclusive on both the said parties and their representatives to all intents and purposes whatsoever and this submission shall upon the application of either party be made a rule of the High Court of Justice in accordance with the provisions of the Indian Arbitration Act (of 1899) and any Act amending the same and the costs thereof and of the said reference and of all matters incident thereto shall be borne and paid by the said parties in equal moieties.

In witness whereof the parties have hereunto set and subscribed their respective hands and seals the day month and year first above written.

Signed, sealed and delivered.

(Sd.) Chintamoney Ghosh
(Sd.) Manilal Ganguli

Witness
(Sd.) Charu Bandyopadhyay
(Sd.) Kalachand Dalal

পত্রপরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯০৪ থেকে ১৯৩৮ দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ব্যাপী চিঠিপত্র-সম্বন্ধের রবীন্দ্রনাথের লেখা ১২০টি চারুচন্দ্রের ১০খানি চিঠি রক্ষিত হয়েছে। মধ্যে ১৯০৫ থেকে ১৯০৮, ১৯২১, ১৯২৩-১৯২৪. ১৯৩০, ১৯৩৫ এই ন বছরে কোনো পক্ষে পত্র ব্যবহার নেই। চারুচন্দ্রের সব কটি চিঠি ঢাকা বাসকালের, অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় চিঠিই চারুচন্দ্র রক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন আজীবন অচ্ছিন্ন রবীন্দ্রানুরাগী।

২৮শে এপ্রিল ১৮৯৪ কলকাতা স্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভায় চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন। তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, গাইতে অনুরুদ্ধ হয়েও গান নি। চারুচন্দ্র তখন এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র, সতেরো বছর বয়স। দ্বিতীয়বার দেখেন, চারুচন্দ্র লিখছেন, ১৮৯৬ সালে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা-সভায়, সমবেত শ্রোতাদের পীড়াপীড়িতে তিনি 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' গানটি গেয়ে শোনান। তারপর দেখেন ওই ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলেই 'গান্ধারীর আবেদন' পাঠ সমাবেশে, কবিতাপাঠের পর সেদিনও একটি গান গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রশান্তকুমার পাল সে সভার দিন ১০ ডিসেম্বর ১৮৯৭ শুক্রবার বলে ধার্য করেছেন, সভা বিবরণ সূত্রে চারুচন্দ্রের সাক্ষ্যও উদ্‌ধৃত করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে চারুচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে ১৮৯৭এ, বি.এ. পড়ার কালে। তাঁর হিন্দু হস্টেলের এক সহাধ্যায়ী নলিনীকান্ত সেন ('রবি-রশ্মি'র ইনিও একজন উৎসর্গভাগী) ১৮৯৬এর শেষ দিকে সদ্য বেরোনো একখানি 'কাব্য গ্রন্থাবলী' বই তাঁকে পড়তে দেন, দীর্ঘ দিন পর চারুচন্দ্র তার পৃ ১ ও পৃ ৭এর 'প্রভাতী' ও 'উল্লাস' থেকে মনে করে কয়েক ছত্র কবিতা উদ্‌ধৃত করে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার

প্রাণমন হরণ করল।...সেই দিন থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ আমার জীবনের আনন্দ বন্ধু শিক্ষক গুরু সহচর হয়ে আছে।'

মধ্যবয়সীদের মধ্যে রবীন্দ্রবিরোধিতা আর একাংশ তরুণদের দলে রবীন্দ্রপ্রাণিত রচনাচর্চার দিন সে সময়ে। যতীন্দ্রমোহন বাগচী তরুণদের যে নামগোত্রহীন রবীন্দ্রচক্রের কথা বলেছেন চারুচন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই তার অংশী হয়ে পড়েন। যতীন্দ্রমোহন বলেছেন এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।[১] চারুচন্দ্র বলেছেন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁকেও পরিচিত করে দিয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহন ১৯০৩ সালের কিছু আগে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারুচন্দ্রের আকস্মিক পরিচয় হয়ে যায় তার আগেই, চারুচন্দ্রের বিবৃতি অনুযায়ী কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে মজুমদার লাইব্রেরির এক সান্ধ্য মজলিশে (সম্ভবত আলোচনা-সমিতির বৈঠকে) ১৭ ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখে, সঙ্গীত সমাজে 'বিসর্জন' অভিনয়ের পর দিন। সেখানে ভূমিকা সহকারে 'পতিতা' কবিতাটি পড়ার পর তাঁর অপর একটি কবিতা সম্বন্ধে চারুচন্দ্রের অভিমত তিনি গ্রাহ্য করেছিলেন। এর পরে-পরেই ভারতী এবং নব্য প্রকাশিত বঙ্গদর্শনে চারুচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হয় এবং ভারতী সম্পাদন কাজে সরলা দেবীকে তিনি সাহায্য করতে থাকেন। এই সময়কার ভারতীর সুসম্পাদনার জন্য চারুচন্দ্রের শ্রমের কথা সরলা দেবী একটি চিঠিতে স্বীকার করেছেন। চারুচন্দ্রের পুত্র প্রেমোৎপল লিখেছেন, এই সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবী চারুচন্দ্রকে একটি সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন, হয়তো এই তার উপলক্ষ। ভারতীর সম্পাদন সহায়তায় চারুচন্দ্র বৎসরাধিক-কাল সংসৃষ্ট ছিলেন।

এই বইয়ের দ্বিতীয় চিঠির সূত্রানুযায়ী ১১ মাঘ ১৩১০ (২৫ জানুয়ারি

---

১ 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' ১৩৫৪ পৃ ১৬। চারুচন্দ্র অবশ্য লিখেছেন ১৩১৩য় 'বেণু ও বীণা' প্রকাশ কালেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল না। দ্র, 'সত্যেন্দ্র-পরিচয়'। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯ পৃ ৫৮৪।

১৯০৪) সোমবার প্রাতে জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন চারুচন্দ্র। বঙ্গদর্শনে তখন মাঘ কিস্তির 'নৌকাডুবি' বেরিয়েছে, রমেশের সঙ্গে কমল ও হেমের সম্বন্ধ-জটিলতা নিয়ে আলোচনা চলছে অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে, চারুচন্দ্র এক সহজ সমাধান প্রস্তাব করে বসলেন কথার মাঝখানে। 'কথার মধ্যেই রবিবাবু হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি চারুবাবু?"' ১৯০৪এ লেখা পাঁচখানি পত্রেই পাঠ 'সবিনয় নমস্কার' বা 'সবিনয় নমস্কার নিবেদন/সম্ভাষণ', এবং সম্বোধন 'আপনি'।' পাঁচটি চিঠিতেই চারুচন্দ্রের ঠিকানা ৪২ বীডন রো, কলিকাতা, কেবল চতুর্থ পত্রখানি রি-ডাইরেক্টেড হয়ে যায় তাঁর দেশের বাড়ি জীরাট, বলাগড় পোস্ট অফিস, হুগলিতে। চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'এর পর আমি অবস্থা বিপর্যয়ে কয়েক বৎসর কলকাতাছাড়া হয়ে ছিলাম।' সম্ভবত প্রথম যান মালদহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে, মালদহের অন্তর্গত চাঁচলের রাজার ভাগিনেয়ী ছিলেন তাঁর মা, মালদহেই চারুচন্দ্রের জন্ম, সেখানেই তাঁর বাল্য কেটেছিল। তারপর ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্ম নিয়ে[১] এলাহাবাদে গিয়ে ওঠেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি—বছরের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর ১৯০৬এ।[২] রামানন্দ তখন এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজের অধ্যক্ষ পদ ছেড়ে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ বের করছেন—ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে, চিন্তামণি ঘোষের আনুকূল্যে। প্রবাসীতে চারুচন্দ্রের অনেকগুলি লেখাও প্রকাশিত হয়েছে এর মধ্যে। চিন্তামণি ঘোষ লিখেছেন, চারুচন্দ্র প্রায় চার বছর কাল ইণ্ডিয়ান প্রেসের সিনিয়র রীডার, জেনারেল প্রেস অ্যাসিস্টেণ্ট এবং প্রেসের সংযুক্ত বুক ডিপোর ভারপ্রাপ্ত কর্মীরূপে কাজ

---

১ ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রধান প্রুফ রীডারের কাজ। দ্র. শান্তা দেবী: 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১২৫।

২ দ্র. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: 'স্বর্গীয়া মনোরমা দেবী'। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫০ পৃ ২৬৬। শান্তা দেবীর সাক্ষ্যে রামানন্দের বাড়ি তখন ২/১ সাউথ রোড, এলাহাবাদ।

করে গেছেন।[১] চারুচন্দ্র জানিয়েছেন, ১৯০৮ সালে এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের তরফে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস নামে তিনি দোকান খোলেন, তাঁর উপরে ভার ছিল প্রসিদ্ধ লেখকদের বই প্রকাশের অধিকার সংগ্রহ করা, সে কারণে 'রবিবাবুকে দিয়ে বউনি করব সঙ্কল্প করে রামানন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে রবিবাবুর কাছে' তিনি যান। রামানন্দ ছাড়াও ইণ্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ স্থাপনে এলাহাবাদ অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়ের ভূমিকা ছিল, নেপালচন্দ্র অচিরেই বোলপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে যোগ দেন। যেভাবেই হোক, ১৪ই জুলাই ১৯০৮ এবং ২১শে জুন ১৯০৯এ কলকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারীর পক্ষে ম্যানেজার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট তিনটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়, তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ গদ্যগ্রন্থ ছোটো গল্প 'গোরা'-সহ অন্যান্য উপন্যাস এবং আরো পঁচিশখানি বইয়ের মুদ্রণ প্রকাশ বিক্রয়ের অধিকার ও দায়িত্ব তাঁরা লাভ করেন বিক্রয়মূল্যের এক-চতুর্থাংশ রয়ালটিতে।[২]

১৯০৮এ চারুচন্দ্র যখন কলকাতায় ফেরেন ভারতী নতুন করে বেরোতে শুরু হয়েছে স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায়, সৌরীন্দ্রমোহন মণিলাল তাঁর সহযোগী। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে খুলেছেন কান্তিক প্রেস, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

---

১ চারুচন্দ্রকে দেওয়া চিন্তামণি ঘোষের আশংসাপত্র অনুসারে।

২ চিন্তামণি ঘোষের জীবনীকার অবশ্য লিখেছেন: 'Charu Babu and Babu Nepal Chandra Roy...who were both close to Rabindranath Tagore *materialised the poet's ambition* to get all his published and unpublished works printed, published and distributed for sale from one place— The Indian Press'. N. G. Bagchi : *Chintamoni Ghosh & the Saga of the Indian Press* 1984 p 20.

'১৯০৮ সালের আষাঢ় মাস থেকে কান্তিক প্রেসে আমাদের আসর বসতে লাগল নিত্য। চারুচন্দ্র এ সময়ে কলকাতায় থাকেন... এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের এখানকার কর্মাধ্যক্ষ হয়ে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গ্রন্থ-প্রকাশের ভার পেয়েছেন তখন ইণ্ডিয়ান প্রেস। তাঁরা এখানে দোকান খুলেছেন ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ২২।১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে।' ১লা অগস্ট ১৯০৯ থেকে মণিলালের সঙ্গে প্রকাশনার অংশীদারী ব্যবসায়ে নামলেন চিন্তামণি ঘোষ। এ বাবদে চিন্তমণি ঘোষ এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে অংশীদারীর শর্তাদি নিয়ে নতুন চুক্তি সম্পাদিত হল ১লা জানুয়ারি ১৯১০এ (দ্র. এই বই পৃ ২৯৬-৩০৪), তারও সাক্ষী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সাক্ষী কালাচাঁদ দালাল। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের প্রথম দিকের বইয়ে প্রকাশক বলে কালাচাঁদ দালালের নাম থাকত।

৩১শে জুলাই ১৯০৮এ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন, 'চারুচন্দ্রের এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কবি ও লেখক থেকে একেবারে নিতান্ত গুরুদাসপন্থী প্রকাশক...'। ২৬শে মার্চ ১৯১৪য় এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস এবং কলকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ৮৭খানি বইয়ের যে নতুন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় সেখানে মণিলালের সংস্রব নেই, চারুচন্দ্রেরও নেই। তার অনেক আগেই, সম্ভবত ১৯০৯এর শেষ দিকেই চারুচন্দ্র ঘনিষ্ঠ হয়েছেন প্রবাসীর সঙ্গে (দ্র ২৩.১০.১৯০৯এর পত্র ৬), হয়তো ১৯১০এর মাঝামাঝি পূর্ণত সংযুক্ত হয়েছেন প্রবাসী মডার্ন রিভিউয়ের সহ-সম্পাদকরূপে। অজস্রবিষয়ের নিয়মিত লেখকরূপেও বটে। হয়তো ওই বই সূত্রে আরো বলতে হয় অতঃপর রবীন্দ্রনাথের প্রায়াংশ রচনার অবিচ্ছিন্ন গুণগ্রাহী প্রকাশ-পত্র রূপে প্রবাসী মডার্ন রিভিউয়ের অনন্ত ভূমিকার ক্ষেত্রে চারুচন্দ্রের নিরন্তর মধ্যবর্তিতার কথা। ১৯২৭এর মাঝামাঝি রামানন্দ যে রবীন্দ্রনাথকে সক্ষোভে লিখেছিলেন, 'প্রবাসীর ভাদ্র সংখ্যা হইতে আমি আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত থাকিতে প্রতিজ্ঞা

করিলাম', তার আগেই প্রবাসী অফিসের কর্ম ত্যাগ করে চারুচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায়রূপে যোগ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময়ের বিষয় তখন রবীন্দ্র রচনার অর্থব্যর্থ, বা মুদ্রণসংশয়।

ভারতী ১৩১৬ আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে সদ্য প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অন্যূন ৪৬খানি বইয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তার মধ্যে 'চয়নিকা' ও 'গান' বই দুখানিতে প্রকাশকের অধিক ভূমিকা চারুচন্দ্র পালন করেছিলেন। এ সব বইয়ের অনেকগুলি এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা, কয়েকখানি কলকাতা কান্তিক প্রেসে। দূর স্থানে ছাপা হওয়ার ফলে 'গান' বইয়ের ভুল কবিকে ক্ষুব্ধ করেছিল, কান্তিক প্রেসে নতুন করে ছাপা নিয়ে তিনি নির্বন্ধ করেছিলেন, দ্র ২.১১.১৯০৯এর পত্র ১২। 'গান' তখনই ফের পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল কি না জানা যায় না যদিও প্রথম ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ যে 'গান' বইখানি আমরা দেখেছি তাতে 'নূতন গান' পর্যায়ে ১২ই পৌষ ১৩১৬য় (২৭.১২.১৯০৯) লেখা গান আছে, আর ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত প্রকাশিত পরের 'গান' বইখানি আগের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কৃশকায়। ইতস্তত ছাপার ভুল বাদ দিলে চারুচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা রবীন্দ্রনাথের বইগুলি মুদ্রণের শৈলি ও সৌকর্যে বিশেষভাবেই দৃষ্টান্তজনক, তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য পাই বুদ্ধদেব বসুর লেখায়। বুদ্ধদেব লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কোনো ইণ্ডিয়ান প্রেস-সংস্করণ ব্যবহার করার বা চোখে দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন যে মুদ্রণের পারিপাট্যে শুধু নয়, পৃষ্ঠাসজ্জায় ও কবিতার পঙ্‌ক্তি ও স্তবকবিন্যাসে তাতে প্রকাশকের রুচি ও সাহিত্যবোধের পরিচয় কী রকম উজ্জ্বল ছিল।... অনুমান করা শক্ত নয় যে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগের জন্যই এমনতর চারুতা সাধন সম্ভবপর হয়েছিল।'[১]

---

১ দ্র. দেশ সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৭৩ পৃ ১৯৬। চারুচন্দ্রের সহযোগের আগে এবং পরে ইণ্ডিয়ান প্রেসের মুদ্রণ পরিপাট্য এবং তার কর্মকৃৎ রূপে চিন্তামণি ঘোষের সুনাম

ইণ্ডিয়ান প্রেসে যোগ দেবার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারুচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। ১৯০৯এ লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠিতে (পত্র ৬) আপনি-তুমি-র দোলাচল রয়েছে, ক্রিয়ার প্রয়োগে: '"সখি প্রতিদিন হায়" গানটির জন্য এত খোঁজাখুঁজি করিতেছে কেন?' 'করিতেছেন' লিখে তারপর শেষের 'ন' টি কেটে দেওয়া। এইখান থেকে চারুচন্দ্রের ঠিকানা

Babu Charuchandra Banerji
The Indian Press
3 Pioneer Road
Allahabad.

ঠিকানা বদল হল দেখা যায় অচিরে, ২৪শে জুন ১৯১৪র পত্র ১৪ থেকে চারুচন্দ্রের নতুন উদ্দেশ

Babu Charuchandra Banerji
210/3/1 Cornwallis Street
Calcutta.

পত্র ১৬ থেকে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপরে Prabasi Office বা "Prabasi" Office লাইনটি বসেছে। পত্র ২৫ থেকে রাস্তার

অবশ্য ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত ছিল। চিন্তামণি প্রবাসী ছাপার জন্য ইণ্ডিয়ান প্রেসে বাংলা বিভাগ খোলেন। শান্তা দেবী লিখেছেন, 'তাঁহারই ইণ্ডিয়ান প্রেসে "প্রবাসীর" প্রথম পাপড়িগুলি বিকশিত হইয়াছিল। এমন সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই বাংলাদেশেও তখন হইত কি না সন্দেহ।' রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী (দশ খণ্ড 'কাব্যগ্রন্থ') ছাপার জন্য তিনি নিজের কারখানায় সুদৃশ্য টাইপ ঢেলে নিয়েছিলেন। মাত্র চার দিনে অতি মনোরমভাবে 'গীতালি' ছেপে বেঁধে বের করে দিয়ে তিনি কবিকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন।

ঠিকানা দাঁড়িয়েছে 210-3-1 Cornwallis Street এই রূপে, ৮ জুলাই ১৯২২এর পত্র ৮৪তে রবীন্দ্রনাথের জরুরি তলব পুনঃপ্রেরণের জন্য ঠিকানার নীচে ৪১/১ শিবনারাণ দাসের লেন লিখে দিয়েছেন কেউ বাংলায় মেয়েলি হাতে।[১] তার অনেক আগেই অবশ্য চিঠির পাঠ 'প্রিয়বরেষু', 'সুহৃদ্বরেষু', 'প্রিয়সম্ভাষণমেতৎ' ইত্যাদি থেকে ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪র পত্র ৫৮ থেকে স্থির হয়ে গেছে 'কল্যাণীয়েষু'তে। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬র পত্র ৬৯এ সংশয় অন্ধকার পথে বিপদের বন্ধু বলে স্বীকার করে চারুচন্দ্রকে দু ছত্র ইংরেজি পদ লিখে পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

অন্তত এক দশকের এই ক্রমান্বিত ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস। আশ্বিন ১৩১৩য় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বেণু ও বীণা' নামে দ্বিতীয় কাব্যখানি 'বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক··· অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন কবির উদ্দেশে' সসম্ভ্রমে উৎসর্গিত হয়েছিল। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, 'ঘরে থাকতে পরকে দিতে' যাবেন কেন বই— কবির এই স্বীকার জানতে পেরে অন্তরের সায় সমর্থন খুঁজে পান তাতে চারুচন্দ্র। প্রবাসী মাঘ ১৩১৩য় 'খেয়া', তারপর দেবালয় কার্তিক ১৩১৭য় 'রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে' প্রবন্ধে চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জন্য 'উচ্চতম কবির সিংহাসন দাবি' করেছিলেন, এবং এই প্রত্যয় অবিচলিতভাবে জ্ঞাপন করে গেছেন সারা জীবন। ১৩৩৪এ চারুচন্দ্র লিখেছেন ময়মনসিংহ রবীন্দ্রজন্মোৎসবে 'আমি আমার অভিভাষণে জগতের সকল কবির চেয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলেছি···'। ১৯৩৪এ 'বঙ্গ-বীণা' সংকলন করতে গিয়েও চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'আপনার কবিতা দিয়েই বইখানি ভরে দিতে ইচ্ছা করে।'

কাব্যমুগ্ধতাতেই শেষ নয়। 'শ্রাবণে তোমরা আমার বার্ধক্য সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেছ' বলে রবীন্দ্রনাথ যে উপলক্ষে পরিহাস

---

১ পত্র ৭০এর ঠিকানায় ভুলক্রমে একবার 210-3-2 Cornwallis Street লেখা হয়েছে।

করেছেন, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তির সে কবি-সংবর্ধনায় (টাউন হল ১৪ মাঘ ১৩১৮) মুখ্য চার বা পাঁচজন উদ্যোক্তার চারুচন্দ্র একজন। সে সময় চৌরঙ্গির হপসিং কোম্পানির তোলা 'সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যে'রও এক রশ্মি চারুচন্দ্র। রবীন্দ্রবিদ্বিষ্টদের নিরস্ত করতেও সতত সক্রিয় ছিলেন এঁরা। ১৩৩৪এ চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'আমি এই কর্ম ক'রে বহুকাল থেকে বহু লোকের বিরক্তিভাজন হয়েছি; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিবাদ প্রথম আমিই প্রবাসীতে তাঁর "আলেখ্য" বই সমালোচনা প্রসঙ্গে করি…'। ১৭ মে ১৯১৩য় লণ্ডনে টমাস কুকের কেয়ারে লেখা পত্র ৫৫য় রবীন্দ্রনাথ যে 'তোমরা যখন দস্যুর আক্রমণে পড়েছ তখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি ভগবান অপহরণ করচেন—জয়ী হবার গৌরব আর আমার সইবে না' ব'লে লিখেছেন, 'আনন্দবিদায়' অভিনয় বা তা নিয়ে বিরোধী কাগজগুলির প্রবল সোরগোল তার অপরোক্ষ উপলক্ষ হওয়া সম্ভব। পত্রলেখকের জানার কথা নয়, চিঠি লেখার দিনেই সন্ন্যাস রোগে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়েছে।

ইতিমধ্যে অজস্রধারা গান গদ্য কবিতা নাটকের পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ দেয়ানেয়ার সংযোগ উপর্যুপরি হয়ে উঠেছে ক্রমাগত। পুত্রকে পড়তে পাঠিয়েছেন চারুচন্দ্র শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের লেখার নকল করতে, নিজের জন্য লেখা শুধরোতে, গল্পের প্লট চাইতে এসেছেন বারংবার—বোলপুরে, শিলাইদহে, একবার সহযাত্রী হয়ে গেছেন গয়া বুদ্ধগয়া বরাবর পাহাড় থেকে এলাহাবাদ। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অত্যন্ত যত্নে কৃত 'জীবন-স্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিখানি তুলে দিয়েছেন চারুচন্দ্রের 'হাতেই', লিখেছেন, 'তুমি চেয়েছ তাই পাঠাচ্ছি।' বানান নিয়ে ভাষা নিয়ে শব্দের যথার্থ প্রয়োগ নিয়ে বিশ্রব্ধ আলোচনা করেছেন তাঁর সঙ্গে। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কবিকঙ্কণ পড়াবার ভার পেয়ে বহু পণ্ডিত-বিদগ্ধের সাহায্য পরামর্শ সহকারে ব্যাপক প্রস্তুতি করেছেন চারুচন্দ্র পড়াবার, তাঁর ব্যবহার্য চণ্ডীমঙ্গলের টেক্স্‌ট্‌খানি 'অমূল্য' মন্তব্যে ভরিয়ে দিয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ। চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'তিনিই প্রথমে তাঁহার মন্তব্য দ্বারা আমার মনে সন্দেহ উদ্রেক করিয়া দেন যে কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন।' এই তথ্য পরে 'আন্তর ও বাহ্য বহু প্রমাণ দ্বারা' তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতী বঙ্গদর্শন তত্ত্ববোধিনী এবং পরে সবুজপত্রের বাইরে, হয়তো উপরেও, রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশের মুখ্য কাগজ প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ। মডার্ন রিভিউ তাঁকে ইংরেজি লিখতেও নিরন্তর প্রণোদিত করেছিল, অন্যের করা রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ প্রকাশ করেছিল ধারা-বাহিকভাবে। ইংরেজিভাষাভাষী বহির্বঙ্গে, বহির্ভারতেও, তাঁর প্রাথমিক পরিচয় এই কাগজের সূত্রে। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশের যাবতীয় কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর প্রবাসী অফিসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সাময়িক অনন্বয়ের সূত্রপাত হয় সে অনেক পরের কথা। ততদিনে ইণ্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধচ্ছেদ হয়ে গেছে।

চারুচন্দ্র ইণ্ডিয়ান প্রেস ছেড়ে প্রবাসীতে যোগ দেওয়ার পরেও তাঁর সঙ্গে বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান প্রেসের সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হয় নি। ১৯০৯ থেকে ১৯১২ চার বছরে চারুচন্দ্রের প্রণীত অনূদিত সম্পাদিত প্রথম নয়খানি বইই ছেপেছিলেন ইণ্ডিয়ান প্রেস/ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। তার পর কুন্তলীন প্রেস, এম. সি. সরকার, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগুরু লাইব্রেরি এবং আরো নানা প্রসিদ্ধ সংস্থা তাঁর বই প্রকাশ করলেও ইণ্ডিয়ান প্রেস ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে তাঁর মোট সতেরোখানি বই প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান প্রেসের সম্বন্ধচ্ছেদ হয়ে যায় মাঝপথেই— বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব নেবার পর। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২এর পত্রে চিন্তামণি ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'আমার সমস্ত বাংলা বইগুলির স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্বভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লইয়াছি। এক্ষণে এই অধিকারের হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আমার গ্রন্থপ্রকাশের কোনো একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইতে

পারিলে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।' ইণ্ডিয়ান প্রেস সর্বশেষ রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন 'শিশু ভোলানাথ', ১৯২২এর সেপ্টেম্বরে। 'শিশু ভোলানাথ' পর্যন্ত যাবতীয় মজুত বই তাঁরা বিশ্বভারতীকে হস্তান্তর করেন এক-তৃতীয়াংশ বিক্রয় মূল্যে, সম্ভবত ১৩ ডিসেম্বর ১৯২২এ, দ্র. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, এই বই পৃ. ২৯৫।[১] জুলাই ১৯২৩এ প্রতিষ্ঠা হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। গ্রন্থনবিভাগ ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলী থেকে বাছাই করে 'সঙ্কলন', ও 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ বের করেন শ্রাবণ ১৩৩২এ। অগ্রহায়ণ ১৩৩২এ বেরোয় 'প্রবাহিণী'। পাঠকের বাছাই অবলম্বন করে 'চয়নিকা' তৃতীয় সংস্করণ বেরোয় ফাল্গুন ১৩৩২এ।[২]

ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে তুলে নিয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রন্থপ্রকাশের স্বত্ব সমর্পণ নেহাৎই রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় না হওয়া সম্ভব। চিন্তামণি ঘোষের জীবনীকার লিখছেন :

...as Shanti Niketan gradually grew up into Viswa Bharati, a regular source of income was found indispensably necessary for meeting monthly expenses. Friends suggested to the poet to procure the copyright of his entire publications from the Indian Press in favour of the Viswa Bharati and

---

১ মজুত বইয়ের মোট বিক্রয়মূল্য রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার বলেছেন ৭৮,০০০ টাকা, চিন্তামণির জীবনীকার লিখেছেন, ৮৭,০০০ টাকা।

২ 'কিছুদিন আগে, রবীন্দ্রনাথের ২০০টি কবিতা বাছিয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভোট সংখ্যা দ্বারা কবিতাগুলির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়।

বর্তমান সংস্করণ চয়নিকা মোটামুটি এই লোক-প্রিয়তা অনুসারে সংকলন করা হইয়াছে।' দ্র. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ -লিখিত 'পাঠ পরিচয়', 'চয়নিকা' ৩য় (বিশ্ব-ভারতী) সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৩২।

thus earn the Publisher's profit for the institution. By the Deed Agreement the Indian Press was the copyright owner. Beside the legal hurdle there was a moral binding also. The Indian Press had spared no pains to publish the Poet's works promptly and to his entire satisfaction, and the Poet felt very sorry to make such a suggestion. But there was no other way out also. At last he wrote personally to Chintamoni Babu about this predicament. Quick came the spontaneous offer from Chintamoni Babu, relinquishing all his title to the Copyright of the Poet's works in favour of the Viswa Bharati—a rare example of his large-heartedness which amazed the Poet so much that he wrote to him at once, expressing his heart-felt appreciation of this noble gesture.…'[১]

ইণ্ডিয়ান প্রেসের সুমুদ্রণ, তৎপরতা এবং উদ্যোগী প্রচার বিস্তার প্রবাদ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তৎসত্ত্বেও সম্বন্ধ-ব্যবধানের দ্বিতীয় একটি সূত্রও পাশাপাশি উল্লেখ করতে হয়। বেশ কিছু দিন ধরেই ইণ্ডিয়ান প্রেসের গ্রন্থ-প্রকাশ ব্যবস্থায় কিছু অবস্থান্তরের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় চিন্তামণি ঘোষ প্রেসের কার্যভার থেকে অবসর নিয়ে প্রেসটিকে তাঁর পুত্র-গণের সহযোগে একটি প্রাইভেট কোম্পানি করে দিয়েছিলেন। এলাহাবাদ থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯১৯এ চিন্তামণি রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লেখেন :

---

১ N. G. Bagchi, *Chintamoni Ghosh & the Saga of the Indian Press* 1984 p 22

'আপনাকে আমার পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী এখন এক ব্যক্তি নহেন। একটি কোম্পানির হস্তে ইহা এখন হইতে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং অতঃপর কোনো পুস্তকাদি প্রকাশ করিবার সময় কোম্পানির তাহার লাভালাভ হিসাব করিয়া দেখা আবশ্যক হইবে। কার্যতঃ তাহাই হইতেছে।'

অতঃপর লেখেন :

'এ পর্যন্ত আপনার সমস্ত পুস্তক লাভ-লোকসান বিবেচনা না করিয়াই আমি সানন্দে প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এখন হইতে আপনার নূতন কোনো বই ছাপিতে হইলে কোম্পানি তাহার লাভালাভ দেখিবেন। এই জন্য আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার নব-লিখিত কোনো পুস্তক প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইলে তাহা ছাপিবার পূর্বেই অনুগ্রহ করিয়া একবার ইণ্ডিয়ান প্রেসের বর্তমান পরিচালকগণকে তাহার লাভ-লোকসানের হিসাব করিবার সুযোগ দিয়া বাধিত করিবেন।'

২৮ নভেম্বর ১৯১৯এ চিন্তামণি ঘোষ পুনরায় একখানি চিঠিতে লেখেন :

'এতকাল ইণ্ডিয়ান প্রেসের হর্তাকর্তা আমি একাই ছিলাম··· কিন্তু এখন আমার শারীরিক অক্ষমতা বশত উহার ভার একটি কোম্পানির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।··· কাজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, উহার পরিচালকেরা এমন কোনো বন্ধন স্বীকার করিতে পারিবেন না যাহাতে লাভ-লোকসানের সম্বন্ধ বিচার করিবার কোনো সুযোগ নাই।

'আপনার সহিত আমার ব্যবসায়ের চেয়ে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার সম্বন্ধই বেশী। কিন্তু কোম্পানি জিনিসটা একটা হৃদয়হীন পদার্থ মাত্র। সে লাভ ছাড়া অন্য কিছুরই খাতির রাখে না। এই বুঝিয়া অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে ক্ষমা করিবেন।'[১]

এই পত্রপরম্পরা থেকে অনুমান হয় অন্তত এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের অপর উপায় স্থির করে নিষ্কৃতি লাভ করতে চেষ্টা

১ চিন্তামণি ঘোষের পত্র কয়খানি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

করেছেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ যখন প্রতিষ্ঠা হয় চারুচন্দ্র তখনও প্রবাসী সম্পাদনার কাজে যুক্ত। কিন্তু ১৯২২এর সত্যেন্দ্র-স্মৃতিসভার পর আড়াই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ নেই। ১৯২৪এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পূর্বাহ্নে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটি সুপারিশ পত্র মাত্র তিনি দীর্ঘ তিন বছরের মধ্যে লাভ করেছেন।

৩

১৯২০তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পার্ট টাইম ক্লাস নিতে শুরু করেন চারুচন্দ্র, প্রবাসী অফিস আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাগাভাগি হয়ে যায় তাঁর কর্মজীবন। ১৯২০র দুটি মাত্র চিঠির দ্বিতীয়টিতে প্রবাসীর জন্য গল্প লেখা, চারুচন্দ্রের জন্য গল্পের প্লট ভেবে দেওয়া এবং অধ্যাপনা নিয়ে পরিহাস করেছেন দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ পাশাপাশি। প্রসঙ্গত, চারুচন্দ্রের পুত্র লিখেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পর্বে তাঁর সৃষ্টিধর্মী লেখাতেও ‘কোটাল জোয়ার’ এসেছিল, এই সময়-পরিসরের মধ্যে নখানি উপন্যাস দুটি ছোটো গল্পের বই ও একখানি বারোয়ারি উপন্যাসের একাংশ তিনি লিখেছিলেন। পড়ানোর পূর্বাহ্নে শ্রেণীবিভাজিত, বিস্তৃত একটি সিলেবাস তৈরি করে নেন পাঠ্যবিষয়ের (সে সিলেবাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত করেছিলেন)— সেও শ্রমসাধ্য কাজ। দীনেশচন্দ্র সেন হৃষীকেশ বসুর সহযোগে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর নতুন দুভাগ বইও সম্পাদনা করেন এই সময়, পড়াতে গিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তোলেন সুবৃহৎ দু খণ্ড ‘চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী’।[১] সে-সব বই যতদিনে বেরিয়েছে তার আগে পুরোপুরি অধ্যাপন কর্ম নিয়ে তিনি ঢাকা-বাসী। ১০ মে ১৯২৫এর পত্র ৮৫তে রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে বাংলা-ইংরেজিতে মেশানো চারুচন্দ্রের ঠিকানা: শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/44 Nilkhet Road / Ramna / Dacca। সে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ

---

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রাচীন সাহিত্য পড়িয়েছেন চারুচন্দ্র। ‘শূন্যপুরাণ’ (১৩৩৬) বা ‘বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী’ (১৩৪১) সম্পাদনার উপলক্ষ হয়তো তাই।

অভিযোগ করেছেন : 'চারু, ছুটিতেও কি তোমার দেখা পাওয়া যাবে না।' হয়তো গ্রীষ্মের ছুটিতেও আসার অবকাশ নেই, পুরোপুরি, অবিচ্ছিন্ন ঢাকা-জীবন এখন তাঁর।

রামানন্দের আশংসাপত্র থেকে অনুমান হয় ১৯২৪এ পুজোর আগে বা পরে যোগ দিয়েছিলেন চারুচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই নিযুক্তির সূত্রে সোচ্ছ্বাসে বলেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথের সুপারিশের কথা (দ্র. এই বই পৃ ১৪৯)। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'His connection with the Calcutta University led to his appointment as a Professor in the Bengali Department of the Dacca University.' চারুচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ সান্‌স্‌ক্রিটিক স্টাডিজ অ্যাণ্ড বেঙ্গলি-র লেকচারার পদে যোগ দিয়েছিলেন। ২৫ অগস্ট ১৯২৮এর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক এম.এ. ডিগ্রি দান করেন।

ঢাকায় চারুচন্দ্রের রবীন্দ্রকৃতির প্রথম তথ্য পাই পত্র ৮৬তে। ১৯২৫এর বর্ষায় ঢাকা বিশ্বভারতী সম্মিলনী যে 'ফাল্গুনী' অভিনয় করেন প্রোগ্রাম পত্রীতে চারুচন্দ্র সে সম্মিলনীর সম্পাদক বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ষায় 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের একটি সূচনার কৈফিয়ত লিখে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চারুচন্দ্র অভিনয়ও করেছিলেন সে নাটকে। ১৯২৬এর ফেব্রুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা ও অন্যত্র পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা সফর করেন। ১৯২৫এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে চারুচন্দ্রকে লেখেন তাঁর 'জানুয়ারির শেষভাগেই যাবার সঙ্কল্পে'র কথা, কিন্তু রমেশের (বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার) বাসাতেই থাকার কথা তিনি দিতে পারছেন না (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে হয়তো চারুচন্দ্রও তাঁকে সেই নির্বন্ধ করেছিলেন)। ফেব্রুয়ারি ১৯২৬এর শুরুতে লেখেন, ঢাকার সাধারণের তরফ থেকেও দুজন দূত এসে তাঁকে আমন্ত্রণ করে গেছেন অতএব নির্ধারিত দিনের তিন দিন আগে গিয়ে তাঁদের অতিথি হয়ে

থাকতে চান যাতে পূর্ব-ব্যবস্থার ব্যত্যয় না হয়। এই অতিরিক্ত তিন দিনের থাকা নিয়ে রমেশচন্দ্রকেও তিনি টেলিগ্রাম করেছিলেন, কিন্তু 'গুরুদেবের অন্যত্র বাসের নতুন ব্যবস্থায় ইউনিভার্সিটির ছাত্রেরা যে নিতান্ত *নিরুৎসাহ' হয়েছেন সে কথা চারুচন্দ্র লিখে* জানান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।[১] ঢাকা সফরের আর কোনোখানে চারুচন্দ্রের উল্লেখ নেই। পরের বছর ঢাকা জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বসন্তোৎসব উপলক্ষে চারুচন্দ্রের ফরমাস মতো দোলের কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'ছাপাখানার মসীবন্ধনে বন্দী করবার অধিকার' না দিয়ে। এই ১৯২৭এর ময়মনসিংহ রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের ভাষণেই, চারুচন্দ্র লিখেছেন, তিনি বলেছেন, 'জীবনের অবশিষ্ট দিন কটাও আপনার মহিমা কীর্তন ও প্রচার করেই কাটাব।' চারুচন্দ্রের এর পরের চিঠির ঠিকানা

Charu Bandyopadhyaya, M.A.
Lecturer, Dacca University
House Tutor, Dacca Hall
Ramna, Dacca.

১৪ এপ্রিল ১৯৩১এর এই চিঠিতে ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে প্রস্তূয়মান 'বঙ্গ-বীণা' কাব্যচয়নিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি ভূমিকা প্রার্থনা করেন চারুচন্দ্র। 'শ্রী' ও 'চন্দ্র' বর্জিত নাম চিঠিতে এই প্রথম। ২ অক্টোবর ১৯৩৩এর পত্র ১০৭এ রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে পাওয়া গেছে খামে লেখা উপরের এই নাম-ঠিকানা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাল শেষ হতে চারুচন্দ্র যোগ দেন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানান ৪ বৈশাখ ১৯৪৪এর অনুষ্ঠানে। আরো দুবার তাঁর ঠিকানা বদল দেখা যায়

---

১ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চারুচন্দ্রের চিঠিখানি গোপালচন্দ্র রায়: 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' ১০৭৯ পৃ ৩৯এ সংকলিত।

রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির খামে। ২৩ জানুয়ারি ১৯৩৮এর পত্র ১১৫য় ঠিকানা : ১ গোবিন্দদাস রোড/লক্ষ্মীবাজার/ঢাকা। পত্র ১১৮তে পাই

শ্রী চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
"মাতৃকা"
৪৪এ রাণী হর্ষমুখী রোড
পাইকপাড়া, কাশীপুর

নীচে লেখা : Cossipur, Near Calcutta। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার পর কলকাতার কাছে এই বাড়িখানি কিনেছিলেন চারুচন্দ্র।

প্রাচীন সাহিত্যের চেয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুচন্দ্র মুখ্যত পড়াতেন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না কিন্তু লিখেছেন, 'বন্ধুদের মুখে শুনেছি, "চয়নিকা"র যে কপিটি তিনি ক্লাশে ব্যবহার করতেন তার পাতায় পাতায় তাঁর স্বরচিত পাণ্ডুলিপি গ্রথিত ছিল : বহু ব্যাখ্যা, উল্লেখ, ভারতীয় ও বৈদেশিক কবিদের রচনা থেকে তুলনীয় অংশ— এই সব ছিল ছাত্রদের জন্য তাঁর আয়োজিত ভোজ।' ১৯২৮ থেকে তাঁর চিঠিপত্রেরও একটানা বিষয় রবীন্দ্ররচনা— বিশেষ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল। 'রবি-রশ্মি'র ভূমিকায় চারুচন্দ্র লিখেছেন, এ বই তাঁর বারো বছরের অধ্যাপনার ফসল। 'রবি-রশ্মি'র পূর্বভাগ মাত্র মৃত্যুর আগে চারুচন্দ্র দেখে যেতে পেরেছিলেন।

৪

ভারতী যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কথাসাহিত্যিক চারুচন্দ্র; একই সঙ্গে রাবীন্দ্রিক আবার সদ্য-আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাবগতির অবধানপরায়ণ। চারুচন্দ্রের 'পুষ্পপাত্রে'র প্রথম গল্পগুলিকে 'বাঙ্গালা গল্পের রাজ্যে নূতন, বিশিষ্ট' বলে অভ্যর্থনা করেছিলেন ভারতী (দ্র. আশ্বিন ১৩১৭)। তরুণ আধুনিকেরা ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। মণীশ ঘটকের উপন্যাসে তুমুল স্বদেশীর দিনে শিলেট শহরের

হালফিল বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেটের অন্তঃপুরিকা ডিটুজ লর্ঠনের পল্‌তে উসকে প্রবাসীর পাতা উলটে নিবিষ্ট হয়ে পড়েন রবিবাবুর গান, প্রভাত মুখুজ্জের উপন্যাসে, চারু বাঁড়ুজ্জের ছোটো গল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন তাঁর শিক্ষানবিশির পর্বে 'প্রবাসী' পত্রিকা স্বর্গত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রতি বৎসর গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কৃত গল্পগুলি তাঁরা সাগ্রহে পাঠ করতেন।[১] তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র ভূমিকায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'তিনি যে অতি আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর অগ্রদূত, সে সত্যের ইঙ্গিত'ও পেয়েছেন। আধুনিক বাস্তবতা বা ইতরজনপ্রান্ত বা মন্দ-অমাঙ্গল্যের প্রবেশ ঘটেছিল তাঁর প্রৌঢ় লেখাতে, যদিও বুদ্ধদেব বসুর বিবেচনায় তা স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে নি লেখকের স্বভাবজ অপ্রবণতাবশে। তথাপি চারুচন্দ্রের মৃত্যুর সম্বন্ধগত পর প্রবোধকুমার সান্যাল যে লিখেছেন, 'যে বাস্তবতা ও স্ত্রীপুরুষের বিশ্লেষণমুখিতা এখনকার কথাসাহিত্যে অপরিহার্য বলিয়া স্বীকৃত তাহার পূর্বাভাস চারুচন্দ্রের গল্পে ও উপন্যাসে পাওয়া যায়', তাতে আরো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের সূত্র নির্ণীত হয়েছে বলে মনে হয়।

হয়তো আধুনিক ইয়োরোপীয় অনুষঙ্গের অধিক সুব্যবহার হয়েছে তাঁর লেখাতে। 'কন্টিনেণ্টাল' লেখার নানা বিষয় প্রসঙ্গের বিনিয়োগের চেয়েও সে ক্ষেত্রে বেশি উল্লেখ করতে হয় তর্জমাগুলি। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমেই তাঁরা ভাবানুবাদ করেছেন, তাঁর অনুগামীদের রবীন্দ্রনাথ আক্ষরিক অনুবাদের প্রবর্তনা করেন নি। কিন্তু সেও অনুযাত্রীদের কাছে কম নয়। সৈয়দ মুজতবা আলি লিখেছেন, ভারতী গোষ্ঠীর চারুবাবু ছিলেন তাঁদের তরুণ বয়সের হিরো। বড়ো একটা catholic জানলা তাঁরা খুলে দিয়েছিলেন। 'ফরাসী ও রুশ গল্পের "ছায়াবলম্বনে"র ওস্তাদ সূপকার' বলেছেন জীবনানন্দ দাশ চারুবাবু মণি গাঙ্গুলিকে, প্রধানত এঁদেরই সূত্রে, তিনি লক্ষ্য করেছেন, 'রবীন্দ্র বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন

---

১ দ্র. 'কনখল' (১৯৬৩) ১৯শ অধ্যায় এবং 'বৃষ্টি এল'র (১৯৫৪) 'দুটি মৃত্যু' প্রবন্ধ।

ঐতিহ্য ধূসরায়িত হয়ে গিয়েছিল বড়ো বড়ো বৈদেশিক উজ্জ্বল আলোর কাছে।'

মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর পার হয়ে এসে আজও অবশ্য চারুচন্দ্রের রবীন্দ্রসাহিত্য রবীন্দ্রচর্চার দিকটাতেই আমাদের বেশি করে চোখ যায়।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র-পরিচয়

পত্র ১। কুমারখালি, শিলাইদহ॥ কুমারখালি কলকাতা থেকে ১১৯ মাইল দূরত্বে ঈস্টর্ন বেঙ্গল রেলওয়ের স্টেশন, গড়াই নদীর তীরে একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

পাবনা জেলা থেকে ১৮৭১ সালে কুমারখালি নদীয়া জেলার অধীনে আসে।

শিলাইদহ কুমারখালি থেকে ৫ মাইল দূরে পদ্মা ও গড়াইয়ের[১] সঙ্গম-স্থলের অতি নিকটে পদ্মার তীরে অবস্থিত।

দ্র 'বাংলায় ভ্রমণ' ১ম খণ্ড। ২য় সং ১৯৪০ পৃ ১০৭-১০৮।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'শিলাইদহ গোরাই ও পদ্মার মোহানায় অবস্থিত। নদী এখানে ঘুরে গেছে বলে মোহানার কাছেই স্রোতের ঘূর্ণিতে একটা মস্তবড়ো 'দহ'র সৃষ্টি হয়েছিল। তার থেকে শিলাইদহ নাম।'—'পিতৃস্মৃতি' ১৩৭৮ সং, পৃ ২৮।

'আপনার গল্প…'॥ চারুচন্দ্র লিখেছেন, দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে প্রবাসী থেকে সংস্কারার্থ ফিরে আসা তাঁর 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' গল্প সংশোধনের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। দ্র এই বই পৃ ২০৪।[২] 'পুষ্পপাত্র' (১৩১৭) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

'৯ই মাঘ পর্যন্ত…'॥ তুলনীয় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩০শে পৌষ ১৩১০ লেখা চিঠি : '৯ই মাঘ পর্যন্ত আমি এখানে আছি। রথীরা ১৭ই-১৮ই পর্যন্ত থাকিবে।'[৩] রথীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্র ছাড়া শান্তি-

---

১ গড়াই বা গড়ুই। তু. 'বেলা সাড়ে দশটার সময় গড়ুই নদীর ব্রিজ দেখা গেল' বা 'গড়ুই পেরিয়ে যখন আসল পদ্মায় পড়লুম…', ইত্যাদি। 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র ৬৭, ১২৮।

২ চারুচন্দ্রের স্মৃতিকথায় সময়টি ভুলক্রমে ১৩১২ বলে উল্লেখ আছে।

৩ কুষ্টিয়া স্টেশন দিয়েই সাধারণত শিলাইদহে আসাযাওয়া চলত। কুষ্টিয়া

নিকেতনের অধ্যাপক সুবোধ মজুমদারও তখন শিলাইদহে ছিলেন।

'শিলাইদহে...'॥ ঠাকুরবাড়ি জমিদারির বড়ো কাছারি ছিল শিলাইদহ গ্রামে। উত্তরবঙ্গের জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার পাওয়ার পর নভেম্বর ১৮৮৯ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে শিলাই-দহে থাকতে শুরু করেন।

'বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম'। শান্তিনিকেতন আশ্রমের অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠা ৭ই পৌষ ১৩০৮, ২২ ডিসেম্বর ১৯০১। ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা-দিন।

কালীপদ রায় লিখেছেন, 'ডিসেম্বর মাসে সূচনা হলেও ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের অধ্যয়নের কাজ শুরু হয়।' দ্র 'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ' ১৩৮৮ পৃ ৮।

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সাহায্য॥ শুভার্থীদের নিয়মিত বা এককালীন সাহায্য বা দান প্রথমাবধিই আসতে শুরু করেছিল। ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বাৎসরিক এক হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছিলেন। ত্রিপুরার রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ৭ চৈত্র ১৩০৯এর এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'এখন সহায়তা আপনি আসিতেছে। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ১৫০ টাকা মাত্র বেতন পান— কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া তাঁহাকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়— তিনি একদিন বোলপুরে আসিয়া নিঃশব্দে আমাকে ১০০০ এক সহস্র টাকা দিয়া গেলেন।' এই শিক্ষক মোহিতচন্দ্র সেন, পরে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।[২]

ঘাট থেকে নদীপথে পাবনা ডান দিকে রেখে শিলাইদহের ঘাটে এসে পৌঁছতে হত, এই রকম বিবরণ পাওয়া যায়।

১ শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৯ পৃ ৪৭৯-৪৮০। চিঠিপত্র ১৩, পৃ ৩৩-৩৪।

২ মোহিতচন্দ্রের এই দানের কথা প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্রেও উল্লেখ আছে। দ্র. চিঠিপত্র ৮, পত্র ১৭২।

পত্র ২। ১১ই মাঘ॥[1] ১১ই মাঘ মাঘোৎসব পুণ্যতিথি, ১৮৪৩এ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের সাম্বাৎসরিক। ১৭৫০ শকে ভাদ্র মাসে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, 'ভাদ্রোৎসবই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বাৎসরিক, তাহাই রামমোহন রায় -কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রাচীনতর। মাঘ মাসে সাম্বাৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ করা দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সাল হইতে আরম্ভ করেন।' দ্র সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' ১৯২৭ সং, পৃ ৭২।

জোড়াসাঁকোর বাটি॥ ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

আদিব্রাহ্মসমাজ[2]॥ ৫৫ নম্বর অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

১৩১০ বা ১৮২৫ শকাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। ওই বছরের মাঘ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শেষ পৃ ১৬২তে ব্রাহ্মসমাজের 'চতুঃসপ্ততিতম সাম্বৎসরিকে'র এই বিজ্ঞাপন :

আগামী ১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

ফাল্গুন ১৮২৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ওই সভার বিবরণস্থলে দেখা যায় সকালে এবং রাত্রিকালে দুই বেলাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠের পর উপাসনাদি সমাপ্ত হলে রবীন্দ্রবাবু দুই বারে দুটি উপদেশ দেন। রাত্রের উপদেশটি 'দিন ও রাত্রি' নামে এবং সকালের উপদেশটি 'মনুষ্যত্ব' নামে 'ধর্ম' ১৩১৫ গ্রন্থে সংকলিত।

---

১ দ্র এই বই পৃ ২০৩।

২ ১৮৬৬তে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর মূল বা পুরাতন সমাজ ১৮৬৮তে আদিব্রাহ্মসমাজ এই নাম-পরিবর্তন করে। দ্র. Sivanath Sastri : *History of the Brahmo Samaj* 1974 edn pp. 52, 113-118.

দ্র. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮২৫ শক পৃ ১৬৭-১৭০ ও পৃ ১৭৪-১৮০, 'ধর্ম' রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, ১৩৭৪ সং পৃ ৩৪১-৩৪৮, ৩৪৮-৩৫২।

পত্র ৩। E.B.S.R. ॥ ঈস্টর্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে ঈস্টর্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১১১ মাইল রাস্তায় প্রথম গাড়ি চালান। ১৮৭১এ এই রেল গোয়ালন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। '১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঈস্টর্ন বেঙ্গল রেলওয়ে সরকারের হাতে আসে এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সরকার নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা হইয়া ময়মনসিংহ পর্যন্ত একটি মাঝারি মাপের লাইন খুলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে এই লাইনটি নর্দার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ও অন্য কয়টি লাইন ঈস্টর্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সহিত একত্র হইয়া "ঈস্টর্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে" নামে অভিহিত হয়। এন ডব্লিউ রেলওয়ে প্রমুখ সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অন্যান্য রেলওয়েসমূহের নামকরণের সহিত সামঞ্জস্য বিধানকল্পে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 'স্টেট্' কথাটি উঠাইয়া দেওয়া হয়।' দ্র. 'বাংলায় ভ্রমণ' ১ম খণ্ড ২য় সং ১৯৪০ পৃ ৬২-৬৩।

'বিদ্যালয়ের একটি অধ্যাপক…' ॥ সতীশচন্দ্র রায়। উত্তরভারত ভ্রমণান্তে সতীশচন্দ্র ১৫ জানুয়ারি বোলপুরে ফেরেন। তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ (১৮ মাঘ ১৩১০) মাঘী পূর্ণিমার দিনে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'সতীশের তরুণ জীবন ও সম্মুখবর্ত্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নবপরিস্ফুট আশা ও পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২১ বৎসর বয়সে সমাপ্ত হইয়াছে।' দ্র 'সতীশচন্দ্র রায়'। বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১০।

সে বছরেই ১৩১০ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর সতীশচন্দ্র আশ্রমের অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম যুগের এক ছাত্র সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন : 'অল্পদিনের জন্যই তাঁকে পেয়েছিলাম।… গ্রীষ্মের

ছুটির পর আশ্রমে গিয়ে শুনলুম সতীশবাবু বসন্তরোগে আক্রান্ত। সেইজন্য বিদ্যালয় শিলাইদহে বসেছে। আশ্রমে কোদো আর কে যেন আছেন সতীশবাবুর পরিচর্য্যার জন্য। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাঁকে দেখতে গিয়েছি। বাইরে জানলা দিয়ে দেখা যায়। লেবরেটরী ঘরের মেঝের উপর যেন তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে নীরবে বসে রয়েছেন। আমাকে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে দেওয়া হল না। ক'দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে এসে শিলাইদহ যাত্রার ব্যবস্থা হল…'। 'আশ্রম-স্মৃতি'। 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' (১৩৬৮) গ্রন্থে সংকলিত।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখেছেন, 'সতীশবাবুর মতো শিক্ষক বিরল।… অল্প সময়ের জন্য তাঁকে পেয়েছিলাম— কিন্তু তাঁর কাছ থেকে তারই মধ্যে যা পেয়েছিলাম, ভোলবার মতো নয়।' দ্র. 'পিতৃস্মৃতি' ১৩৭৮ সং পৃ ১২-১৫।

শিলাইদহে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত। 'সম্প্রতি বোলপুর বিদ্যালয়ের একটি অধ্যাপকের বসন্তরোগে বিদ্যালয়গৃহে মৃত্যু হওয়ায় আমাদের সমস্ত ইস্কুলটি শিলাইদহে আনিয়াছি সে খবর বোধ হয় পাইয়াছ। ইহাতে বিস্তর ব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে—তাহাই লইয়া এখনো বিব্রত আছি। ১৫ই বৈশাখ পর্য্যন্ত বিদ্যালয় এখানেই থাকিবে।' শিলাইদহ থেকে মহিম ঠাকুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৭ ফাল্গুন ১৩১০এর পত্র।

অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন: '১৩১০ সালের মাঘে সতীশ যখন অকালে বসন্তরোগে এই আশ্রমে মারা গেলেন তখন মোহিতবাবু তাঁহার কলিকাতার অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ে আসিয়া যোগ দিলেন। তখন কিছুকালের জন্য শিলাইদহে বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছিল। মোহিতবাবু সেইখানে গিয়া বিদ্যালয়ের কর্মভার গ্রহণ করিলেন। ১৩১১ সালে গ্রীষ্মের ছুটির পর বিদ্যালয় বোলপুরে

ফিরিয়া আসিল। তখন মোহিতবাবু অধ্যক্ষ।' দ্র 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' ১৩৫৮ পৃ ২৫। মোহিতবাবু, মোহিতচন্দ্র সেন।

পত্র ৫। গিরিডি। শারীরিক অসুস্থতা ও বিদ্যালয়ের সমস্যা ছাড়াও চরমপন্থী-মডারেট নানা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের মাঝখানে স্বদেশের প্রতি কেবল 'উপস্থিত কর্তব্যে'র অনুরোধে 'স্বদেশী সমাজ' গঠনের চেষ্টায়— তার পরিকল্পনা ও রূপায়ণে দীর্ঘ শ্রাবণ মাস কাটিয়ে ১ ভাদ্র ১৩১১ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রবীন্দ্রনাথ গিরিডি যান। গিরিডিতে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।[১] এখান থেকেও সখারাম গণেশ দেউস্করের 'বৈদ্যুত তাড়নায়' তাঁকে লিখে পাঠাতে হয় 'শিবাজী উৎসব' কবিতা, ১১ ভাদ্র ১৩১১।[২] কিন্তু এই দিনেই দীনেশ-চন্দ্র সেনকে চিঠিতে লিখছেন, 'এখনো আমার কল্পনাশক্তি প্রসুপ্ত আছে।'

১। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন: শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন কলেক্টর হিসাবে রেল-কোম্পানির জন্য জমি দখল করেছেন। গিরিডিতে তাঁর হেড আপিস।' তাঁর বারগাণ্ডার বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দ্র. 'পিতৃস্মৃতি' ১৩৭৮ সং পৃ ৯৭-৯৮।

২। দ্র. 'স্বদেশী সমাজ' স্বতন্ত্র ১৩৬৯ সংস্করণে ৭ ও ১৬ শ্রাবণ ১৩১১ মিনার্ভা ও কার্জন রঙ্গমঞ্চে পঠিত দুটি প্রবন্ধ, তার বর্জিতাংশ ও রচনাপরিচয়, তদ্ব্যতীত অমল হোম -সংগৃহীত 'স্বদেশী সমাজে'র সংবিধান পৃ ৫৮-৬৪। আরো দ্র. অবলা বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, চিঠিপত্র ৬, বৈশাখ ১৩৬৪ পৃ ৯০-৯২। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা ১১ ভাদ্র ১৩১১র চিঠি, চিঠিপত্র ১০, বৈশাখ ১৩৭৪ পৃ ২৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: 'রবীন্দ্রজীবনী' ২, ১৩৯৫ সং পৃ ১২৬, ১৪৬-১৫০ ও প্রশান্তকুমার পাল: 'রবিজীবনী' ৫, ১৩৯৭ পৃ ২০১-২০৩।

ত্রিপুরার মধ্যমরাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর গিরিডিতে এ যাত্রায় তাঁর অতিথি হয়ে এসেছিলেন। তিনি স্মরণ করেছেন, 'আমাদের অবস্থান সময়েই কবির বিখ্যাত "শিবাজী" লেখা হয়েছে— আবৃত্তি করে আমাদের শুনিয়েছেন ও সেটি বঙ্গদর্শনে ছাপাবার জন্য দিয়েছেন...'। দ্র 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' ১৩৬৮ পৃ ৯০।

'মধুর মধুর ধ্বনি বাজে' ॥ রচনা শিলাইদহ ৫ আশ্বিন ১৩০২। কাব্য-গ্রন্থাবলী ১৩০৩ পৃ ৪৩০, কাব্যগ্রন্থ ১৩১০ পৃ ৮১।

চারুচন্দ্র জানিয়েছেন, 'কাশীতে সাহিত্য-পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে সেখানকার সেক্রেটারির অনুরোধে তাঁকে উদ্‌বোধনের উপযোগী একটি গান লিখে দেবার নির্বন্ধ করলে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, "ওরে বাস্ রে! গান লেখবার সাধ্য কি আমার আছে আর! গান-টান আর আমার আসে না—চলে গেছে মোর বীণাপাণি (চৈতালি), আমার একটা পুরানো গান আছে—

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়কমল বন মাঝে

সেই গানটা দিয়ে চালিয়ে দেবেন।" আমি ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম।' দ্র. এই বই পৃ ২০৩।

এই স্মৃতিতে দুটি বিভ্রম আছে। প্রথম, চিঠির সাক্ষ্যে দেখা যায়, গানটির কথা রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, সাক্ষাতে বলেন নি। দ্বিতীয়, বারাণসীস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শাখা গঠিত হয় চিঠির অন্যূন সাড়ে-চার বছর পর ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২২শে ফাল্গুন। দ্র. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৬ পৃ ১৯৬।

পত্র ৬। শান্তিনিকেতন গ্রন্থাবলী ॥ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা ও সেই সঙ্গে অপরাপর ধর্মপ্রসঙ্গ পুস্তক। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস -প্রকাশিত এই সিরিজ বা গ্রন্থাবলীতে ক্রাউন ১/২৪ সাইজের ছোটো ছোটো বইয়ে 'শান্তিনিকেতন' 'ভক্তবাণী' 'কবীর' 'উপনিষৎসংগ্রহ' ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভক্তবাণী' তিন খণ্ড রবীন্দ্রনাথের নামেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে। 'উপনিষৎসংগ্রহ' দু খণ্ড 'মূল, সংক্ষিপ্ত সরল সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ' বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রণীত, যদিও মানসী পত্রিকা কার্তিক ১৩১৮ সংখ্যায় 'বঙ্গসাহিত্য, ১৩১৭ সাল' নামে সারদাচরণ

মিত্রের লেখা 'রিপোর্ট'এ 'শ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "উপনিষদসংগ্রহ" সানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন' বলে উল্লেখ আছে। ক্ষিতিমোহন সেন চার খণ্ডে 'কবীর' প্রকাশ করেন। তিনিও প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে লিখেছেন, 'যাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ করাই হইত না, সেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।'

'শান্তিনিকেতন' ১৩১৫ থেকে ১৩২১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রদত্ত ভাষণমালা, ক্রাউন ১/২৪ আকারের সতেরো খণ্ডে সংকলিত ১৯০৯-১৯১৬। ১০ শ্রাবণ ১৩১৬ তারিখের চিঠিতে কাদম্বিনী দেবীকে '"শান্তিনিকেতন" নামক আমার ধর্ম্মোপদেশের বইগুলি শীঘ্রই' পাঠিয়ে দেবার কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতী, আষাঢ় ১৩১৬য় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের এই বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করা যায় :

শান্তিনিকেতন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধে ভূষিত। অষ্টম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য চারি আনা।

ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬র বিজ্ঞাপনে দেখা যায় 'শান্তিনিকেতন' দশম খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ভারতী, বৈশাখ ১৩১৭য় 'শান্তিনিকেতন' নবম ও দশম খণ্ডের এই সমালোচনা প্রকাশিত হয় :

শান্তিনিকেতন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি খণ্ড চারি আনা মাত্র। রবীন্দ্রবাবুর দার্শনিক প্রবন্ধগুলি বাঙলা সাহিত্যে অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। সহজ ভাষায় লিখিত প্রাচ্য আদর্শাদির সুমধুরআলোচনা যথার্থই শান্তির সঞ্চার করে। দ্র পৃ ১৭৭।

গান॥ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ.। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ১৯০৯ পৃ ৪+৪১২+১৪ এলাহাবাদ 'ইণ্ডিয়ান প্রেসে' শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

'গানের ভূমিকা…'॥ রবীন্দ্রনাথ 'গানের ভূমিকার ত কোনো প্রয়োজন দেখি না' লিখলেও 'গানে'র এই ইণ্ডিয়ান প্রেস -সংস্করণে 'প্রকাশকের নিবেদন' রূপে এই ভূমিকা ছাপা হয়েছিল :

প্রকাশকের নিবেদন

বর্ত্তমান গ্রন্থে কবির কিশোরকালের সকল শ্রেষ্ঠ গান হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যত গান রচনা হইয়াছে, সমস্ত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তাঁহার অসংখ্য বিক্ষিপ্ত রচনা অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা গিয়াছে।

সঙ্গীত সুরের অপেক্ষা রাখে। সুরহীন কথা অসম্পূর্ণ। যে সকল পাঠক এই সকল গানের সুরের সহিত পরিচিত, তাঁহারা ত আনন্দ পাইবেনই, আর যাঁহারা পরিচিত নহেন, তাঁহারাও বঞ্চিত থাকিবেন না; কারণ কবির গান প্রায়ই ছন্দময় ও কবিত্বরসপূর্ণ। অনেক গানে এখনো সুর বসানো হয় নাই, সঙ্গীতজ্ঞ পাঠক সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

পাঠকের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান সংস্করণে গানগুলিকে ভাব বা বিষয়ের সঙ্গে সমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুঞ্জিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যথা—প্রকৃতি-সঙ্গীত, ঋতু-সঙ্গীত, ভাবপ্রধান-সঙ্গীত ইত্যাদি। বিভাগ সম্পূর্ণ করিবার জন্য বাল্মীকি প্রতিভা ও মায়ার খেলার গান গুটিকয়েক বিবিধ সঙ্গীতের মধ্যে দ্বিতীয়বার সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও জাতীয়-সঙ্গীতকেও ভাব অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

তাড়াতাড়ি কার্য্য শেষ করিতে গিয়া বহু ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত

ক্রটি অনিবার্য্য হইয়াছে। পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিয়া এই সম্পূর্ণ সঙ্গীত পুস্তকের সমাদর করিবেন আশা করি। এই পুস্তকে সাতশত সাতাশটি গান আছে।

'গান' প্রকাশিত হবার অব্যবহিত সময়ে প্রবাসীতে মুদ্রারাক্ষস নামে চারুচন্দ্র নিজেই বইয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লেখেন, আলোচনাটি এখানে উদ্ধৃত করি :

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে কবিবরের কৈশোরকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যত গান রচিত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই আছে। ইহাতে ৭২৭টি গান সংগৃহীত হইয়াছে। এমন সম্পূর্ণ সংগ্রহ ইতিপূর্ব্বে আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতা অপেক্ষা গানের দ্বারা সাধারণের নিকট অধিক পরিচিত। তাঁহার গান ধর্ম্মসভায়, জাতীয় উৎসবে, পরিবারে, মজলিসে, হাটে, মাঠে সর্ব্বত্র সমান আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, সেই সকল গানের মনোজ্ঞ সংগ্রহপুস্তক আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। ছাপা পরিষ্কার ; এণ্টিক কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৪০৫ পৃষ্ঠা। সুন্দর মনোরঞ্জক বাহ্যদৃশ্য। মূল্য দুই টাকা। উপহার দিবার উপযুক্ত। পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো সংস্করণ এমন সম্পূর্ণ ও সুন্দর হয় নাই। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৬ পৃ ৫২৩।

'গানে'র কথাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ইহা পুরাতন সামগ্রী'। আগের আগের সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের গানের সংগ্রহ যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল কালানুক্রমে তার বিবরণ এইরকম

১ রবিচ্ছায়া। যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র প্রকাশিত। বৈশাখ ১২৯২ পৃ ২ + ১৪ + ১৭১ গান সংখ্যা ২০১।

২ গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা। বৈশাখ ১৩০০ পৃ ২ + ২৬ + ৪০৭ গান সংখ্যা ৩৫২।

৩ কাব্য গ্রন্থাবলী। আশ্বিন ১৩০৩ পৃ ৪৭৬ গান অংশ পৃ ৪২৯-৪৭০, গান সংখ্যা ২৮০।

৪ কাব্যগ্রন্থ ৮ম ভাগ। গান খণ্ড। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত ১৩১০ পৃ ৬+২৫+৩৩৮।

৫ গান। যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রকাশিত। আশ্বিন ১৩১৫ পৃ ১৬+৪০০।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের 'গান' রবীন্দ্রনাথের গানের ষষ্ঠ সংস্করণ।

'নতুন গান…' ॥ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ইহাতে অনেকগুলি নূতন গান দেওয়া হইয়াছে।' ১৬ ভাদ্র ১৩১৬ - ১২ পৌষ ১৩১৬র মধ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের পনেরোটি নতুন লেখা গান ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ বইয়ে 'নূতন গান' বিভাগে পৃ ৪০৭-৪১২ এই ছয় পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়।

'সখি প্রতিদিন এসে ফিরে যায় কে!' ॥ ৫+৫ মোট ১০ ছত্রের গান, রচনা ১০ আশ্বিন ১৩০৪। 'বীণাবাদিনী', বৈশাখ ১৩০৫ পৃ ২৭১-২৮১ : মিশ্র ছায়ানট, একতালা এই রাগতাল অনুযায়ী স্বরলিপি সহ মুদ্রিত। 'কল্পনা' (বৈশাখ ১৩০৭) কাব্যে 'সকরুণা' নামে সংকলিত, রাগনির্দেশ : আলেয়া। 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে (প্রকাশ আশ্বিন ১৩০৩) স্বভাবতই গানটি নেই। কাব্যগ্রন্থ ৮ম ভাগ (১৩১০) পৃ ১৮, রাগনির্দেশ : আলেয়া। যোগীন সরকারের প্রকাশিত 'গান' (১৩১৫) পৃ ১৬, রাগনির্দেশ : আলেয়া।

কাব্য গ্রন্থাবলী ॥ রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসংগ্রহ পুস্তক। শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশক। কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ১৫ই আশ্বিন ১৩০৩ পৃ ৪+৮+৪৭৬।

ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হইল। এজন্য আমার স্নেহভাজন প্রকাশকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।'

যোগীন সরকারের গান ॥ 'গানে'র কপি হাতে পেয়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে বোলপুর থেকে ২রা অগ্রহায়ণ ১৩১৫ তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'আপনি পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বইখানি যে এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়াছেন সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন।'

রথী ॥ প্রায় সাড়ে তিন বছর পর রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরছেন ইলিনয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে।

কবীর ॥ ক্ষিতিমোহন সেন -প্রণীত 'কবীর' ১ম খণ্ড এই চিঠির বৎসরাধিক-কাল পরে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড ভূমিকা ১ আশ্বিন ১৩১৭ (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১০)। প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৭ এ বিজ্ঞাপিত :

> কবীর (প্রথম খণ্ড)—শান্তিনিকেতন গ্রন্থপর্যায়ের অন্তর্গত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ডবল ক্রাউন ২৪ ভাঁজের ১৩২+১৬ পৃষ্ঠা মূল্য ।৵০

ওই মাসেই 'ভারতী'তে সমালোচনা-সূত্রে লেখা হয় : 'ক্ষিতিবাবু বিস্তর পরিশ্রম করিয়া বহু নূতন দোঁহা সংগ্রহ করিয়াছেন,— অনুবাদগুলির ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল...'। ভারতী, কার্তিক ১৩১৭ পৃ ৬১৭।

'কবীর' চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ডেরই আখ্যা পত্রে 'শান্তিনিকেতন / কবীর/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর...' এই ক্রমে পরিচয় মুদ্রিত আছে। মূল্য যথাক্রমে ছয় আনা, ছয় আনা, ছয় আনা ও চার আনা। প্রথম তিন খণ্ডে সতীশচন্দ্র মিত্র, চতুর্থ খণ্ডে পাঁচকড়ি মিত্রের নাম প্রকাশক রূপে আছে। চারটি খণ্ডই কান্তিক প্রেসে হরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত। প্রথম খণ্ড 'অগ্রজ ও গুরু পরলোকগত অবনীমোহন সেন মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতিতে', দ্বিতীয় খণ্ড 'পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে' (তারিখ ১২. ১১. ১৭.) এবং তৃতীয় খণ্ড 'ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে' উৎসর্গিত হয়। তৃতীয় খণ্ডের উৎসর্গের তারিখ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

পত্র ৭। 'ঋদ্ধি'॥ ঋদ্ধি (বা শ্রীবৃদ্ধি ও সমুন্নতি)। 'চরিত্র-গঠন'-প্রণেতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেস। ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত। পৃ ২+৫+২৬০+('চরিত্র-গঠন' সম্বন্ধে অভিমত) ৪। মূল্য ১৷০। ভূমিকা এলাহাবাদ, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩১৫।

ভূমিকায় লেখা হয়েছে, 'যাহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি জাতীয় সম্পদ ও দেশীয় ধনসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয় "ঋদ্ধি"তে তাহারই উপায় ও সঙ্কেত দৃষ্ট হইবে।' '"চরিত্র-গঠন" সম্বন্ধে নানা অভিমতে'র অনুরূপ 'ঋদ্ধি'র জন্যও প্রকাশক যশস্বী ব্যক্তিদের অভিমত সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬য় 'ঋদ্ধি'র এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় :

ঋদ্ধি

চরিত্রগঠন-প্রণেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। বাংলা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। গার্হস্থ্যশাস্ত্র (Domestic Economy) সম্বন্ধে একমাত্র পুস্তক। ঘরে ঘরে ইহা পঠিত হইলে দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচিবে। দরিদ্র বাঙালী সঞ্চয় শিখিবে। জীবনযাত্রা সরল হইবে। ছাপা কাগজ উত্তম; বাঁধাই বিলাতীর মত সুদৃশ্য। মূল্য ১৷০ মাত্র। সর্ব্বত্র সবিশেষ প্রশংসিত। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অভিমত দেখুন—

অতঃপর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং প্রবাসী, ভারতী ও হিতবাদী পত্রিকার অভিমত বিজ্ঞাপনে উদ্‌ধৃত করে দেওয়া হয়।

প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায় 'ঋদ্ধি' বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছিল (দ্র. প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৬, পৃ ৫২৩-৫২৪ ও

ভারতী, কার্তিক ১৩১৬, পৃ ৪০৪-৪০৫)। প্রবাসীর আলোচনাটি করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ভারতী মন্তব্য করেছিলেন, 'এই শ্রেণীর গ্রন্থ যত অধিক প্রকাশিত হয় ততই দেশের মঙ্গল।...''ঋদ্ধি''র কয়েকটি মোটামুটি কথা কার্ডবোর্ডে লিখিয়া বসিবার ঘরে প্রত্যেকের ঝুলাইয়া রাখা উচিত।'

অজিত ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী।

'তোমাদের বইগুলি...' ॥ এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী প্রকাশক চিন্তামণি ঘোষের পক্ষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে ১৪ই জুলাই ১৯০৮ এর দুটি এবং ২১শে জুন ১৯০৯এর একটি— মোট তিনটি এগ্রিমেণ্ট মোতাবেক লেখক একটি চুক্তিতে তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহের, এই দিনের অপর চুক্তি দ্বারা তাঁর ষোলো খণ্ড গদ্যগ্রন্থাবলী, ছোটোগল্পগুলি এবং 'গোরা' সহ অন্যান্য উপন্যাসের শর্তসাপেক্ষ প্রকাশ ও বিক্রয়ের অধিকার দান করেন। ২১ জুনের অপর এগ্রিমেণ্টে লেখক প্রকাশককে তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', 'প্রহসন', 'রাজা প্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশ', 'সমাজ', 'শিক্ষা', 'শব্দতত্ত্ব', 'ধর্ম্ম', সম্পূর্ণ 'গল্পগুচ্ছ', 'রাজর্ষি', 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'শারদোৎসব', 'মুকুট' ও 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থসমূহের এবং পরবর্তী কালের রচনাসমূহের শর্তানুযায়ী প্রকাশ-বিক্রয়ের অনুমতি দেন। তিনটি চুক্তির ক্ষেত্রেই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশকের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

তিনটি চুক্তিই ১লা এপ্রিল ১৯১৪র নতুন এগ্রিমেণ্ট দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। নতুন চুক্তিতে ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ এবং ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলিকাতা রবীন্দ্রনাথের সাকুল্যে সাতাশিখানি

বইয়ের প্রকাশ-বিক্রয়ের কর্তৃত্ব লাভ করেন।

সত্যেন্দ্র ॥ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শৈলেশ ॥ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। মজুমদার লাইব্রেরির পুস্তক প্রকাশক।

মণিলাল ॥ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন ॥ ভারতী, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩১৬ সংখ্যায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রণীত অষ্টম খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ ছাড়া আরো তিনখানি বইয়ের সম্বন্ধে :

রাজা ও রাণী। রাজর্ষি। নৈবেদ্য

রবিবাবুর এই গ্রন্থগুলি বহুদিন বাজারে ছিল না। সুন্দরভাবে নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

—এই সংবাদ ছিল। অপিচ, ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬ সংখ্যায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা ব্যাপী বিজ্ঞাপনে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সদ্য-প্রকাশিত বইসমূহের এই বিস্তৃত সম্প্রচার প্রকাশিত হয় :

গোরা

আগাগোড়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপন্যাসের শেষ কি তাহা জানিবার জন্য আর কাহাকেও অধৈর্য্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে না। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

চয়নিকা

কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসমুদ্র হইতে রত্নরাজি বাছিয়া বঙ্গবাণীর অপরূপ কণ্ঠমালা রচিত হইয়াছে। কবিবরের সমগ্র কাব্যগ্রন্থ পাঠে যাঁহাদের সময় বা সুবিধা নাই তাঁহাদের পক্ষে এই চয়নিকা (selection) বিশেষ উপযোগী। ইহার মধ্যে কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিই স্থান পাইয়াছে। ইহাতে আটখানি মৌলিক বহুবর্ণে

মুদ্রিত পরিকল্পনা চিত্র ও কবিবরের একখানি আধুনিক চিত্র আছে।[১] আর্ট কাগজে ছাপা সুন্দর বাঁধাই রাজ সংস্করণের মূল্য চারি টাকা, সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা।

গান

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গান'এর নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা ইহাতে অনেক বেশি গান আছে—এবং এখনকার রচিত গানগুলিও দেওয়া হইয়াছে। এমন সমগ্র সম্পূর্ণ সংগ্রহ আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা বাঁধাই মনোরম। উপহার দিবার যোগ্য। মূল্য দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যগ্রন্থাবলী

বিচিত্র প্রবন্ধ ১।০	সাহিত্য ৷৶০	প্রাচীন সাহিত্য ॥০
লোকসাহিত্য ।৶০	আধুনিক সাহিত্য ॥৶০	প্রহসন ॥৶০
হাস্যকৌতুক ।৶০	ব্যঙ্গকৌতুক ।৶০	সমূহ ॥০
প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ৸০	রাজা প্রজা ১৲	স্বদেশ ॥০
সমাজ ৸০	শিক্ষা ॥০	শব্দতত্ত্ব ॥০
	ধর্ম্ম ৸০	

গল্পগুচ্ছ (নূতন সংস্করণ)

পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চম খণ্ডে অনেক আধুনিক নূতন গল্প আছে। এমন বিচিত্র সুন্দর ছোট ছোট গল্প জগতের কোনো ভাষায় নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲

রাজর্ষি

প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নূতন সংস্করণ। বালক ও ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী নির্দ্দোষ সুন্দর করুণ উপন্যাস। মূল্য ৸০

---

১ 'চয়নিকা'য় (১৩১৬) সাতখানি রঙিন চিত্র এবং রবীন্দ্রনাথের একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়।

শান্তিনিকেতন

সরল সহজ ঘরের কথায় ধর্ম্ম আলোচনা। পড়িলে উপাসনার কাজ হয়— অন্তর পবিত্র পুলকিত হয়। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। দশম খণ্ড অবধি বাহির হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০

ভক্তবাণী

জগতের সকল ভক্তের ভগবদ্‌বিষয়ক চিন্তা ও উক্তির মনোজ্ঞ সংগ্রহ পুস্তক। প্রতি খণ্ডের মূল্য চার আনা। দুই খণ্ড বাহির হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

শিশু ৸০ কথা ও কাহিনী ৸০

মুকুট (নাটিকা) ।০

বিদ্যাসাগরচরিত

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। মহাপুরুষের জীবনীর চমৎকার আলোচনা। বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য। মূল্য চারি আনা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নাটকাবলী

বিসর্জ্জন

রাজর্ষি উপন্যাসের আখ্যান নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত। ইহা কবিবরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। মূল্য ॥০

রাজা ও রাণী

সর্ব্বজনসমাদৃত করুণ নাটক। গানে হাস্যে কবিত্বে করুণরসে বিচিত্র। নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য বারো আনা।

শারদোৎসব

অতি সুন্দর সরস নাটিকা শরৎ ঋতুর আগমনে মানবের প্রাণে যে অকারণ পুলক সঞ্চার হয়, সেই সরস মধুর ভাবটিকেই কবির অমৃতমুখী

প্রতিভা আকার দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। ইহার একএকটি গান একএকটি রত্ন বিশেষ— ভাবসম্পদে অতুলনীয়, প্রাণ মাতাইয়া দেয়, মন গলাইয়া দেয়, পুলকে হৃদয় ভরিয়া ওঠে। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদ্বয়ের পরিকল্পিত দুখানি ছবি আছে।[১] মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

নৈবেদ্য ৷৷০ খেয়া ১৲

ভগবদ্‌বিষয়ক অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতাপুস্তক। ইহারা দুঃখের সান্ত্বনা, বিপদের সহায়, সম্পদের বন্ধু, উৎসবের সহচর হইবার একান্ত উপযুক্ত।

সংকল্প ও স্বদেশ

কবিবরের স্বদেশ সম্পর্কীয় যাবতীয় কবিতা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অনেক কবিতা আজকাল মুখে মুখে শোনা যাইতেছে। মূল্য আট আনা।

গীতলিপি

রবিবাবুর যত গান আছে তাহার নির্দ্দোষ স্বরলিপি বাহির হইতেছে, প্রথম খণ্ডে কবিবরের নূতন কতকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি আছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৶০

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

১ 'রবি-রশ্মি'র 'শারদোৎসব' অধ্যায়ে চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'আমি যখন কলিকাতার ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলাম, তখন আমি এই পুস্তক প্রকাশ করি। ইহাকে লোচন-রোচন করিবার জন্য ইহার আকার করি একটু নূতন ধরণের— প্রাচীন পুঁথির আকারের, এবং আমি নিজে গিয়া অনুরোধ করিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া ইহার প্রচ্ছদের ও মুখপাতের জন্য দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া লই।' 'রবি-রশ্মি' —পশ্চিম ভাগে' ৫ম সং পৃ ৮৮।

'চয়নিকা' ॥ 'চয়নিকা' চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রস্তুত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং-হাউস প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ।

প্রবাসী ও ভারতীর কার্তিক ১৩১৬ সংখ্যাতেই 'চয়নিকা' সমালোচিত হয়, কাজেই 'চয়নিকা' এই চিঠির অল্পদিন মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। দ্র প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৬ পৃ ৫২২ ও ভারতী, কার্তিক ১৩১৬ পৃ ৪০৫ যথাক্রমে মুদ্রারাক্ষস ও সত্যব্রত শর্মা -সমালোচিত। প্রসঙ্গত, মুদ্রারাক্ষস চারুচন্দ্রের ছদ্মনাম।

নূতন গানগুলি ॥ ১৬ ভাদ্র ১৩১৬ - ১২ পৌষ ১৩১৬র মধ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের পনেরোটি নতুন গান ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণে সংকলিত হয়। যথাক্রমে

শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে ১৮ ভাদ্র ১৩১৬
আমার মিলন লাগি তুমি আস্‌চ কবে থেকে ১৬ ভাদ্র ১৩১৬
এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার ১৯ আশ্বিন ১৩১৬
দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
এস হে এস, সজল ঘন, বাদল বরিষণে! ১৭ ভাদ্র ১৩১৬
আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান ১৬ ভাদ্র ১৩১৬
দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও ১৬ ভাদ্র ১৩১৬
আবার এরা ঘিরেছে মোর মন ১৬ ভাদ্র ১৩১৬
আসন-তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব! ১০ পৌষ ১৩১৬
আলোয় আলোকময় কর হে ২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬
মহারাজ, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর-মাঝে!
যদি ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই চঞ্চল অন্তর
অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন আশা করি ১২ পৌষ ১৩১৬
জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি, জয় তোমার করুণা

'রথী এসেছে...'। এপ্রিল ১৯০৬এ রথীন্দ্রনাথ কৃষিবিদ্যা শিখতে আমেরিকা গিয়েছিলেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে ফেরার পথে ইয়োরোপে কয়েক মাস কাটিয়ে পূর্ব চিঠির বয়ান অনুযায়ী রথীন্দ্রনাথ ২০ ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ কলকাতায় এসে পৌঁছন। দ্র. পত্র ৯-এর টীকা এবং *On the Edges of Time* গ্রন্থে Outward Bound ও Homeward Bound দুই অধ্যায়। ১৯৮১ সং পৃ ৬৫- ৬৭ ও পৃ ৭১-৭৩।

পত্র ৮। 'চয়নিকা'। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ.। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। এলাহাবাদ 'ইণ্ডিয়ান প্রেসে' শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত ১৯০৯ পৃ ৪+১০+৪৫৯+৮

মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র অনুরূপে এই 'চয়নিকা'তেও বিবিধ বিষয়ক্রমে কবিতা বিন্যস্ত হয়েছে। কবিমানস, রসরূপ, রূপক, বিশ্বপ্রকৃতি, মানব, কণিকা, অতীত, কথা, ভূমা ও পরিণাম এই দশ পর্যায়ে ২৫৮টি কবিতা এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে। মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য একটি করে নতুন প্রবেশক কবিতা ছিল, 'চয়নিকা'র জন্যও 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' ইত্যাদি বারো ছত্রের একটি মুখপাতের কবিতা ব্যবহৃত হয়, 'কাব্যগ্রন্থে'র রূপক বিভাগের এটি প্রবেশক কবিতা। মূলত এই সবকয়টি প্রবেশক লেখা, সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি কবিতা নিয়ে পরে 'উৎসর্গ' (১৩২১) কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

'চয়নিকা' চারুচন্দ্রের প্রকাশিত, চারুচন্দ্রের সম্পাদিত গ্রন্থও বটে, অনেকবারই তিনি 'আমার সম্পাদিত চয়নিকা' বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

১। কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন, 'চয়নিকা'র যে প্রথম সংস্করণটি ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়, তার কবিতা সংকলন করেন চারুচন্দ্র।' দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'। রবীন্দ্রভাবনা, বৈশাখ ১৩৮৫ পৃ ৪৮।

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে বইয়ের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভালো বলেছেন, নির্বাচন কেমন বলেন নি, তাতে মনে হয় কবিতা নির্বাচনে তাঁরও হয়তো হাত ছিল, অন্তত তার পূর্ণ দায়িত্ব চারুচন্দ্রের ছিল না।

'চয়নিকা'র প্রারম্ভে পাঁচ স্তবকের একটি 'প্রকাশকের নিবেদন' ছাপা হয়েছিল।

'ছবি ভালো হয় নি···' ॥ কথার তাৎপর্য ছবির ছাপা ভালো হয় নি। মূল ছবির সঙ্গে তুলনাক্রমে হয়তো তাঁর মনে হয়েছে।

'চয়নিকা'র জন্য চারুচন্দ্রের লেখা 'প্রকাশকের নিবেদন' অংশটি এখানে সংকলন করে দেওয়া যায় :

প্রকাশকের নিবেদন

দুই শ্রেণীর পাঠকের জন্য কবির কাব্য হইতে চয়ন করিয়া দিবার প্রয়োজন হয়। এক, যাঁহারা কবির রচনা পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে কতকগুলি ভাল নমুনা দেখাইয়া কবির কাব্যের সহিত পরিচয়ের ভূমিকা সাধন করিয়া দেওয়া। আর এক, যাঁহারা কবির রচনা ভালবাসেন তাঁহাদের সর্ব্বদা উপভোগের জন্য এক জায়গায় কতকগুলি ভাল জিনিষ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া।

শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠকদের সকলকেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করিতে পারেন এমন চয়নকর্ত্তা কোথাও মিলিবে না। আমরাও এ অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইব এমন আশা করি না। আমরা এমন অনেক কবিতাকে এ গ্রন্থে নিশ্চয় স্থান দিয়াছি যাহা কবির কোনো না কোনো ভক্তের নিকট মাঝারি বা তাহার চেয়ে নীচের দরের জিনিষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে— এবং এমন অনেক কবিতা ছাড়িয়াছি যাহা তাঁহাদের কাছে বিশেষ আদরের। ইহাতে এই প্রমাণ হয় কবি বিচিত্র লোককে বিচিত্র ভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন— তিনি অনেকের কাছে অনেক রকমে পরিচিত। সে হিসাবে প্রত্যেক পাঠক নিজেই নিজের বিশেষ

ব্যবহারের জন্য চয়ন করিয়া না লইলে তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই।

তাই বলিয়া প্রত্যেক পাঠকের রুচির মধ্যে একেবারে আকাশ পাতাল প্রভেদ হইবে এমন আশঙ্কাও করি না। বিশেষত কোনো বিশেষ কবি যে-পাঠকশ্রেণীর নিকট বিশেষভাবে প্রিয়, নিঃসন্দেহেই তাঁহাদের মধ্যে রস-গ্রহণ-শক্তির একটা গভীরতর ঐক্য আছে। অতএব আমরা যে-কবির কাব্যের অনুরাগী তাঁহার কাব্য হইতে যখন চয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন অন্য অনুরক্তগণের সহিত যে আমাদের বিশেষ বিরোধ ঘটিবে এমন শঙ্কা করিবার হেতু নাই। চয়নের ভার সৌভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে পড়িয়াছে বলিয়া যে আমরা নিজেদের কেনো পীড়া দিই নাই এমন কথা পাঠকেরা মনে করিবেন না। অনেক কবিতা ছাড়িয়াছি যাহার দুঃখ এখনো মন হইতে যায় নাই, যে জন্য এখনো মনে দ্বিধা রহিয়া গিয়াছে।— ইহার মধ্যে এমন অনেক কবিতা দিয়াছি যাহা এই কবির কাব্যের বিশেষ বৈচিত্র্যের পরিচয় দিবার জন্যই উদ্ধৃত হইয়াছে।

সংগৃহীত কবিতাগুলিকে আমরা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছি। চয়নকর্ত্তার কাজের সুবিধা লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগকে এই শ্রেণীবিভাগ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ইহাতে পাঠকদের কোন সুবিধা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কবিতা জিনিষকে শ্রেণীতে ভাগ করা সহজ নহে। এই শ্রেণীভাগ সম্বন্ধে পাঠকদের সকলের সঙ্গে যে আমাদের মতে মিলিবে তাহাও আশা করি না— মতে মিলিবার প্রয়োজনও নাই। এই ভাগ যখন কবির কৃত ভাগ নহে, তখন পাঠকগণ যদি পছন্দ না করেন তবে ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

পরিশেষে প্যাল্‌গ্রেভ তাঁহার 'স্বর্ণগীতিভাণ্ডার' প্রকাশের সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন সেই মহাজনবাক্য অনুসরণ করিয়া আমিও এই

বলিয়া উপসংহার করি যে,—এ চয়নের মধ্যে ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত অনেক ভুলত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে।[১] সেজন্য নিন্দাভাজন হইতে হইবে,—উপায় নাই। তবে পাঠকসমাজের নিকট হইতে এইটুকু ভরসা রাখি যে "গোলাপ ফুলকে ভালবাসিলে পদ্মফুলকে অবজ্ঞা করিবার তাঁহাদের কোন কারণ নাই।" চয়নিকায় যদি গোলাপ ফুল বাদ গিয়া থাকে, অন্য কোন ফুল দিয়াই তো সাজি ভরিয়াছি, কবিভক্তেরা অন্ততঃ এ কথার সাক্ষ্য নিশ্চয়ই দিবেন।

'এই ছবিগুলোর জন্যই··· নন্দলালের পটে যে-রকম দেখেছিলুম···'। নন্দলালের পটে॥ নন্দলাল বলেছেন, বাঁকুড়ার এক সাধুকে তাঁর ইষ্টদেবী তারামূর্তির ছবি করে দিয়েছিলেন তিনি, সম্ভবত অবনীন্দ্রনাথের সাজশে সে ছবি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোর লালবাড়ীতে গিয়ে দেখা করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'চয়নিকা'র ছবির জন্য বরাত করেন। দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল: 'ভারতশিল্পী নন্দলাল' ১৯৮২ পৃ ৩৩৫-৩৩৬, ৩৭৬-৩৭৯।

আগেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে 'শিবতাণ্ডব' ও 'নকল বুঁদি'র ছবি তিনি এঁকেছিলেন। নতুন করে আঁকলেন আরো পাঁচখানি।

'এই ছবিগুলো'॥ 'চয়নিকা'র মোট সাতখানি নন্দলালের আঁকা ছবি, কবিতা-ছত্র উদ্ধৃত করে ছবির নাম দেওয়া, যথাক্রমে: ১ 'ভূমিকা'র 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে', ২ 'যাত্রা'

---

১ পল্‌গ্রেভ অবশ্য ইচ্ছা বা অনিচ্ছাজনিত কোনো ত্রুটির প্রসঙ্গ করেন নি—কবিতা নির্বাচনে তাঁর সুবিহিত নীতি ছিল এবং কবিতা সম্বন্ধে স্পষ্ট অভিমত। "স্বর্ণগীতিভাণ্ডারে"র স্বর্ণ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, "Poetry gives treasures "more golden than gold", leading us in healthier ways than those of the world..."।

কবিতার 'কেবল রব মুখের পানে চাহিয়া', ৩ 'হৃদয়-যমুনা'র 'যদি মরণ লভিতে চাও। এস তবে ঝাঁপ দাও...', ৪ 'পরশ পাথরে'র 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর', ৫ 'বৈশাখ' কবিতার 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ' ('শিবতাণ্ডব' নামে খ্যাত ছবি), ৬ 'নকল গড়' কবিতার '...একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়' এবং 'শেষ খেয়া'র 'আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিন-শেষের শেষ খেয়ায়'। ৫ এবং ৬ সংখ্যক ছবি রঙিন, অপরগুলি একরঙা।

নন্দলালের ১৯০৯এর জলরঙে আঁকা পোস্টকার্ড সাইজের 'দীক্ষা' ছবি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন 'গীতাঞ্জলি'র একটি গান (৫০ সংখ্যক: 'নিভৃত প্রাণের দেবতা/যেখানে জাগেন একা')। রচনা ১৭ পৌষ ১৩১৬।

'দেদার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্চি... এখনি এক বক্তৃতা অভিযানে...' ॥

দেদার বক্তৃতা বা ২৮ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতার এই মাত্র সংবাদপত্র বিবরণ লক্ষ্য করা গেছে—

১৮ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাংলায় বিজ্ঞান আলোচনা বিষয়ে বক্তৃতাসভায় বাবু সারদাচরণ মিত্র ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীঘাপতিয়ার কুমার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর পরিষদের ছাত্রসভায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন। পত্রিকা বিবরণ এইরকম: The student members of the Parishad passed a most enjoyable evening on Sunday, the 26th September last, when Babu Rabindra Nath Tagore entertained them with an instructive lecture in which he explained in his usual eloquent and felicitous manner the aims and objects of the

students' section for the foundation of which he was primarily responsible.— অমৃতবাজার পত্রিকা ৪ অক্টোবর ১৯০৯।

সিটি কলেজ হলে রামমোহন রায় ৭৬তম মৃত্যুবার্ষিকী সভায় বক্তৃতা। এই সভা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের বিবরণ :
There was a large and representative gathering... as the crowd in the upper storey was enormous, an overflow meeting was held downstairs. Mr. Rabindra Nath Tagore presided over the main meeting, while Dr. Prankrishna Acharya presided over the other... Pandit Sakharam Ganesh Deuskar made a stirring appeal for funds to preserve and protect the house in Radhanagar where the late Raja was born. Speeches were also delivered by Mr. B. C. Ghose and Babus Peary Mohan Chowdhury and Dhirendra Nath Chowdhury dealing with the qualities of head and heart of the late Raja. Mr. Rabindranath Tagore then delivered a long speech in Bengali.— অমৃতবাজার পত্রিকা ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৯।

পত্র ৯। 'আবার সেই পদ্মাতটে...' ইত্যাদি। পত্র ৭এর সাক্ষ্য অনুযায়ী রথীন্দ্রনাথ আমেরিকার পাঠ সমাপ্ত করে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ কলকাতায় ফেরেন, চিঠিতে পাওয়া যায়, 'রথী এসেছে। তাকে নিয়ে ব্যস্ত আছি।' রথীন্দ্রনাথকে ১০ই অক্টোবর ১৯০৯ পদ্মাতটে শিলাইদহে যান রবীন্দ্রনাথ। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ৯ অক্টোবর লেখেন, 'অজিত, আমি আগামীকাল প্রত্যুষেই রথীকে নিয়ে

শিলাইদহে যাচ্ছি। বিশেষ কাজ আছে।'[১] রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:
আমি তখন আমেরিকা থেকে ইয়োরোপ ঘুরে সবে দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন। আমাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্য ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। সেই আন্দোলনে তিনি কী উৎসাহের সঙ্গে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত। তিনি আশা করেছিলেন বাঙালির মনে যে স্বদেশপ্রেম জেগেছে সেটা দেশসেবার কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হবে।···
ভিত গাঁথার কাজ তাঁর সাধ্যমতো তিনি সূত্রপাত করেছিলেন নিজেদের জমিদারির অন্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে।··· তিনি সংকল্প করলেন গ্রামোন্নতির কাজ যতটা পারেন তাঁর আদর্শমতো তিনি নিজেই জমিদারির মধ্যে প্রচলন করবেন।
কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে কৃষির উন্নতি করা বিশেষ দরকার। পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির উন্নতি হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান আমাদের দেশেও প্রবর্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শেখাবার জন্যে পাঠালেন। তার এক বছর পরে আমার ভগিনীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সেখানে পাঠালেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে আমরা তিন জনে গ্রামোন্নয়নের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে পারব তাঁর আশা ছিল। আমি সব-আগে ফিরে এলুম। আসবামাত্রই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন কাজে নিযুক্ত করার জন্য।[২]

পদ্মাতটে এবারকার প্রসন্ন শারদ মুহূর্তের এক কারণ সংকল্পসিদ্ধির

---

১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত চিঠি।

২ 'পল্লীর উন্নতি' পুলিনবিহারী সেন স. 'রবীন্দ্রায়ণ' ২য় খণ্ডে. অতঃপর 'পিতৃস্মৃতি' সংযোজন ভাগে সংকলিত। দ্র. 'পিতৃস্মৃতি' পৃ ২০৭-২৫১।

সূচনা। আরেক কারণ অনেক শোকতাপের পরে প্রবাসী পুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলন। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে এই অংশ বিস্তারিত উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

Towards the end of 1909 I returned home. The house at Shelidah was being got ready for me— I was to look after the estates. I could at the same time have a farm of my own and carry on agricultural experiments as I pleased. The prospect could not be better for a young man with plenty of energy. Hardly had I got home than Father took me out on a tour round the estates to make me acquainted with the people and teach me the details of management. It was a novel experience for me to travel with Father— just the two of us— in a house-boat. Successive bereavements and particularly the loss of Sami had left him very lonely and he naturally tried to pour all his affection on me as soon as he returned home. As we drifted along through the network of rivers so familiar to both of us, every evening we sat out on the deck and talked on all sorts of subjects. I had never talked so freely with Father before this...[১]

শারদ মুখশ্রী ॥ এই সময়ে লেখা 'গীতাঞ্জলি'র তিনটি গানে এই প্রসন্ন সুন্দর শারদ মুখশ্রীর প্রতিফলন ঘটেছে।

১ *On the Edges of Time* 1981 pp 73-74.

গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর ২৫ আশ্বিন ১৩১৬

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি ২৭ আশ্বিন ১৩১৬

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ ৩০ আশ্বিন ১৩১৬

প্রসঙ্গত এ যাত্রায় ২৪ আশ্বিন শিলাইদহে এসে ৩০ আশ্বিনে কলকাতায় গেছেন, রথীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে রেখে। দ্র. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ৩১ আশ্বিন ১৩১৬ (১৭ অক্টোবর ১৯০৯) তারিখে লেখা চিঠি :

কল্যাণীয়েষু, কাল সন্ধ্যার সময় কলকাতায় পৌঁছে শুনলুম তুমি তার আগের দিনই বোলপুরে চলে গেছ।... রথী শিলাইদহে...'।[১]

'ভক্তবাণী'। ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬ সংখ্যায় 'ভক্তবাণী'র এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

ভক্তবাণী

জগতের সকল ভক্তের ভগবদ্‌বিষয়ক চিন্তা ও উক্তির মনোজ্ঞ সংগ্রহ পুস্তক। প্রতি খণ্ডের মূল্য চার আনা। দুই খণ্ড বাহির হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতী, চৈত্র ১৩১৬ সংখ্যার বিজ্ঞাপনে পূর্ব বয়ানের মধ্যে 'তৃতীয় খণ্ড অবধি বাহির হইয়াছে' এই পরিবর্তিত তথ্যটি মাত্র গৃহীত হয়।

'ভক্তবাণী' তিন খণ্ডে প্রকাশিত।

'শান্তিনিকেতন/ভক্তবাণী'। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ.। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত। পৃ ২+৮১ মূল্য।৵০

---

১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত চিঠি।

'শান্তিনিকেতন/ভক্তবাণী' (দ্বিতীয় ভাগ)। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ.। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত। ১৯০৯ পৃ ২+৮৭ মূল্য ।০

'শান্তিনিকেতন/ভক্তবাণী' (তৃতীয় ভাগ)। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কাস্তিক প্রেস ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত পৃ ২+৯২ মূল্য ।০

'শান্তিনিকেতন ভক্তবাণী'তে সংকলয়িতার নাম নেই, প্রথম ও তৃতীয় ভাগে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। 'ভক্তবাণী'র বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের নাম গ্রন্থকর্তারূপে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। পুলিনবিহারী সেন অনুমান করেছেন, 'প্রিয়ম্বদা দেবী, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি সংকলিত ভক্তবাণী'। প্রিয়ম্বদা দেবী ১৩১৮-১৩১৯এর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রায় ধারাবাহিকভাবে 'সাধুবাক্য' সংকলন করেছিলেন, 'ভক্তবাণী' প্রকাশের তা পরবর্তী। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা ২৬ বৈশাখ ১৩১৬র চিঠিতে অবশ্য এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুজ্ঞার ইঙ্গিত আছে। 'ভক্তবাণী' প্রথম ভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মোট ৩৪টি বাণী সংকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে যথাক্রমে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মোট ৩৩টি বাণী সংকলিত হয়েছে।

তৃতীয় ভাগে যথাক্রমে St Francis de Sales, St Teresa, Thomas a Kempis, Arvillon, St. Anselm, St.

Epharim, Bona, Madame Guyon, St. Augustine, Pinart, Fenelon, Drexeline ও St Chrysostom এই খৃস্টীয় সাধুদের মোট ৪৬টি বাণী বঙ্গানুবাদে সংকলিত হয়েছে, অনুবাদকের নাম নেই।

'উপনিষৎ সংগ্রহ' ॥ (মূল, সংক্ষিপ্ত সরল সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ)। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী। প্রথম খণ্ড ।০ আনা, দ্বিতীয় খণ্ড ।৵০ আনা।

'সস্তা দামের চয়নিকা' ॥ ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬য় ইণ্ডিয়ান প্রেসের বিজ্ঞাপনেই 'চয়নিকা'র দুই সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল : 'আর্ট কাগজে ছাপা সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণের মূল্য চারি টাকা; সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা' এই ভাবে।

১৯১৪য় ইণ্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গে পুনর্নবীকৃত এগ্রিমেণ্টে ও চয়নিকা Royal edition ও Popular edition এই দুই রকম গ্রন্থের জন্য পৃথক্ চুক্তি দেখা যায়।

বিশ্বভারতী সংস্করণ রূপে ছাপার সময়েও রাজসংস্করণ এবং সাধারণ সংস্করণের এই পার্থক্য মেনে চলা হয়েছে। যেমন ৩য় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৩২এ কাগজের মলাট ২৸০, বাঁধাই ৩।০, মোটা অ্যাণ্টিক কাগজে ৪॥০ ও বাঁধাই ৫৲ এই চার ধারা বই প্রচলিত হয়। পরবর্তী পুনর্মুদ্রণসমূহে এই চার ধারা বইয়েরই প্রচলন ছিল। কার্তিক ১৩৪১এর পুনর্মুদ্রণে ২৸০ ৩॥০ ও ৫৲ টাকা মূল্যে তিন ধরনের 'চয়নিকা' ছাপা হয়। অতঃপর ফাল্গুন ১৩৪৮এর 'নূতন সংস্করণে' ৩।০ ও ৪॥০ মূল্যে দুই রকম 'চয়নিকা' প্রচলন করা হয়।

'অবনদের সঙ্গে প্রয়াগে' ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন এলাহাবাদে।

রাখী। ১৯০৫এ বঙ্গবিভাগের বছর থেকেই ১৬ অক্টোবর ৩০ আশ্বিনের দিনটি রাখীবন্ধনের দিন রূপে পালিত হতে থাকে। সীতা দেবী লিখেছেন, '৩০শে আশ্বিন তখন মহা ধুম করিয়া রাখীবন্ধন

হইত··· লাল ও হলদে রেশমী সুতা দিয়া আমরা তখন নিজেরাই বাড়ীতে অতি সুন্দর রাখী তৈয়ারী করিতাম ও পরিচিত সকলের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রাখী বাঁধিয়া বেড়াইতাম।' দূরস্বজনকেও রাখী পাঠানো হত। ১৯০৫এর সেদিনেই এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রাখী পাঠিয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন : 'Thus to you from us of Bengal, is sent today this thread of Rakhi-Bandhan, in token not merely of the union of Provinces and parts of Provinces but of bond that knits us all as children of one Motherland together. Bande Mataram.' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পাঠানো সেদিনের রাখী পেয়ে দার্জিলিং থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী ১৯ অক্টোবরের ১৯০৫এর চিঠিতে লেখেন, 'আপনার প্রেরিত "রাখী" কলিকাতা আশ্রম হইতে পুনঃ-প্রেরিত হইয়া এখানে আসিয়াছে। আপনি যে এত ব্যস্ততার মধ্যে এমন দিনে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। সাদরে রাখীগাছি ধারণ করিয়াছি।'

পর বছর ৩১ আশ্বিন ১৩১৩য় ময়ূরভঞ্জের মহারানী সুচারু দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'মনে করে এই দূরস্থিতকে রাখী পাঠিয়েছ এতে কত খুশি হলুম বলতে পারি নে।'

চারুচন্দ্রের এই রাখী পাঠানোর বর্ষে ১৩১৬য় ৪ঠা আশ্বিনের পরের কোনো শনিবার অজিতকুমার চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আগামী ৩০শে আশ্বিন তোমরা একটা উৎসব করতে চেয়েছ··· যেমন ইংরেজ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে সত্যই স্বতন্ত্র করে দেবার মালিক নয় তেমনি আমাদের রাখিবন্ধনের গণ্ডির দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল আমাদের মনের মত জাতিকেই গড়ব এবং অন্যকে বর্জন করব তা চলবে না।··· তোমাদের আশ্রমে তোমদের রাখিবন্ধনের দিনকে খুব

একটা বড়ো দিন করে তোলো…।'[১]

১৩১৬র রাখীবন্ধন দিন উপলক্ষে অমৃতবাজার পত্রিকায় ৪ ৬ ৯ ১২ ও ১৫ অক্টোবর ১৯০৯ তারিখে বিশদ বাংলা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় :

জাতীয় মিলনোৎসব

রাখী-বন্ধন

৩০এ আশ্বিন ১৩১৬ সাল

(১৬ অক্টোবর ১৯০৯)

যে দিনে বঙ্গভূমির অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছিল, আবার সেই দিন আসিতেছে। ৩০এ আশ্বিন তারিখে বঙ্গবাসীর দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। বাঙ্গালী মৃত্যুর মধ্যে যেদিন অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে সে দিন

১। সমগ্র বঙ্গবাসী কাহারও রন্ধনশালায় অগ্নি জ্বলিবে না।

২। সকলে দুগ্ধ বা ফলাহার করিয়া অথবা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবেন এবং যিনি রাজার উপরে রাজা, পতিত জাতির উদ্ধারকর্ত্তা, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবেন।

৩। বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলে একত্র হইয়া নিম্নলিখিত মহাব্রত গ্রহণ করিবেন।

(ক) বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন। (খ) স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার। (গ) স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে আপন আপন শক্তি ও অর্থ নিয়োগ।

৪। সে দিন সমস্ত বঙ্গবাসী স্নানান্তে পরস্পরের হস্তে "রাখী-

---

১ দ্র 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ৭৫। নিবেদিতার ১৬. ১০. ১৯০৫এর পত্র : *Letters of Sister Nevedita*, ed S. P. Basu 1982 pp 1274-1275. শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্র, দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৩ পৃ ৬৯। সুচারু দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭১ পৃ ২০। অজিতকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ পৃ ৩০০-৩০২।

বন্ধন" করিবেন এবং চিরদিন, সুখে-দুঃখে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গবাসী সমুদয় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান পরস্পরের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন।

৫। এতৎ সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে শিশু, রোগী এবং যে কোন লোক বা সম্প্রদায় স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মানুসারে উক্ত তারিখে পকান্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য তাহাদের জন্য অরন্ধন বাধ্যকর নহে।

এই বিজ্ঞপ্তি শ্রীআনন্দচন্দ্র রায় শ্রীঅনাথবন্ধু গুহ শ্রীআবদুল রসুল শ্রী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার শ্রীমতিলাল ঘোষ শ্রীযাত্রামোহন সেন শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত। ৪ঠা অক্টোবর মৌলবী দীদার বক্সের নেতৃত্বে বীডন স্কোয়ারে স্বদেশী সভা হয়। ১২ অক্টোবর মঙ্গলবার পত্রিকার পৃ ৪ চতুর্থ কলমে ফেডারেশন হল নির্মাণের সাহায্যকল্পে এই আবেদন প্রচারিত হয়। ফেডারেশন হল Hall of United Bengal.

An Appeal

On the 16th October 1905, the Province of Bengal, from time immemorial the home of the Bengali-Speaking people was sundered in twain by an executive order issued by the Government of India. On that day, ever to be remembered in our history, we solemnly vowed, before God and man, amid the unbounded enthusiasm of thousands and tens of thousands of our country-men, to do all that lies in our power to avert the consequences of the Partition of Bengal. We resolved to build a Hall as the visible symbol

of the indissoluble union between the old and severed Province which no administrative order can set aside.…

এই হল ফেডারেশন হল, Hall of the United Bengal. আনন্দমোহন বসু হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ৪১ জন আবেদনকারীর প্রথম নাম তারকনাথ পালিত, তৃতীয় নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং শেষ নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫ অক্টোবর তারিখে এক পত্রলেখক ফেডারেশন হল নির্মাণ আহ্বায়কদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ সি. আর. দাশ এ রসুল হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষের নাম নেই বলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বরোদায় নিমন্ত্রণ ॥ এই চিঠির মাত্র দুদিন আগে বরোদায় যাওয়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধা প্রকাশ করেছিলেন। দ্র. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি ৩১ আশ্বিন ১৩১৬ :

আমি বরদায় যাব কি না ভাবচি। দীর্ঘ পথ— পথের অনিয়মে পাছে শরীর বিকল হয় তাই ভাবচি। যদি বরদায় না যাওয়া ঘটে তা হলে হয়ত বোলপুরেই অবকাশ যাপন করব…'।

দ্র. দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৮ পৃ ১৩।

বরোদায় ১৩১৬ শারদীয় পূজার সময় অনুষ্ঠিতব্য মহারাষ্ট্র সাহিত্য সম্মিলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেওয়ার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের, এ বাবদে সম্মিলনের প্রধান উদ্যোক্তা বরোদার মুখ্যমন্ত্রী রূপে সদ্য-নিযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যক্তিগতভাবেও তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। অসুস্থতাবশত তাঁর যাওয়া হয় নি, তাঁর পরিবর্তে বরোদায় পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।[১]

---

১ বরোদা সাহিত্য সম্মিলন বরোদায় সাহিত্য পরিষদ স্থাপনের উপক্রমণিকা। এই সূত্রে এই কয়টি তথ্য এখানে সংকলন করে দেওয়া যেতে পারে।

রমেশচন্দ্র দত্ত বরোদা রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রীর পদে অগস্ট ১৯০৪ - জুলাই ১৯০৭

ঝড় ॥ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই ঝড় বৃষ্টি জলোচ্ছ্বাসের সংবাদ কাগজে দেখা যায়। অজয়ের প্লাবনের সংবাদ বেরোয় ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৯এর কাগজে। ২০ সেপ্টেম্বর বেরোয় রবিবার অপরাহ্ণে 'Calcutta experienced a thunderstorm of excep-

---

পরিসরে নিযুক্ত থাকার পর রয়্যাল কমিশন অন ডিসেন্ট্রালাইজেশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্যরূপে মনোনীত হন। কমিশনের কর্ম-পরিসরের শেষে মার্চ ১৯০৯এর শেষ দিকে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর শ্রীকারসাম্পজির অবসর গ্রহণের পর ১ জুন ১৯০৯ বরোদার মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হয়ে দ্বিতীয়বার বরোদায় গমন করেন। ৩০ নভেম্বর ১৯০৯এ বরোদায় রমেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

দ্র. J. N. Gupta : *Life and Works of Romesh Chunder Dutt C. I. E.,* London : J. M. Dent & Sons Ltd. 1911 pp 309-416, 445-455, 479-485.

রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্মমুহূর্ত থেকে তার নেতৃস্থানীয় ছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি প্রথম সভাপতি। কর্মব্যপদেশে অন্যত্র থাকা কালেও পরিষদের বহু কল্যাণ তিনি সাধন করেছেন। ডিসেন্ট্রালাইজেশন কমিশনের কর্ম-পরিশেষে কলকাতায় এলে কয়েকদিনের মধ্যেই পরিষদ ২ বৈশাখ ১৩১৬ তারিখে তাঁর সংবর্ধনার জন্য সান্ধ্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বরোদায় মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দৃষ্টান্তে সেখানে তিনি মহারাষ্ট্র সাহিত্য পরিষদ স্থাপনের যত্ন করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিত হয়েছে :

বরোদায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর বিগত শারদীয়া পূজার সময় বরোদা নগরে মহারাজ গাইকোয়াড়ের প্রবর্তনায় যে মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য তিনি স্বহস্তে বিশেষ নিমন্ত্রণ দ্বারা পরিষৎকে আহ্বান করেন এবং বরোদাধিপতির কৃপাকটাক্ষ দ্বারা পরিষৎকে সাহায্য করিবেন, এই আশা পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধিরূপে সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তিনি সেখানে যে সবিশেষ সম্মান লাভ করেন, তাহাতে পরিষৎ সভাস্থলে সমবেত দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে বিশেষ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুখ্যতঃ রমেশচন্দ্রের যত্নে ও উৎসাহেই সেই সম্মিলন উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য

tional severity'—সেই সংবাদ। ২১ সেপ্টেম্বর বেরোয় The Deluge in Calcuttaর বিবরণ যাতে 'the whole town

---

পরিষদের অনুকরণে মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপনার সূচনা হইয়াছে, ইহাও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

পরিষৎ-পত্রিকায় মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়:

মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলন

মহারাজ গাইকোয়াড়ের উৎসাহে বরোদা নগরে যে মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মিলন পূজার সময় ঘটিয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের প্রধান পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। পরিষদের মান্য সভ্যগণ ব্যতীত পরিষৎও বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। দুঃখের বিষয় পূজার কয়দিন ধরিয়া সম্মিলন ঘটায় পরিষদের পক্ষ হইতে অধিক প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভবপর হয় নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রতিনিধিরূপে যাইতে ইচ্ছা করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে সহসা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই সময়ে পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য ও পূর্ব্বতন সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিয়া পরিষদের লজ্জা মোচন করেন। তিনি এই সময়ে রাজপুতগণের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া রাজপুতানা ভ্রমণ করিতেছিলেন। জয়পুরে থাকিতে পরিষৎ-সম্পাদকের টেলিগ্রাফ মাত্র পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বরোদা যাইতে সম্মত হন; পরিষৎ যেরূপ বিশেষ সম্মানসহ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় এই অনুগ্রহ না করিলে পরিষৎকে বিশেষ লজ্জার ভাগী হইতে হইত। সম্মিলনে তখন অতি অল্প সময় বর্ত্তমান ছিল; সেই সময়ের মধ্যে বিনা বাক্যব্যয়ে পরিষদের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় উচ্চপদস্থ ও সম্মানার্হ ব্যক্তি পরিষদের পক্ষে উপস্থিত হওয়ায় পরিষৎও সম্মিলনে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও গৌরব পাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পরিশিষ্টে প্রকাশিত পত্রখানি হইতে বুঝা যাইবে।

পশ্চিম ভারতে পূর্ব্ব হইতেই গুজরাটী সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত আছে; ঐ পরিষদের সহিত আমাদের পত্র ব্যবহার ও আদানপ্রদান আরম্ভ হইয়াছে।

was flooded'। ২০ অক্টোবর ১৯০৯এর অমৃতবাজার পত্রিকায় সমগ্র পূর্ব বঙ্গ দিয়ে বয়ে যাওয়া The Destroyer Cycloneএর

বরোদার সম্মিলন উপলক্ষে মাহারাষ্ট্র-সাহিত্য-পরিষদেরও সূচনা হইয়াছে। বঙ্গীয়-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রমেশবাবুই এই মহারাষ্ট্র পরিষদেরও স্থাপনাকার্য্যে লিপ্ত থাকায় আমাদের বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুসরণ করিয়াই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইতেছে, ইহাও আমাদের শ্লাঘার বিষয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামে পত্র :

Baroda
1st. November 1909

My dear Mahamahopadhyaya,

The Executive Committee of the Maharashtra Literary Conference deem themselves to be under a deep obligation to you for having kindly taken the trouble to attend the Conference. The co-operation and sympathy of men living in distant parts of India, with the cause of the conference are greatly appreciated and the success of the conference was chiefly due to them. You will kindly accept our sincere thanks for the same. Your utterances at the conference were peculiarly valued as proceeding from one who had bestowed great thought and study on the subjects dealt with.

You will kindly communicate our thanks to the Bangya Sahitya Parishad of Bengal for their having deputed to the Conference as their deligate a man so eminently qualified as yourself.

I beg to remain
Yours sincerely
Sampatrao Gaekwad
Chairman of the Reception Committee.
(Maharashtra Literary Conference, Baroda.)

এই সাহিত্য-সম্মিলনের অল্পদিন পরেই রমেশচন্দ্রের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

দ্র 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩১৬ পৃ ১০৩-১০৪, পৃ ১২৪, পৃ ১৮৩।

ব্যাপক বিবরণ। দ্র. *Amrita Bazar Patrika* ১৩-২০ অক্টোবর ১৯০৯।

'শিশু'। 'শিশু' মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র সপ্তম ভাগরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়।[২] . আখ্যাপত্র : শিশু। কাব্যগ্রন্থ সপ্তম ভাগ।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক গৌরহরি সেনকে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন :

ওঁ

বোলপুর।

প্রিয়বরেষু,

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি বলিয়া ত গর্ব্ব করিতে পারি না। অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল এবং তিনি আমাকে কিছু স্নেহও করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বরোদায় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপন উপলক্ষ্যে তিনি আমাকে দুই তিন খানি পত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাইতে পারি নাই বলিয়া অদ্য আমার হৃদয় অত্যন্ত অনুতপ্ত আছে। তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্য্যে, কি দেশহিতে সর্ব্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে— বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি— এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল— তাঁহার কর্ম্মে ও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদাপ্রসন্ন অরুগ্ন নির্ম্মলতা আমার স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই। ইতি ১৬ই পৌষ ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ 'কাব্যগ্রন্থ' সপ্তম খণ্ড 'শিশু'-ভাগ রূপে মোহিতচন্দ্র সেনের আগ্রহে পুরাতন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীমোহিতচন্দ্র সেন এম.এ. সম্পাদক। মজুমদার লাইব্রেরী। ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সন ১৩১০। ২ আশ্বিন পৃ ৬+২+৩+১৭৪।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের 'শিশু' ১৩১৬য় প্রকাশিত হয়, তার আখ্যাপত্র :

শিশু। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ১৩১৬ পৃ ৩+২+১৬১+৩ মূল্য ৸০।

ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬য় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের বিজ্ঞাপনে 'ছেলেদের জন্য ভালো ভালো বই' পর্যায়ে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শিশু"' বিজ্ঞাপিত হয়।

'পাথেয়েরও অভাব। ঈশ্বর যদি ডানা দিতেন… ॥ তু. 'ইচ্ছা সম্যক তব দরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি। পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি॥' রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাংশ। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ৬৬ খণ্ডে উদ্‌ধৃত পৃ ৩৯।

রেলোয়ে কম্পানি॥ সরকারি অধিগ্রহণের আগে কোম্পানি বা ব্যবসায়ী সংঘই এখানে রেলওয়ের নির্মাণ-পরিচালনের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ঈস্‌টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি কলকাতা থেকে কুষ্ঠিয়া পর্যন্ত ১১১ মাইল রেলপথ খোলেন, ১৮৬২তে এই লাইনে প্রথম গাড়ি চলে। 'কলিকাতা ও সাউথ ঈস্‌টার্ন রেলওয়ে কোম্পানি' নামে সংস্থা কলকাতা থেকে ক্যানিং পর্যন্ত ২৮ মাইল লাইন বাঁধেন। ১৮৮৪ সালে ঈস্‌টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির হাত থেকে

ও নতুন কবিতার সমবায়ে প্রস্তুত হয়েছিল, এ বাবদে মোহিতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পত্র-বিনিময় এবং আনুষঙ্গিক তথ্যসমূহ পুলিনবিহারী সেন -কৃত 'সম্পাদক ও কবি' সংকলনে পাওয়া যায়। দ্র 'সম্পাদক ও কবি', ৫ম পরিচ্ছেদ। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৮ পৃ ৪২-৪৯।

সরকারের হাতে আসে। এই সব বড়ো লাইন ছাড়া কোনো কোনো কোম্পানি ন্যারো গেজের লাইন খুলেছিলেন। মার্টিন কোম্পানি বেলগাছিয়া-হাসনাবাদ ৪৩ মাইল, হাওড়া-আমতা ২৮ মাইল, হাওড়া-শিয়াখালা ২০ মাইল গাড়ি চালাতেন। ম্যাকলাউড কোম্পানি মাঝেরহাট-ফলতার ২৭ মাইল রেলপথ তত্ত্বাবধান করতেন। সরকারি রেলওয়ের পাশাপাশি এই-সব কোম্পানির রেলওয়ে অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল।

দ্র. 'বাংলায় ভ্রমণ' ১৯৪০ পৃ ৪৫, ৪৯, ৬১-৬৪, ১৭৭।

পত্র ১১। উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন॥ সুধীরচন্দ্র কর লিখেছেন, 'আশ্রমের উত্তর দিকে "উত্তরায়ণ"।..."উত্তরায়ণ" হচ্ছে সীমার নাম, বাড়ির নাম নয়। সে সীমায় ছোটো ছোটো কয়েকটি বাড়ি আছে।' সে-সব বাড়িতে কবি বিভিন্ন সময়ে বাস করেছেন।

দ্র সুধীরচন্দ্র কর 'রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্র পরিচয়' ১৩৬৭ পৃ ৫০-৫১।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০৯ সালে ভাদ্রের প্রথমে যখন আশ্রমে যোগ দেন, তিনি দেখেছেন তখন রবীন্দ্রনাথ থাকতেন অতিথিশালার দোতলায়, পরে 'আশ্রমের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত প্রান্তরে বাসের জন্য খড়ে-ছাওয়া একটি বড়ো বাসগৃহ ও পাকশালা প্রভৃতি নির্মাণ' করলেন, তারপর দেহলী নির্মিত হলে সেখানে বাস করতে লাগলেন। দ্র হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'শান্তিকেতনের ইতিহাস'। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ পৃ ১৬৪-৬৭।

শান্তিনিকেতনের রেলস্টেশন বোলপুর, ঈস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের স্টেশন। দ্র 'বাংলায় ভ্রমণ' ১৯৪০ পৃ ১২৩-১২৪।

সংকলন॥ ইংরেজি সাময়িকপত্রাদি থেকে কৌতূহলপ্রদ নির্বাচিত রচনা 'প্রবাসী'র জন্য শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে দিতেন রবীন্দ্রনাথ। সে-সব লেখাতে তাঁর নিজের সংস্কারও থাকত

কমবেশি। তু. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বোলপুর থেকে লেখা ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০এর চিঠি : 'লিখিতে ভুলিয়াছিলাম জর্মান কাগজগুলি এখানেই পাঠাইয়া দিবেন, সংকলনের উপায় করিব। কতকগুলি সংকলন হাতে আসিয়াছে সংশোধন করিয়া পাঠাইয়া দিব।' দ্র. চিঠিপত্র ১২ পৃ ২।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল প্রবাসীর 'সংকলন' বিভাগের পরিচালক ছিলেন। আমি তাঁহাকে ইংরেজি অনেক মাসিকপত্র পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে ভালো ভালো প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে তাহার সারসংগ্রহ ও অনুবাদ করিতে দিতেন। অনুবাদগুলি তাঁহার হাতে পৌঁছিবার পর সংশোধনের পালা আরম্ভ হইত। সংশোধন ও সংক্ষেপণ তো খুবই হইত ; অনেক স্থলে প্রায় সমস্তটাই তিনি নিজে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁ দিকের খালি জায়গায় লিখিয়া দিতেন।' 'রবীন্দ্রনাথ ও মাসিকপত্র' শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

আমেরিকা থেকে ফিরে শিলাইদহে নতুন জীবনে প্রবিষ্ট হয়ে একা থাকার পূরক হিসেবে সেখানে একটি লাইব্রেরি করে নিতে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন রথীন্দ্রনাথ, সেই সূত্রে তখন আমেরিকায় পাঠরত ভগিনীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে লেখেন : 'Magazine পাঠাবার দরকার নেই।··· প্রবাসীর সঙ্কলন অংশের ভার বাবার হাতে পড়ায় যত exchange magazine আসে রামানন্দবাবু সব বাবাকে দেন—সঙ্কলন হয়ে গেলে বাবা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। বোধ হয় দেখেছ এখন প্রবাসীর খুব উন্নতি হয়েছে, ১০০ পাতা reading matter—দামও খুব কম রাখা হয়েছে···।' 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ্য' (১৯৮৮) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত পত্র পৃ ২৫।

'Magazine পাঠাবার দরকার নেই...' এই সূত্রে নগেন্দ্রনাথকে ৯ বৈশাখ ১৩১৫য় লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি স্মরণ করা যায় যেখানে 'হিবার্ট জার্নাল' 'ওপেন কোর্ট' ও লিডিং এজ' এই তিনখানি কাগজ subscribe করে তাঁকে পাঠাতে, এবং সে বাবদে ৪০ টাকা বেশি পাঠাচ্ছেন বলে লিখছেন। দ্র. দেশ, ১৮ কার্তিক ১৩৬২ পৃ ১৩ ও চিঠিপত্র ১৩ পৃ ২১৮-২১৯।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা সূত্রে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: '...কোনো ভালো প্রবন্ধ বা কোনো ভালো বই বাহির হইলে তাহা লইয়া অধ্যাপকদের সঙ্গে [রবীন্দ্রনাথ] আলোচনা করিতেন।... এই আলোচনা আরো ব্যাপক করিবার জন্য কবি প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ হইতে অনেক বিখ্যাত ইংরাজি মাসিক পত্রিকা আনাইতেন। ইহার মধ্যে স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন, হারপার্স ম্যাগাজিন, উইণ্ডসার ম্যাগাজিন, চেম্বার্স জার্নাল, কন্‌টেম্পোরারি রিভিউ, অ্যাটলান্টিক মান্থলি, লিটারারি ডাইজেস্ট ইত্যাদি থাকিত। ইহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নানা বিষয়ক প্রবন্ধের সার সংকলন করিবার ভার বিভিন্ন শিক্ষকদের দিতেন। শিক্ষকরা সংকলন করিয়া গুরুদেবকে দিতেন। তিনি উহা দরকার মতো সংশোধন করিয়া প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইতেন। প্রবন্ধের শেষে প্রত্যেক শিক্ষকের আদ্যাক্ষর থাকিত, যথা: অ=অজিতকুমার চক্রবর্তী। ১৩১৬ সালের প্রবাসীতে সংকলন ও সমালোচনা পরিচ্ছেদে ইহার নিদর্শন আছে। গুরুদেবের মতে এইরূপ সংকলনের অভ্যাস বাংলা রচনা আয়ত্ত করার এক উৎকৃষ্ট উপায়।' 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ', বিশ্বভারতী ১৩৮৮ গ্রন্থে উদ্‌ধৃত পৃ ১৮২-১৮৩।

৫ প্রসঙ্গত 'সাধনা' এবং 'বঙ্গদর্শন' পত্রেও রবীন্দ্রনাথ 'সাময়িক সারসংগ্রহ', 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বা সংকলনজাতীয় রচনার সংস্থান

করেছিলেন। 'সাধনা'র জন্য সংকলন তিনি স্বয়ং প্রস্তুত করেছেন। 'বঙ্গদর্শন' সূত্রে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, '"বঙ্গদর্শন" পরিচালনার গুরুতর ভার আমার উপর ছিল—অনেক পত্রে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিলাতী ও দেশীয় অনেক কাগজ হইতে সন্দর্ভ সংকলন করিবার জন্য সেগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন…'। দ্র 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' ১৩৭৬ সং পৃ ২০৪।

'নির্জ্জন শান্তি… শান্তিনিকেতনের মতো এমন জায়গা আর পাইবে না…'॥ তু. বোলপুরের মতো এমন সুগভীর শান্তি এবং বিরাম আর কোথাও পাওয়া যেত না।' ছিন্নপত্রাবলী, ৩০০১০০ ১৮৯৪ তারিখের ১৭৩ সংখ্যক পত্র।

'লুপ মেলের…'॥ তু. 'কলকাতায় গাড়িতে কোন গতিকে যদি চড়ে বস, যদি লুপ মেলের গাড়িতেই চড়তে পার তাহলে বোলপুরে সন্ধ্যা ৭॥০টার সময়ে না এসে পৌঁছে তোমার গতি নেই।' প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্র, এপ্রিল ১৯০২। চিঠিপত্র ৮ পৃ ১৯৭।

পত্র ১২। 'গানের বই সংশোধন… যদি মণিলালকে ছাপতে দেওয়ায় কানো সুবিধা থাকে …'॥

এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের ছাপায় ভুল থাকার দরুন সম্ভবত কলকাতায় ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কান্তিক প্রেসে নতুন করে ছাপার কথা ওঠে। পরে, চারুচন্দ্রের ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে নিযুক্ত থাকা কালেই ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের বই কান্তিক প্রেসে ছাপা হয়েছে।

'গোরা'॥ 'গোরা' প্রবাসীর ভাদ্র ১৩১৪ - ফাল্গুন ১৩১৬ মধ্যে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত। প্রবাসীতে প্রকাশকালেই 'গোরা' আংশিকভাবে (পৃ ১৭০) প্রবাসী কার্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়ে ॥৶০ আনা মূল্যে প্রচারিত হয়েছিল, এপ্রিল ১৯০৯। অতঃপর 'গোরা' কান্তিক প্রেসে ছাপা হয়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক দুই খণ্ড একত্রে

প্রকাশিত হয়। প্রকাশ-বিবরণ এইরকম :

গোরা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ১৯১০ প্রথম খণ্ড পৃ ৪+৩৪৬, শেষ খণ্ড পৃ ২+৩৪৭-৫৯৮ মূল্য দুই টাকা চারি আনা। উৎসর্গ/শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ কল্যাণীয়েষু/ ১৪ মাঘ ১৩১৬।

১৪ মাঘ ১৩১৬ রথীন্দ্রনাথের বিবাহের দিন, 'গোরা' রথীন্দ্রনাথের এই বিবাহের উপহার। অতএব পত্রিকায় গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বেই 'গোরা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ভারতী, চৈত্র ১৩১৬য় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের এই বিজ্ঞাপন ছিল :

গোরা

আগাগোড়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনার স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ৫৯৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

পত্র ১৩। 'যতীন বাগচির একটি লেখা' ॥ 'তাঁতি পোকা'। যমশেরপুর, নদীয়া থেকে যতীন্দ্রমোহন বাগচী[১] একরকম বয়ননিপুণ পোকার সমাচার নিয়ে পাঠান, 'তাঁতি পোকা' নামে প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৭ পৃ ৩৭৩-৩৭৫এ প্রকাশিত। শুঁয়োপোকার মতো দেখতে দু দল

১। মুখ্য রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যে পরিগণিত যতীন্দ্রমোহন বাগচী 'সঙ্গীত সমাজে'র সভ্য হয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আগেই পরিচিত হয়েছিলেন। দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' ১৩৫৪ পৃ ১১-১২। তিনি বিপিনচন্দ্র পালের New India পাক্ষিক-পত্রে রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন বলে সম্প্রতি জানা গেছে। *Subha*, New India 1/6, 16 September 1901, *Kankala* (The Skeleton)', New India 1/39, 19 May 1902. দ্র. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবীন্দ্রজীবনী' ৫ম খণ্ড ১৯৯ পৃ ৩২-৩৩।

পোকা গাছের ওপর থেকে নিচু ডালে এধারে ওধারে তাঁতের মাকুর মতো দ্রুত যাতায়াত ক'রে মাকড়সাজালের চেয়েও সূক্ষ্ম বিশদ ও বিস্তৃত এক অদ্ভুত বস্ত্র বয়ন করছে আর রাখালপাখালেরা সেই কাপড় কেউ মাথায় জড়াচ্ছে কেউ হাওয়ায় ওড়াচ্ছে এই দেখে যতীন্দ্রমোহন বিষয়টি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গোচর করেন, ম্যাজিস্ট্রেট জানান ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ন্যাচারাল হিস্টরি-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লিখে পাঠান : 'It is unlike any web produced by any insect I have hitherto seen and it would be most important to obtain specimens of the animal that produced it.' চিঠি-চালাচালির অবসরে তাঁতি পোকা অদর্শন হয়ে যাওয়ার ফলে নমুনা সংগ্রহ করা যায় নি, যতীন্দ্রমোহন বিষয়টি লিখে পাঠান রবীন্দ্রনাথকে।

'তাঁতি পোকা' প্রকাশিত হবার পরের মাসে বাবুরহাট, ত্রিপুরা থেকে অবনীমোহন চক্রবর্তী 'কাপড়-ধরা গাছ' নামে তুলনীয় আর একটি দৃষ্টান্ত লিখে পাঠিয়েছিলেন। দ্র. 'আলোচনা : তাঁতি পোকা'। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৭ পৃ ৫১২।

গানগুলো…'॥ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ - ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ মধ্যে কলকাতা, তিনধরিয়া ও বোলপুরে 'গীতাঞ্জলি'র (৬২ থেকে ৮৩ সংখ্যক) বাইশটি গান লেখা হয়।

'ছাগলের জন্য চিন্তামণিবাবুকে…'॥ চিন্তামণিবাবু এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ। 'ছাগল…' শান্তিনিকেতন গোষ্ঠ বা গোশালার জন্য ছাগল। চিঠিপত্র ১৩য় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ১৮ অক্টোবর ১৯১০-এর পত্রে টীকা স্থলে লিখিত হয়েছে : 'সন্তোষচন্দ্রের গো-শালা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এতদূর উৎসাহিত হয়েছিলেন যে এলাহাবাদ থেকে উৎকৃষ্ট জাতের ছাগল আনাবার চেষ্টাও করেছিলেন।' দ্র. চিঠিপত্র ১৩ পৃ ২৮৫-২৮৬।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি ও গোপালন বিদ্যায় স্নাতক হয়ে ফিরে শান্তিনিকেতন গোশালার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

পত্র ১৪। 'নমুনার বইগুলি' ॥ সম্ভবত 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় আকর বই।

'রামানন্দবাবুকে আশ্রমে আবদ্ধ করে ফেলার সাধনা...' ॥ রামানন্দবাবু শান্তিনিকেতনে একটি মাটির বাড়ি কিনেছিলেন: ছোটো ছেলে মুলুকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দেওয়ার পর ১৯১৭র গ্রীষ্মের ছুটির সময় থেকে ১৯২৯এ মুলুর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে এসে থাকতেন মাঝে মাঝে। দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে থাকতে যান ১৯২৪এ, বিশ্বভারতী কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যান ১৯২৫এ, তারপরেও নানা ভাবেই সারাজীবন আশ্রমের সম্বন্ধে আবদ্ধ থেকেছেন। কিন্তু ১৩১৭র (১৯২০) অসুস্থতার সময় তিনি আশ্রমের শুশ্রূষা গ্রহণ করতে পারেন নি। শান্তা দেবী লিখেছেন:

১৯০৭এর শেষে সুরাট কংগ্রেস হইতে রামানন্দ পীড়িত হইয়া আসেন। তাঁহার রোগ সারিলেও শরীরের দুর্বলতা সারে নাই। তাহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিল ভীষণ পরিশ্রম ও নানা দুশ্চিন্তা।

১৯১০এ এই সব কারণেই বোধ হয় তিনি আবার পীড়িত হইয়া পড়েন। ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের পরামর্শে তাই তিনি গরমের পূর্বেই দার্জিলিং গেলেন। তিনি তথায় গিয়া শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা ও ডাঃ বিপিনবিহারী সরকারের পত্নী হেমলতা দেবীর বাড়িতে উঠিলেন। গ্রীষ্মের ছুটির পর অন্য সকলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্র. 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৪৯।

'এলাহাবাদে তাঁর যাবার কথা...' ॥ কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ থাকা কালে রামানন্দ এলাহাবাদে বসতি করেন, সেখানে মুখ্যসমাজের

তিনি ঘনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধার্হ ছিলেন। মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসীর পত্রিকার জন্মও এলাহাবাদে।

পত্র ১৫। 'তোমার suggestion মতো লেখা'। সম্ভবত প্রবাসীর 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগের লেখা।

'চলিত কথার রীতি' সম্পর্কে পরামর্শ... ॥ এই পরামর্শের কথা জানা যায় না তবে বাংলা বানানের রীতি সম্বন্ধে চারুচন্দ্রের পরামর্শ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন বলে চারুচন্দ্র তাঁর স্মৃতি-প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। দ্র. এই বই পৃ ২২৯।

বুদ্ধদেব বসু চারুচন্দ্রের চলিত রীতি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে তাকে গৌরব দান করেছেন, তিনি লিখেছেন, চলিত ভাষা বলে 'এই নতুন রীতির যখন আদিযুগ তখনই তিনি ছোটোগল্পে তা ব্যবহার করেছিলেন ("নীলকুঠি" : বঙ্গাব্দ ১৩১৯); ১৩২৮ সালে বেরোলো "মুক্তিস্নান"। চলিত ভাষায় প্রথম উপন্যাস তাঁর, এবং পরবর্তী আরো দশখানা উপন্যাসে তিনি "সাধু" ভাষাকে বর্জন করে চললেন। সে যুগে অনেকে ধরতে পারেন নি চলিত ভাষার সার্থকতা ঠিক কোনখানে... কিন্তু চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা পড়ে প্রতীতি জন্মে যে চলিত ভাষার মর্মসুরটি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন— বুঝেছিলেন যে বাংলা ভাষাকে নম্য, গতিশীল ও মিশ্রধ্বনিসম্পন্ন করে তুলতে হলে এই রীতি ভিন্ন উপায় নেই।' 'চারু বন্দ্যোপাধ্যায়', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৩ পৃ ১৯৭।

প্রসঙ্গত, 'চলিত কথার রীতি' সম্বন্ধে এই পরামর্শ 'সবুজপত্র'-পূর্ব কালের।

ভোলার মৃত্যু। তু. একই দিনে অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখা পত্র : কাল রাত্রে হৃৎপিণ্ডের গতি রোধ হইয়া ভোলার মৃত্যু হইয়াছে। সন্তোষ আজ মাতাকে সংবাদ দিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। ইতি ১১ই আষাঢ় ১৩১৭।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র ভোলা, সরোজচন্দ্র মজুমদার (১৮৯৩-১৯১০) সন্তোষচন্দ্রের ছোটো ভাই, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শমীন্দ্রের সহপাঠী। ১০ আষাঢ় ১৩১৭ (২৪ জুন ১৯১০) শেষ রাতে আশ্রমের ছাত্রাবাসে হৃদ্‌রোগে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় রবীন্দ্রনাথ শুশ্রূষা করেছেন তার শয্যাপাশে বসে, সেই বিবরণ সুধীরঞ্জন দাস রক্ষা করেছেন তাঁর শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথায়, উদ্‌ধৃত করি :

একদিন জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরে গিয়েছে—রাত্রের খাওয়া শেষ হলে সুহৃদ ও আমি, আর কে কে বেরিয়ে পড়েছি খেলার মাঠে।··· হঠাৎ নজরে পড়ল, আমাদেরই ঘরের সামনে কারা লণ্ঠন নিয়ে ছুটোছুটি করছে। খুবই অস্বস্তি বোধ করলাম, একটা অনির্দিষ্ট অমঙ্গল আশঙ্কায় মনে কেমন যেন ভয় হতে লাগল। আমরা সব তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ঘরে। এসে দেখি ভোলা তাঁর বিছানায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন এবং গুরুদেব তাঁর পাশে একটা মোড়া না কিসের উপর স্তম্ভিতভাবে বসে আছেন, নির্নিমেষ চোখে ভোলার দিকে তাকিয়ে। একটা টিপাইয়ের উপর কয়েকটা বাইওকেমিক ওষুধের শিশি। একটু পরেই বোলপুর থেকে হরিচরণ ডাক্তারবাবু এসে যখন বুক পিঠ ও নাড়ী পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, বুঝতে পারলাম যে আমাদের সতীর্থটিকে আমরা হারালাম। গুরুদেবের তন্ময় মুখচ্ছবিতে যে দুঃখ ও করুণার ভাব ফুটে উঠেছিল আজও তা ভুলি নি। ভোলার হঠাৎ কী হল আমরা কিছুই বুঝলাম না, পরেও জানতে পারি নি। মনের মধ্যে বিশেষ করে জাগছিল এই কথাটা, শমী গেলেন ভোলাদের মুঙ্গেরের বাড়ি হতে, আর ভোলা চলে গেলেন গুরুদেবের আশ্রম থেকে। ভোলা ও শমীর মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল বলেই বোধ হয় এই কথাটা বার বার মনে আসছিল। প্রত্যুষে তাঁর দেহ সৎকার করে শ্মশান থেকে যখন

সকলে ফিরলাম তখন রোদ উঠে গেছে।

'আমাদের শান্তিনিকেতন' ১৩৯৪ সং পৃ ৯৫।

পত্র ১৬। 'সংকলন সমালোচন শিরোনামা…' ॥ প্রবাসীর পৌষ সংখ্যা থেকে 'সংকলন ও সমালোচন' এই শিরোনাম উঠে যায় এবং অতঃপর বিভাগনামা ব্যতিরেকেই সংকলনের লেখাগুলি ছাপা হতে থাকে।

'শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধগুলি…' ॥ শান্তিনিকেতনের লেখকদের সংকলন বিভাগের জন্য লেখা প্রবন্ধ।

'…What is in a name ?' ॥

What's in a name ? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet ;

শেক্‌স্‌পীয়র : 'রোমিয়ো অ্যাণ্ড জুলিয়েট' ২. ২. ছত্র ৪৩-৪৪।

'…ব্যাকরণ-মুদ্রারাক্ষস' ॥ মুদ্রারাক্ষস ছদ্মনামে চারুচন্দ্র গ্রন্থসমালোচনাদি লিখতেন।

'বাংলা ভাষাকে ত analyse করে এ পর্যন্ত দেখা হয় নি…' ॥

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে analyse করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সাধনা পত্রে, তারপর সাহিত্য পরিষদের সভায়। সাহিত্য পরিষদে সন ১৩০৪এ 'ব্যাকরণ বিষয়ে শাখা সমিতি' গঠিত হয়। ওই বছরের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 'প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ পাণিনি ও মুগ্ধবোধের অনুবাদ মাত্র।… বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত।' সন ১৩০৮এ তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ' পাঠ করেন, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন 'বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত বিষয়ক প্রবন্ধ'। শাস্ত্রী মহাশয় সে সভায় বলেন, 'এক মাস পূর্বে আমি এ বিষয়ের আলোচনা করি। রবীন্দ্রবাবুর মত লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই।' সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক বাঙ্গালা ব্যাকরণ আলোচনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর যে অগ্রণী হয়েছেন, পরিষৎ সভায় এজন্য তাঁদের সাধুবাদ করা হয় (যথাক্রমে ২৭ জুলাই ১৯০১ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০১এর মাসিক অধিবেশনে)। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৭ ও ১৩০৮ বর্ষে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ব্যাকরণ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরিষদের অধিবেশনে পঠিত আরো দুটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন পৌষ ১৩০৮এ এবং ভারতী আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩১১ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বই বেরোয় ফেব্রুয়ারি ১৯০২এ। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ-বিশ্লেষণের নতুন অধ্যায় শুরু হয় প্রবাসী পত্রিকায়। প্রবাসী ১৩১৮ বর্ষের আষাঢ় ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক ও অগ্রহায়ণে অন্যূন পাঁচটি ব্যাকরণ প্রসঙ্গ রচনা তিনি প্রকাশ করেছিলেন— এই বাক্যটিকে তার ভূমিকা স্বরূপে গ্রহণ করতে হয়।

পত্র ১৭। মাইরন ফেল্‌প্‌স্‌কে লেখা ইংরেজি চিঠি ॥ *The Problem of India: A Letter* শিরোনামে মডার্ন রিভিউ অগস্ট ১৯১০এ (পৃ ১৮৪-১৮৭) মুদ্রিত। ছাপার পূর্বে রামানন্দবাবু প্রুফ পাঠিয়েছিলেন, দ্র. রামানন্দকে লেখা ২৫ জুলাই ১৯১০এর পত্র, চিঠিপত্র ১২ পৃ ২-৩। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রুফে দ্বিতীয় গেলির শেষপ্রান্তে একটি প্যারাগ্রাফ যোগ করিয়াছি।'[১]

১৯১০এ কোনো সময় ন্যুইয়র্কের আইনজীবী মাইরন ফেল্‌প্‌স এদেশে এসেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে, শিলাইদহেও গিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ১৯১০এ শিলাইদহে তাঁর নূতন জীবন শুরু হল— 'আমি যেন ইংলণ্ড-আমেরিকার পল্লী অঞ্চলের একজন সম্পন্ন কৃষাণ।... এই সময় আমেরিকা থেকে এসেছিলেন মাইরন ফেল্‌প্‌স্‌— ইনি ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে এঁর

১. ফেল্‌প্‌স্‌কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রখানির মুখ্যাংশ চিঠিপত্র ১২ পৃ ৪৫০-৪৫২য় মুদ্রিত হয়েছে।

লেখা অনেক প্রবন্ধাদি তখনকার অনেক কাগজে প্রকাশিত হত। তাঁর একটি লেখায় তিনি আমাদের মস্ত সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, বলেছিলেন শিলাইদহে আমি নাকি একটি সত্যিকারের ভালো আমেরিকান ফার্ম গড়ে তুলতে পেরেছি।' দ্র. 'পিতৃস্মৃতি' ১৩৭৮ সং পৃ ১২২।

মাইরন ফেল্‌প্‌সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার সাক্ষাৎ ও আলাপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন সীতা দেবী। দ্র. 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ৯৩-৯৪, ১০৯।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে'র মুখবন্ধে বিপ্লব আন্দোলনে যুক্ত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা মার্কিন দেশে যে-সব বিদেশী মনীষীর সহানুভূতি ও সাহায্য' লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাইরন ফেল্‌প্‌সের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মাইরন ফেল্‌প্‌স্‌ নিউইয়র্কে "ইণ্ডিয়া হাউস" স্থাপন করেন। রাষ্ট্রপতি থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন লণ্ডনের বক্তৃতায় ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করেন তখন তিনি বহু খ্যাতনামা লোকের স্বাক্ষর সমন্বিত প্রতিবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। ইনি অবশেষে গেরুয়া কাপড় পরিয়া ভারতে আগমন করেন এবং সাত বৎসর অতিবাহিত করিয়া ভারতের মাটিতেই দেহরক্ষা করেন।' দ্র. 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' ১৩৯০ সং পৃ ৮।

'প্রবাসীর জন্য কবিতা'॥ চারুচন্দ্রকে 'একটি কবিতা পাঠাই' লিখলেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৫ জুলাই ১৯১০এর চিঠিতে 'প্রবাসীর জন্য চারুকে গুটি তিনেক কবিতা পাঠাইয়াছি' বলে উল্লেখ আছে। 'প্রণতি' (যেথায় থাকে সবার অধম দীনের চেয়ে দীন), 'সাধন' (ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে) এবং 'রাজবেশ' (রাজার মত বেশে) এই তিনটি কবিতা প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬৭ পৃ ৪০৯-৪১০এ প্রকাশিত হয়। শ্রাবণের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃ-অভিষেক'

কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। পৃ ৪০৭-৪০৮।

পত্র ১৮। 'তোমার গল্পটি' ॥ 'বন্ধু'। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৭ পৃ ৪২৭-৪৩৪। গল্পে 'মায়ার খেলা' ও 'পতিতা' কবিতা থেকে উদ্ধৃতি আছে। শ্রাবণের প্রবাসীতে চারুচন্দ্রের 'একটি মেহেদির গান' গল্প প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৯। 'কাল সকালের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি' ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, '২৫শে শ্রাবণ কবি কলিকাতায় যান, গীতাঞ্জলির শেষ কয়টি গান সেখানে রচিত।' বইয়ের পাদটীকায় রেলপথে ও কলকাতায় লেখা মোট পাঁচটি গানের (সংখ্যা ১৫২-১৫৪; ১৫৬-১৫৭) হিসেব আছে। 'রবীন্দ্রজীবনী' ২ ১৯৯৫ সং পৃ ২৯৬।

পত্র ২০। 'গীতাঞ্জলি…' ॥ 'গীতাঞ্জলি'র প্রকাশকাল ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭ বলে উল্লেখ আছে। 'গীতাঞ্জলি' ভাদ্রের প্রথম দিকেই নিশ্চয় প্রকাশিত হয়, প্রবাসী ভারতী দুই পত্রিকাতেই আশ্বিন সংখ্যায় বইখানি আলোচিত হয়েছিল।

'জীবনে যত পূজা…' ॥ রচনা ২৩ শ্রাবণ ১৩১৭, ১ম সং ১৪৭ সংখ্যক গান পৃ ১৬৭। প্রথম সংস্করণ বইয়ে অষ্টম ছত্রে 'হারাল ধারা' স্থলে 'হারাল ধরা' এই মুদ্রণপ্রমাদ লক্ষ্য করা যায়। সংশোধিত রূপে পুনরায় প্রবাসীতে প্রকাশিত: 'গান'। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭ পৃ ৬১০।

প্রসঙ্গত, ১১ মাঘ ১৩১৭ বুধবার একাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে রবীন্দ্রনাথের প্রাতঃকালীন বক্তৃতার শেষে 'জীবনে যত পূজা হল না সারা' গানটি গীত হয়েছিল। চৈত্র সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সংকলিত বক্তৃতার শেষে নয়টি গানের সপ্তম গান রূপে 'ভৈরবী-তেওরা' এই রাগতাল নির্দেশসহ গানটি দশ ছত্রে মুদ্রিত হয়। দ্র. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চৈত্র ১৮৩২ শক পৃ ১৯৫।

'মণিলাল'। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ।

পত্র ২১। 'লেখিকারা' ॥ লেখিকারা, পরের চিঠির সাক্ষ্যে, হেমলতা দেবী ও অতসীলতা, বা মীরা দেবী।[১]

'দুটো সংকলন…' ॥ এই সূত্রে ১ ভাদ্র ১৩১৭য় শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: 'হেমলতা বৌমা ও মীরা তাদের সেই সংকলনটার প্রতি মনোযোগ করে কি?' কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীর 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগে এই লেখিকাদের রচনাদুটি সম্ভবত ২১শে ভাদ্র ১৩১৭য় পাঠানো এই লেখা। আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতেও এই দুই লেখিকার দুটি সংকলন বেরিয়েছিল, সে নিশ্চয় আগের পাঠানো।

দ্র. প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭:

অতসী দেবী: 'ভারতের ভাগবতধর্ম্ম' (১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ধর্ম্ম-ইতিহাসের আন্তর্জ্জাতিক সভায় গ্রিয়রসন পঠিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম) পৃ ৫৩৮-৫৪০।

হেমলতা দেবী: 'জাপানে ভক্তিবাদের গুরু' (১৯০৮এর ধর্ম্ম-ইতিহাসের আন্তর্জ্জাতিক সভায় শ্রীযুক্ত আনেসাকি পঠিত প্রবন্ধের সারানুবাদ) পৃ ৫৪৯-৫৫৩।

প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৭:

হেমলতা দেবী: 'বাহ্য ধর্ম্ম' (ধর্ম্ম ও ইতিহাসের আন্তর্জ্জাতিক

---

১ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'লেখিকারা কাঁচা', বোধহয় হেমলতাকে তা তিনি মনে করতেন না, পরন্তু নির্ভর করতেন। দ্র. ২৩ আষাঢ় ১৩১৭ শিলাইদহ থেকে পুত্রবধূ প্রতিমাকে লেখা চিঠি: 'হেমলতার কাছ থেকে বাংলা গদ্য ও পদ্য কিছু কিছু পড়ে যেয়ো।' চিঠিপত্র ৩ পৃ ১। হেমলতার কবিখ্যাতি হয়েছিল এরই মধ্যে। তাঁর প্রথম কাব্য 'জ্যোতিঃ' ১৩১৭ পৃ ৯৬ মূল্য ॥৵০ (রবীন্দ্রনাথের দেওয়া গ্রন্থনাম) প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ পৃ ২০৮এ মুদ্রারাক্ষস কর্তৃক আলোচিত হয়।

সভায় মিস্ রোজেনবর্গ কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত) পৃ ৩২-৩৫।

অতসী দেবী: 'হিন্দু ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি' (ধর্ম্ম ও ইতিহাসের আন্তর্জ্জাতিক সভায় সার আলফ্রেড লায়াল কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত) পৃ ৩৫-৩৯।

'চোখের বালি ও নৌকাডুবি' ॥ ১৯১০এর গোড়াতে চারুচন্দ্র প্রবাসী-মডার্ন রিভিউয়ের সহ-সম্পাদক রূপে যোগ দিলে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের কলকাতার কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন[১] এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে অতঃপর রবীন্দ্রনাথের পুস্তকসমূহ ছাপা হতে থাকে।

চোখের বালি। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস সং জুন ১৯১০ ক্রাউন ১৬ পেজি পৃ ২+৩১০।

নৌকাডুবি। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস সং জুন ১৯১০ ক্রাউন ১৬ পেজি পৃ ২+৩৬৮।

পত্র ২২। 'রেজেষ্ট্রি ডাকে দুটি সংকলন...' ॥ সংকলন দুটি অগ্রহায়ণে নয়, প্রবাসী পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যা থেকে 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগনাম নেই।

অতসী দেবী: 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' (১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ইণ্ডিয়ান রিভিয়ুতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মুশীর হোসেন কিদ্‌বাই লিখিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত) প্রবাসী, পৌষ ১৩১৭ পৃ ৩৪৮-৩৪৯।

হেমলতা দেবী: 'ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজে হিন্দুয়ানীর মিশ্রণ' (ধর্ম্ম ও ইতিহাস আলোচনার আন্তর্জ্জাতিক সভায় পঠিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত)। প্রবাসী, পৌষ ১৩১৭ পৃ ৩৪৯-৩৫৩।

'মাতৃশ্রাদ্ধ' ॥ প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৭ পৃ ১-৪। 'শান্তিনিকেতন' দ্বাদশ খণ্ডে (১৯১১) সংকলিত পৃ ১৯-৩৪।

---

১ আসলে ইণ্ডিয়ান প্রেসের কলকাতা শাখায় অংশীদার।

'মাতৃশ্রাদ্ধ' শান্তিনিকেতন মন্দিরে ১৮ ভাদ্র ১৩১৭ বুধবারে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই ভাষণ 'আশ্রমের ছাত্র হীতেন্দ্র হীরেন্দ্র নরেন্দ্র ও মণীন্দ্রনাথ নন্দীর মাতা, মথুরানাথ নন্দীর পত্নী যোগমায়া দেবীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মন্দিরে কথিত। কবির সহিত তৎকালীন কর্মী ও ছাত্রদের সম্বন্ধ কী গভীর ছিল, তাহা উক্ত ভাষণ হইতে বুঝা যায়।' রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ড ১৩৯৫ সং পৃ ২৯৬।

'সত্যেন্দ্রকে…' ॥ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পত্র ২৩। 'আমার লেখা সম্বন্ধে…' ইত্যাদি ॥ রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে চারুচন্দ্রের প্রবন্ধ।

সম্ভবত আশ্বিন ১৩১৭র অভিনয়ানুষ্ঠানের আগেই চারুচন্দ্রের লেখাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা হয়, মনে হয় লেখাটি তিনি দেখেছিলেন বা লেখার বিষয় তাঁকে জানানো হয়েছিল এবং প্রবাসীতে ওই লেখা মুদ্রণে এর পূর্বেও তিনি কুণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অস্বাচ্ছন্দ্য জানতে পেরে চারুচন্দ্র কলিকাতা দেবালয় সমিতির ৩০ ভাদ্র ১৩১৭ / ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০এর বক্তৃতা সভায় তাঁর লেখা পাঠ করেন। সভার প্রতিবেদনে বলা হয়:

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০: শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, 'রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে' নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি বড়ই মধুর হইয়াছিল।

কার্তিক সংখ্যা দেবালয়ে চারুচন্দ্রের বাইশ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। 'রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে'। দেবালয়,[১] কার্তিক ১৩১৭ পৃ ১৪৮-১৬৯।

---

১ 'দেবালয়'। শান্তা দেবী লিখেছেন, 'প্রবাসী অফিসের পাশের বাড়িতে তখন তিনতলায় থাকিতেন পণ্ডিত সীতারাম তত্ত্বভূষণ সপরিবারে।… তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নীচের তলায় দোতলায় থাকিতেন সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চারুচন্দ্র 'রবীন্দ্রনাথের জন্য উচ্চতম কবির সিংহাসন দাবি' করেছিলেন, কোন্ কোন্ লক্ষণে তিনি বিশ্বের উচ্চতম বা শ্রেষ্ঠ—তাই তাঁর প্রবন্ধের বিষয়। এইভাবে তাঁর প্রবন্ধের শুরু : 'কিছুকাল হইতে বাংলার সাহিত্যসেবিগণ সবিস্ময়ে শুনিতেছেন যে বাংলার দুজন শ্রেষ্ঠ মনীষী—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার [নাথ] [১]শীল ও শ্রীযুক্ত

বাড়িটা তাঁহারই ছিল, কিন্তু তিনি দেবালয় নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন উদ্দেশ্যে বাড়িটি দান করিয়াছিলেন। একতলায় দেবালয় গৃহ ছিল। সেই গৃহের একদিকে ছিল লাইব্রেরী এবং আর একদিকে উপাসনা ও বক্তৃতাদির স্থান। দেবালয়ে বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা, সুন্দরীমোহন দাসের 'নৌকাবিলাস' প্রভৃতি কথকতা, New Thought প্রচারক আমেরিকান মহিলাদের বক্তৃতা ও পুস্তিকা বিতরণ, মহারানী সুনীতি দেবীর কথকতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তৃতা এবং বৈষ্ণব ভক্তদের পাঠ ও মালপোয়া বিতরণ মাঝে মাঝে হইত। অন্যান্য অনেক বক্তা, গায়ক ও কথকদের কথাও নিয়মিত হইত। দুইবার ইঁহারা রবীন্দ্রনাথকেও আনিয়াছিলেন।' 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৫২।

দেবালয় সমিতির বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে—:

দেবালয় সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলন-মন্দির।

দেবালয়ের সভা-সমিতিতে কখনও রাজনৈতিক বক্তৃতা ও আলোচনা হইবে না।

দেবালয় হইতে 'দেবালয়' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। দেশের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ ইহার নিয়মিত লেখক।

দেবালয় কর্ম্মস্থান— ২১০/৩/২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাঠকগণ দেখিবেন দেবালয়ের একটু বিশেষত্ব আছে। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক।

প্রসঙ্গত, দেবালয় পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ অন্যতম লেখক ছিলেন। দেবালয়ের বক্তৃতাসভায় রবীন্দ্রবান্ধবদের অন্যতম ডব্লু ডব্লু পিয়ার্সন চারুচন্দ্রের পরেই বক্তৃতা করেছেন। ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব' নামে রবীন্দ্র-বিরোধীদের ধূমোৎপাদনকারী পুস্তিকার রচনাটিও দেবালয়েরই এক অধিবেশনে পঠিত হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি— সমসাময়িক সমগ্রজগতে তাঁহার তুল্য প্রতিভাবান কবি কেহ প্রাদুর্ভূত হন নাই। বাঙালার এত বড় সৌভাগ্য সহজে বিশ্বাস করিবার নহে; আবার যাঁহারা এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা বিশ্বসাহিত্যের সহিত এমনি ঘনিষ্ঠ পরিচিত যে, তাঁহাদের কথাও অবিশ্বাস করিবার জো নাই। এই কথাটি কোন্ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই আলোচনা করিয়া দেখানোই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।'

চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে স্থির করেছিলেন তাঁর কাব্যের অনন্য অধ্যাত্মভূমি— 'যাহা সামান্যতা পরিহার করিয়া ভূমানন্দের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে,... যাহা বিশ্বের ভিতর দিয়া মানবমনকে বিশ্বেশ্বরের চরণপদ্মের অভিমুখিন করে। ইহা ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সাধনা। এবং এই লক্ষণটি আমরা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই পরিস্ফুট দেখিতে পাই।'

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা মতো পরের মাসেই সাহিত্য পত্রিকা চারুচন্দ্রের রচনাকে আক্রমণ করেন :

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে' নামক স্তবে দেবালয়ের চাতাল হইতে চূড়া পর্যন্ত বোঝাই হইয়া গিয়াছে। 'চারু' প্রথমেই একটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন, 'শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি— সমসাময়িক সমগ্র জগতে তাঁহার তুল্য প্রতিভাবান কবি কেহ প্রাদুর্ভূত হয় নাই।' বিজ্ঞানাচার্য ডাক্তার রায় উদক্ষার যান যবক্ষার যানের সাহায্যে বকযন্ত্রে এই মত প্রতিপন্ন করিলে, সত্যই বাঙ্গালীর বুক দশ হাত হইয়া উঠিবে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল সমালোচনায় এই মত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে বাঙ্গালী জগতের

সাহিত্যের দরবারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। 'সাময়িক সমগ্র জগৎ' যতই উদ্ভট হউক, সেই জগতের সমগ্র সাহিত্যের এমনতর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও তুলনায় সমালোচনা করিবার শক্তি এ মরজগতে সকলের নাই। আমরা ত আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখিতেই পারি না! অতএব, বাঙ্গালীর এই গৌরবটুকু অম্লানবদনে পরিপাক করিতে চেষ্টা করিব। আর 'বিশ্বসাহিত্যের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ' মনীষী শীল ও ডাক্তার রায় চারু সমালোচককেও সমসাময়িক সমগ্র জগতের 'একমাত্র সমালোচক' বলিয়া স্বীকার করিবেন, সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ নাই! রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাশালী কবি, কিন্তু তাঁহার সকল কবিতাই কামধেনুর মত দোহন করিলে 'আধ্যাত্মিক' দুগ্ধ দান করে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

দীর্ঘ বিস্তারের পর আলোচনার শেষে লেখা হয়েছিল :

হে ভগবান্! রবীন্দ্রনাথ নবযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব; তুমি তাঁহাকে চারু-সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ স্তাবকতা, নির্জ্জলা খোসামুদি ও নিরবচ্ছিন্ন বিড়ম্বনার নরক হইতে উদ্ধার কর।

'মাসিক সাহিত্য আলোচনা'। সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১৭।

পত্র ২৪। জ্বর ও বিদ্যালয়ের আসন্ন অভিনয়ের কথা একই কালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন পুরোনো ছাত্র অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে, পত্রখানি উদ্‌ধৃত করি :

কল্যাণীয়েষু,

আমার শরীর ভাল চল্‌চেনা। মাঝে দুবার জ্বরে পড়েছিলুম—ম্যালেরিয়া নয়। এখনো দুর্বল আছি।

বিদ্যালয় ১৭ই আশ্বিন বন্ধ হবে। তারপরে কলকাতায় যাব। ছুটিতে কোথায় থাকব এখনো ঠিক করতে পারি নি। সম্ভবত শিলাইদহে যাব।

এখানকার খবর ভাল। ছেলেরা ছুটির পূর্বে একটা কিছু

অভিনয় করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে। তোমার শরীর ভাল আছে ত?

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৪ঠা আশ্বিন ১৩১৭

পত্র ২৫। 'ঠিক নামটা লিখলুম কিনা জানি নে···। ঠিক নাম সম্ভবত *International Socialist Review*, শিকাগো থেকে ১৯০০ সালে প্রকাশারম্ভ। অপর যে-সব পত্রিকার উল্লেখ এই পত্রে আছে তার মধ্যে নীচের পত্রিকাগুলির পরিচয় এইরূপ :

Literary Digest, নিউ ইয়র্ক, প্রকাশারম্ভ ১৮৯০-

American Weekly '(নামটা ভুলে যাচ্চি)' সম্ভবত *American Magazine*, নিউ ইয়র্ক ১৮৭৬-

Nation, লণ্ডন ১৯০৭- (এই কাগজখানি ১৯২১ থেকে *Athenaeum* কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে *Nation and Athenaeum* নামে প্রকাশিত হতে থাকে), অথবা

Nation, নিউ ইয়র্ক ১৮৬৫-

The Strand Magazine (সচিত্র মাসিক), লণ্ডন ১৮৯১-

Pearson's Magazine, লণ্ডন ১৮৯৬-

Pall Mall বা *The Pall Mall Magazine* মাসিক, লণ্ডন ১৮৯৩-

ইত্যাদি- প্রসঙ্গত ১৩১৭য় প্রবাসীর সংকলন এই-সব পত্রিকা থেকে করা হয়েছিল উল্লেখ পাওয়া যায় :

হিবার্ট জার্নাল, ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন, পিয়ার্সন্‌স্ ম্যাগাজিন, পল মল ম্যাগাজিন, স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন, সায়েন্টিফিক রিভিয়ু, উইণ্ডসর ম্যাগাজিন, ফর্টনাইটলি রিভিয়ু, হিউম্যানিটারিয়ান রিভিয়ু, লিটারারি ডাইজেস্ট, মডার্ন রিভিয়ু, স্ক্রিবনার্স ম্যাগাজিন, ইণ্ডিয়ান রিভিয়ু, ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন ও ফরাসি লা রেভ্যু পত্রিকা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকলন)। 'ধর্ম-ইতিহাস আলোচনার আন্তর্জাতিক সভায়

পঠিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত' বলে কোনো কোনো রচনার উল্লেখ আছে, সে প্রবন্ধের আকর পত্রিকার উল্লেখ নেই।

পৌষ ১৩১৭ সংখ্যা থেকে 'সংকলন ও সমালোচনা' এই বিভাগ নাম বর্জিত হয়, কিন্তু সংকলনের রচনাসমূহ যথারীতিই প্রকাশিত হতে থাকে।

পত্র ২৬। 'এখানে একটা লেখাতে হাত দিয়েছি··· জিনিষটি একটি ছোট নাটক···'॥ ২ কার্তিক ১৩১৭য় সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা চিঠি: আজ থেকে নাটক লেখায় হাত দিয়েছি— কিন্তু এখানে সমস্ত দিন আমার ছাতের উপরকার খোলা ঘরটাতে বসে কেবলি সমুখের দিগন্তশয়ান পদ্মা ও অন্য তিন দিকের শস্যপরিপূর্ণ সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়েই সময় কেটে যায় কোনো কাজ করতেই ইচ্ছা যায় না।[১]

ইন্দুলেখা দেবীকে লেখা চিঠি ১২ কার্তিক ১৩১৭:

শিলাইদহে এসে ভাল বোধ হচ্চে। বাড়ির ছাতের উপর একটি ছোট ঘর আছে সেইখানে আমি থাকি। চারিদিকের দরজা খুলে দিলে সম্মুখে পদ্মা নদী— ও অন্য দিকে মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকেরা আমাকে একটা নূতন নাটক লেখবার জন্যে ধরেছেন— তাই একটু একটু করে লিখি— লিখ্‌তে ইচ্ছা করে না— অধিকাংশ সময় চুপ করে বসেই কাটে।'[২]

নাটকটি 'রাজা' নাটক।

'টুকরো করে কাগজে দিলে কারো ভালো লাগবে না'॥ সম্ভবত সাহিত্য পত্রিকার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় লেখা। প্রবাসীতে ধারাবাহিক 'গোরা' এবং অপর একখানি নাটকের সূত্রে সাহিত্য লিখেছিলেন, 'ক্রমশ প্রকাশে নাটক একেবারে খুন হইয়া থাকে; উপন্যাসও জখম হইয়া যায়।' 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা', সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৫।

---

১ রবীন্দ্রভাবনা, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা পৃ ১২।

শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ পৃ ১৬৮।

স্মরণীয়, পরের বছরে প্রবাসীতে একত্রে এক সংখ্যায় সমগ্র 'অচলায়তন' নাটক প্রকাশিত হয়েছিল।

'রবিবাবুর সাহিত্যিক শক্তির হ্রাস হচ্ছে…'॥ এই কথাও সম্ভবত সাহিত্য পত্রিকার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া। প্রবাসী ভাদ্র ১৩১৭য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতার সূত্রে সাহিত্য লিখেছিলেন, 'স্বাক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম রবীন্দ্রনাথের রচনা। নতুবা বিশ্বাস করিতাম না। ইহাতে কবিবরের প্রতিভার পরিচয় নাই।… শিক্ষানবীশ ও রবীন্দ্রনাথের অনুকারীদের রচনাতেও এত অক্ষমতা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিষ্ঠাপন্ন কবিও এই অপচারগুলি মুদ্রিত করিতে লজ্জিত হন নাই— কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।' 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা', সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৭ পৃ ৪০১।

'শারদোৎসব'॥ রচনা সম্পন্ন ৭ ভাদ্র ১৩১৫। প্রথম অভিনয় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ১৩১৫ পূজাবকাশের পূর্বে, এই অনুষ্ঠানে চারুচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন এবং কবিকে নাটকের একটি নান্দী রচনায় প্রবৃত্ত করেছিলেন। দ্র. 'রবিরশ্মি— পশ্চিম ভাগে' পৃ ৮৮-৮৯।

'শারদোৎসব' নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল।

পত্র ২৭। 'যথাস্থানে…'॥ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির কাছে।

'ছুটি শেষের আর দেরি নেই…'॥ এ বছরে পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় পুনরারম্ভ ২৯ কার্তিক ১৩১৭, ১৫ নভেম্বর ১৯১০। অতএব 'রাজা' লেখার কাল শিলাইদহে ১৩১৭র পূজাবকাশে, ২ কার্তিক থেকে ২৫শে কার্তিক, ২৪ দিনে। প্রবাসীতে সমালোচিত মাঘ ১৩১৭। শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনয় ৫ চৈত্র ১৩১৭ (১৯ মার্চ ১৯১১)।

'অজিতের ফিরে আসা…'॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৯১০ সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা করেন, অক্টোবরে অক্স্‌ফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে ভর্তি হন। ব্যাধির কারণে অবিলম্বে

তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। ১৯১১ জানুয়ারির প্রথম দিকে তিনি দেশে এসে পৌঁছন।[১] অজিতকুমারের 'অ' স্বাক্ষরিত অনেক সংকলনই প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ২৮। চারুচন্দ্রের বড়ো ছেলে প্রেমোৎপল ১৯১০ সালের শেষ দিকে শান্তিনিকেতনে পড়তে যান। প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৮৩) পরে যশস্বী লেখক হয়েছিলেন।

পত্র ২৯। মাঘোৎসব উপলক্ষে কলকাতায় এসে বোলপুরে ফিরে গিয়েছিলেন, তার পরেই আবার এই সময়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন, এই পত্রে লক্ষ্য করা যায়। দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড ১৩৯৫ সং পৃ ৩১১।

পত্র ৩০। 'নানাবিধ লেখা... ব্যাকরণ...' ইত্যাদি॥ ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৭য় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, প্রবাসী, মানসী, দেবালয়, মডার্ন রিভিউ, সঙ্গীত-প্রকাশিকা ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখার একটি তালিকা প্রশান্তকুমার পাল করে দিয়েছেন, দ্র. 'রবিজীবনী' ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৯০ পৃ ১৯৫, ২০৪। ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধ ১৩১৮য় পর পর প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৩১। 'আমার বিবাহের সংকল্প...'॥ ইতোপূর্বেই 'বেঙ্গলী' পত্রে প্রকাশার্থ তার সহ-সম্পাদক বাবু পদ্মিনীমোহন নিয়োগী সমীপে এই প্রতিবাদ-পত্রখানি রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন :

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছি, এরূপ সম্পূর্ণ

---

১ বিলাত থেকে লেখা সংরক্ষিত শেষ চিঠিতে অজিতকুমার লিখেছেন তাঁর বোম্বাই পৌঁছবার কথা ৬ জানুয়ারি ১৯১১। সুয়েজের পথে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১০এর পত্র থেকে সাউথ হিল পার্ক হ্যাম্পস্টীড থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯১০এ

অমূলক সংবাদ কোনো বাংলা সংবাদপত্রে প্রচার করা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি— দয়া করিয়া আপনাদের পত্রে ইহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। ইতি ৫ই শ্রাবণ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরে আমেরিকা থেকে ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯এর একখানি পত্রেও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে পরিহাস করে লিখেছেন :

কল্যাণীয়েষু/মণিলাল— বেশ দেখা যাচ্ছে এ জগৎ সংসারে ডাকঘর বিভাগের কর্ত্তা মনোযোগ পূর্ব্বক কাজ দেখেন না। আমার শুভ পরিণয়ের খবর এবং নিমন্ত্রণপত্র যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ধন্য কিন্তু বর এখনো পান নি— এবং যদি বধূ কেউ থাকেন তাহলে তাঁরও হস্তগোচর হয় নি…' ইত্যাদি। দ্র. পুলিনবিহারী সেন -সংকলিত 'পত্রাবলী'। শারদীয় দেশ পত্রিকা ১৩৭৩ পৃ ২২, ৩১।

অর্থাৎ এই প্রচার বেশ কতক দিন স্থায়ী হয়েছিল বোঝা যায়।

'নরেন্দ্র সেন মহাশয়ের কাগজ…'॥ নরেন্দ্রনাথ সেন, রায়বাহাদুর (১৮৪৩-১৯১১)। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগের অন্যতম সদস্য নরেন্দ্রনাথ ১৯০৫এ টাউন হলের বয়কট প্রস্তাব সভার সভাপতি হয়েছিলেন, পরে স্বদেশী আন্দোলনের চরমপন্থীদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। নরেন্দ্রনাথ প্রতাপ মজুমদারের পর 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র সম্পাদক, পরে ওই কাগজের স্বত্বাধিকারী হয়েছিলেন। এই চিঠির 'নরেন্দ্র সেন মহাশয়ের কাগজ…' সরকারি মুখপত্র 'সুলভ সমাচার' নামে সাপ্তাহিক পত্র। অবিনাশচন্দ্র দাস লিখেছেন :

পত্র— রবীন্দ্রনাথের কাছে অজিতকুমারের লেখা এই যাত্রা-পরিচ্ছেদের মোট বারোখানি পত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

বাঙ্গালী পাঠকগণের জন্য একটা সুলিখিত ও সুপরিচালিত বাঙ্গালা কাগজের অভাব তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন। এই কারণে, গভর্মেণ্ট যখন একখানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায় করিয়া নরেন্দ্রবাবুকে তাহার সম্পাদন ও পরিচালন-ভার গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তখন তিনি সে অনুরোধ অবহেলা করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই।... "সুলভসমাচারে"র ন্যায় একখানি বহুজনপাঠ্য সংবাদপত্র প্রকাশিত করিতে গেলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। ইচ্ছা থাকিলেও, অর্থাভাবে এইরূপ সংবাদপত্র প্রকাশিত করিবার সংকল্প অনেককেই ত্যাগ করিতে হয়। গভর্মেণ্ট যখন সেই অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন এবং নরেন্দ্রবাবুকে পত্র সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি লোকসাধারণের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তই তাঁহার চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার এই সুযোগ ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। "সুলভসমাচারে"র সম্পাদনভার গ্রহণ করায়, অনেকেই তাঁহাকে গালাগালি দিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু তিনি যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন, কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, তাহাই দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রহিলেন...'।

'স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন'। বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১৮ পৃ ৪১৩-৪২১।

'রাজা অভিনয়' ॥ প্রথম অভিনয় শান্তিনিকেতন, ৫ চৈত্র ১৩১৭। চারুচন্দ্র গিয়েছিলেন।

পত্র ৩২। 'বর্ষশেষের দিনে...' ॥ বর্ষশেষের উৎসবে কলকাতা থেকে সমাজপাড়ার মেয়েরা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে অভিভাবক করে 'রাজা' দেখতে আসেন, শান্তা দেবী সেই বিবরণ রক্ষা করেছেন তাঁর রামানন্দ-জীবনীতে :

'গোরা'র যুগের পর রবীন্দ্রনাথের নামে তখন ছেলেমেয়েরা পাগল। তিনি স্বয়ং অভিনয়ে নামিবেন একথাও কানে আসিল। কে যে প্রথম কথাটা পাড়িয়াছিলেন মনে নাই। বোধ হয় একটি বিবাহ-

সভায় ডাঃ নীলরতন সরকারের কন্যা নলিনী ও রামানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাত্রেই পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন শান্তিনিকেতনে যাইতেই হইবে।... কিন্তু ছোট ছোট মেয়েদের একলা ত যাইতে দেওয়া হইবে না। রামানন্দ ছিলেন এই সব অর্বাচীনদের বন্ধু। তাহারা গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল।... সুতরাং ছয়-সাতটি বালিকার অভিভাবক হইয়া তিনি আশ্রমে চলিলেন।

শান্তা দেবী অভিনয়েরও বর্ণনা দিয়েছেন:

সেবার প্রথম 'রাজা' অভিনয় হয়। মাটির 'নাট্যঘরে' খড়ের চালের তলায় নবীন কিশলয়ে ও সদ্য তোলা পুষ্পদলে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে গান ও অভিনয় যেন আতস-বাজির ফুলের মত ঝলমল করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সেবার (এখন জষ্টিস) সুধীরঞ্জন দাস হইয়াছিলেন 'সুদর্শনা' এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'কাঞ্চীরাজ'। অভিনয়ের আগে-পরেও রবীন্দ্রনাথের আনন্দ বিতরণের কি সমারোহ! অতিথিশালার উপরের ঘরে বসিয়া একসঙ্গে পঞ্চাশটা পর্যন্ত গান তিনি গাহিয়া গেলেন। অতিথিদের সঙ্গে করিয়া সমস্ত আশ্রম নিজে দেখাইলেন। তাঁর আতিথ্য, তাঁর সৌজন্য, তাঁর বাৎসল্য, তাঁর কর্মমাধুর্য, তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর দৈহিক ক্ষমতা, তাঁর প্রসন্নতা কিছুরই যেন সীমা ছিল না। 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৬০।

সুধীরঞ্জন দাস 'রাজা'র অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেলেন, তাঁর লেখাতেও এই অনুষ্ঠানের কথা আছে। তিনি লিখেছেন, 'মনে পড়ে আমরা যখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠলাম তখন "রাজা" অভিনীত হয়েছিল। সে অভিনয়ে খুব লোকসমাগম হয়েছিল। কলকাতা থেকে আশ্রমবন্ধু বহু অতিথি এসেছিলেন। আমাদের অভিনয় শেখাতে গুরুদেব খুব বেশি পরিশ্রম করেছিলেন...'।

'জগদীশ...'। জগদীশচন্দ্র বসু।

'রাম, হনুমানের উপদ্রব…' ॥ সরকারি নেকনজর, সেই সঙ্গে সরকারি গুপ্তচরদের তৎপরতা—এই রাজকীয় শনির সন্দেহদৃষ্টি নিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ২৩ কার্তিক ১৩১৮ তারিখের চিঠিতেও উল্লেখ পাওয়া যায় :

'আমাদের বিদ্যালয়ের পরেও এতদিন পরে গোপনে রাজদণ্ডপাত হইয়াছে…'। এবং 'গুপ্তচর বিদূষকের দল যেখানে রাজাকে কানে ধরিয়া চালাইতেছে সেখানে রাজ্যশাসনের সেই নিদারুণ প্রহসন কোন্ দানবীয় অট্টহাস্যে গিয়া সমাপ্ত হইবে!' দ্র. চিঠিপত্র ১২য় মূল পত্র এবং টীকা পৃ ১৪-১৫, পৃ ৪৫৭।

পত্র ৩৩। 'নববর্ষ' ॥ প্রবাসী, ১৩১৮ পৃ ১২৬-১২৯। ওই লেখাই 'অন্তরের নববর্ষ' নামে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ পৃ ৩১-৩৪এ প্রকাশিত হয়। 'শান্তিনিকেতন' চতুর্দশ খণ্ডে সংকলিত।

'সত্যেন্দ্রের নওরোজি' ॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : 'ইরানে নওরোজ'। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৮। 'নওরোজের গান' নামে 'মণি-মঞ্জুষা'য় (১৯১৫) সংকলিত।

From the Bottom Up… ॥ The Life of Washington Irving. তু. বিলাতপ্রবাসী অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা পত্র : 'এখানে আমি বইহীনতার নির্জ্জন দ্বীপে রবিন্‌সন ক্রুশো হয়ে বসে আছি। পড়বার উপযুক্ত একখানি বই সঙ্গে ছিল সেটি দুদিনেই শেষ করেছি। বইটির নাম *From the Bottom Up*। পড়ে খুবই উপকার পেয়েছি। য়ুরোপের যেখানে মহত্ত্ব এবং আমাদের যেখানে দৈন্য এই বইটিতে সেই জায়গাটা খুব বড়ো করে দেখিয়ে দেয়…' শিলাইদহ ১৯ অক্টোবর ১৯১০।

'উলুউলু মাদারের ফুল…' ॥ 'উলু উলু মাদারের ফুল / বর আসচে কতদূর…' -ইত্যাদি, বাংলা ছড়া।

পত্র ৩৪। 'একেবারে আমার জীবনে…' ॥ 'জীবনস্মৃতি'।

সদ্য সম্পন্ন 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর ১৩১৮র জন্মোৎসবে কলকাতা থেকে আসা অভ্যাগতদের পড়ে শোনান। শান্তা দেবী লিখেছেন: 'ফিরিবার সময় রামানন্দ প্রবাসীতে "জীবনস্মৃতি" প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।' প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক হিসাবে চারুচন্দ্র সম্ভবত রামানন্দের ইচ্ছা তাঁকে পুনরায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

'ব্যাকরণের একটা কিস্তি…' ॥ কয়েকদিন আগেই রামানন্দকে লেখেন: 'ব্যাকরণের প্রথমাংশ পুনরায় সংশোধন করিয়া লিখিতে হইবে— এইজন্য এবার দেওয়া সম্ভব হইবে না— জ্যৈষ্ঠে যাইবে।'

এই পত্রে দেখা যায়, জ্যৈষ্ঠের আরম্ভে সে লেখা প্রস্তুত হয়েছে। প্রবাসী, আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্‌রূপ' ছাপা হয়।

'বড়দাদার লেখা…' ও প্রুফ ॥ লেখা 'গীতাপাঠ'।

বৈশাখ ১৩১৮ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ' যুগপৎ প্রবাসী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। সম্ভবত স্থির হয়েছিল প্রবাসীতে পাঠানো পাণ্ডুলিপির প্রুফ থেকে তত্ত্ববোধিনীর ছাপা হবে। রামানন্দকে এক সপ্তাহ পরে লিখেছেন: 'চারুকে বলিয়া দিবেন, বড়দাদার লেখাটা কম্পোজ হইবামাত্র সেটা ছাপিবার জন্য যেন তত্ত্ববোধিনীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮'।

'নূতন নাটক…' ॥ 'অচলায়তন'।

পত্র ৩৫। 'আপনার জীবনটা চাই…' ॥ চারদিনের মধ্যে "জীবনস্মৃতি"র জন্য দ্বিতীয় তাগাদা।

Halliday সাহেব ॥ বাংলা প্রদেশের প্রথম লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর বা ছোটোলাট (১৮৫৪-১৮৫৯) সার ফ্রেডারিক জেম্‌স্ হ্যালিডে।

'এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কি…' ॥ মৌখিক ইচ্ছা প্রকাশ ছাড়া

রামানন্দ লিখিতভাবেও সম্ভবত 'জীবনস্মৃতি'র জন্য অনুরোধ করেন। চারুচন্দ্রের লেখা এই চিঠির তিনদিন পর রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'আমার জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার ঐ লেখা নকল করিয়া মফঃস্বলে কোনো সভায় আমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার অযথা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের পূর্ব্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা ভাল ...।'

'মাতা সীতাকে জানিয়ো...'। এ বাবদে সীতা দেবীর জবানি উদ্‌ধৃত করি, ১৩১৮র ২৫শে বৈশাখ দুপুরের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'নেপালবাবু আমাদের শিশুকাল হইতেই জানেন, এলাহাবাদে আমরা বহুকাল একই বাড়ীতে বাস করিয়াছিলাম। তিনি আদর করিয়া আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকেন। রবীন্দ্রনাথ যখন আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন, তখন আমি দাঁড়াইয়া নেপালবাবুর সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। কবি আমাদের সামনে আসিয়া নেপালবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি, আপনার এখানে এসে মাতৃসম্মিলন হল নাকি?" চারুচন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "উনি যে কেবল নেপাল-বাবুরই মা তা নয়, আমারও বটে।" সত্যই তিনি আমাকে স্নেহ করিয়া মা বলিয়া ডাকিতেন, এ স্নেহ তাঁহার জীবনান্তকাল পর্যন্ত ছিল।

'রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তাহলে আমিও একজন candidate হলাম।"'

১৩১৮র জন্মোৎসব থেকে ফিরে আসবার পর, সীতা দেবী লিখেছেন: 'আবার উৎসব হইলেই আমরা শান্তিনিকেতনে যাইব এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় বাবা সে-কথা রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, তাহার

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বাবাকে লিখিলেন, "উৎসব হলে তাঁরা আসবেন এ কোন কাজের কথা নয়, তাঁরা যখন আসবেন তখনই উৎসব।"

চারুচন্দ্রকেও একই কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'তিনি আমাদের আশ্রমে গিয়ে পীড়াভোগ করেছিলেন…' ॥ ১৩১৮র জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে গিয়ে শান্তা দেবী পীড়িত হয়ে পড়েন। পীড়ার বিষয়ে তিনি লিখেছেন :

২৩শে বৈশাখ রাত্রিতে বর্তমান লেখিকা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তাহাকে লইয়া তাহার পিতা অত্যন্ত ব্যস্ত, তাহাকে ফেলিয়া কোথাও যাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের ধারণা হইল হয়ত তাঁহাদের আতিথ্যের ত্রুটিতেই পীড়া হইয়াছে। তিনি রাত্রিতে তিন চার বার ডাক্তার লইয়া আসিলেন, ছেলেদের বলিলেন ভাল বিছানা করিয়া দিতে, ছেলেরা নিজেদের সমস্ত বালিশ বিছানা আনিয়া নীচু বাংলায় জড়ো করিল। কিন্তু দিনের বেলা পাঠের সভা গানের সভা অন্যত্র করিলে পীড়িতা বালিকা ও তাহার পিতা সভার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হন এই জন্য নীচু বাংলার বারান্দাতেই সভা হইতে লাগিল।

এই চিঠির পর ৯ই জ্যৈষ্ঠের চিঠিতে রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'মাতা শান্তার শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই শুনিয়া দুঃখ বোধ করিতেছি— তাঁহার এই অস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের আতিথ্য যদি কোনো অংশে দায়ী হয় তবে সে আমার পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের কথা।'

এর পরেও কুশল জানতে চেয়ে চারুচন্দ্রকে লিখেছেন, 'শান্তার শরীর কেমন আছে?' দ্র. পত্র ৩৯।

'"গোরা"র সমালোচনা' ॥ শ্রীতারকচন্দ্র রায় -কৃত। বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ১৭৪-১৮০।

তারকচন্দ্র 'পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে' ভারতসত্তা ও

ভারতবর্ষের যে একটা দোলাচল উপস্থিত হয়েছে 'গোরা' উপন্যাসে তার মধ্য থেকে একটা পথসন্ধান লক্ষ্য করেছেন :

কিভাবে সংস্কার করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত বর্তমান ভারতের বিরোধ না ঘটে, ইহা একটি কঠিন সমস্যা। আজি পর্য্যন্ত কেহ এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন বলিয়া জানি না। কিন্তু প্রশ্নটি যে অনেকের মনে জাগিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গোরা" এই প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে।

পত্র ৩৬। 'টুর্গেনেভের "মুমু"…' ॥ ইভান সের্গীভিচ তুর্গেনেভ (১৮১৮-১৮৮৩), 'মুমু' (১৮০৪) তাঁর কারাবাসকালে দাসপ্রথার অত্যাচার নিয়ে লেখা প্রসিদ্ধ গল্প। 'মুমু' প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় নি।

'এখানে ছুটিতে আছে ওকে দিয়ে আরো কতকগুলো জার্ম্মান ফরাসী ও রাশিয়ান গল্প তর্জ্জমা করাব…' ॥ এই সব তর্জমারও হদিশ পাওয়া যায় না। 'দিনেন্দ্র রচনাবলী'তেও (১৩৪৩ পৃ ৬+১২৪) দিনেন্দ্রনাথের কোনো 'গল্প তর্জ্জমা' সংকলিত হয় নি।

'ধর্ম্মতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধ' ॥ 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' (হিবার্ট জার্নাল হইতে সংকলিত)। শ্রীঅতসী দেবী। প্রবাসী. শ্রাবণ ১৩১৮ পৃ ৪৩০-৪৩৪।

তু. মীরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৬ শ্রাবণ ১৩১৮র পত্র : 'প্রবাসীতে তোর ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বেরিয়েছে— দেখেছিস ত ?' চিঠিপত্র ৪ পৃ ২৬।

'*From the Bottom Up* থেকে সংকলন[১]…' ॥

'ডাউলিং'। শ্রীঅতসী দেবী। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮ পৃ ৫৯৮-৬০১ (*From the Bottom Up* গ্রন্থে একজন আইরিশ পাদ্রি নিজের জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে আমেরিকায় ধর্ম

---

১ *From the Bottom Up*: The Life Story of Alexander Irving.

প্রচারে নিযুক্ত আছেন। নিউ ইয়র্কের যে সকল বাসাবাড়ীতে সেখানকার দীনতম ব্যক্তিরা আশ্রয় লইয়া থাকে সেখানে দীর্ঘকাল ইনি কাজ করিয়াছেন। সেইখানকার যে দুই-একজন ব্যক্তির বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ডাউলিং একজন।)

'দরিদ্র ডিউক' (সত্য ঘটনা, *The Bottom Up* গ্রন্থ হইতে)। শ্রীঅতসী দেবী। প্রবাসী, মাঘ ১৩২০ পৃ ৩৮২-৩৮৫।

'মোহিতবাবুর স্ত্রী'র কবিতা ॥ 'কবির প্রতি'। শ্রীসুশীলা দেবী।[১] প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ২৬৪-২৬৫।

'ক্ষিতিমোহনবাবুর গতিবিধি…' ॥ ক্ষিতিমোহন সেন চারুচন্দ্রের বন্ধু. শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তাঁর যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে চারুচন্দ্রেরও হয়তো কিছু ভূমিকা ছিল।

পত্র ৩৭। 'কবিকে…' ইত্যাদি ॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। পরের চিঠিতে দেখা যায়: 'সত্যেন্দ্রকে কবে এখানে পাঠাবার উদ্যোগ করলে আমাকে সত্বর জানিয়ো।' ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

পরে পরে আরো দেখা যায়:

'সত্যেন্দ্রের খবর কি? তাকে বিচলিত করতে পারা গেল না— যাকে বলে ধ্রুব সত্য।'

'সত্যেন্দ্রের শরীর ত ভাল আছে?' ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

মনে হয় এ যাত্রা সত্যেন্দ্রনাথের শিলাইদহে যাওয়া হয় নি।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী সম্বন্ধে অভিমত ॥ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ সংখ্যার যে-সব

---

১ মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা সেন 'কাব্যগ্রন্থে'র জন্য প্রস্তুয়মান 'শিশু' কাব্যের গুণগ্রাহী পাঠিকা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। মোহিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অস্থায়ী বালিকাবিভাগের তিনি কিছুদিন তত্ত্বাবধান করেন। তাঁর করা ইংরেজি রূপকথার তর্জমার প্রশংসা করেছিলেন এবং তার জন্য প্রকাশক সংগ্রহ করে দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

লেখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত ব্যক্ত করেছিলেন তার তালিকা এই রকম :

'জীবন-বৈচিত্র্য'। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ পৃ ১১৬-১২৫[১]।

'বুদ্ধদেব' (কবিতা)। শ্রীপ্রভাসকুমার ঘোষ পৃ ১২৫-১২৬।

'নববর্ষ' (শান্তিনিকেতন আশ্রমে নববর্ষের উৎসবে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১২৬-১২৯

'প্রকৃতি সুন্দরী' (কবিতা)। শ্রীহেমপ্রভা দত্ত পৃ ১২৯[২]

---

১ আগের রচনার পূর্বানুবৃত্তি, এই সংখ্যায় 'শৈশবে'র বিবরণ লেখা হয়েছে।

২ রবীন্দ্রনাথ যে কবিতার এতখানি বিশ্লেষণ করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া যেতে পারে :

প্রকৃতি সুন্দরী

ফুল আজি তব গন্ধে হয়েছে সুরভি।
তব লজ্জা আঁকিয়াছে রাঙা করি রবি।
নদী আজি গাহে তব হৃদয়ের গান
সকরুণ সুরে। লভিয়াছে নব প্রাণ
সকল জগৎ। মোর দগ্ধ তপ্ত হিয়া
তোমার চরণপ্রান্তে পড়িছে লুটিয়া
বিফল বেদনা ভরে। তোমার আহ্বান
ধ্বনিয়া তুলিছে আজি অভিনব তান
মৃদু-মন্দ সুরে মোর হৃদয়-বীণায়।
দূরে কোন মায়াপুরে কভু দেখা যায়
নীরব তোমার হাসি। ছল ছল আঁখি
কভু রচে মায়াজাল বেদনায় মাখি।
অনন্ত আকাশখানি তব রূপে ভরি
অতৃপ্ত নয়নদুটি করিতেছে পান।
কল্পনা এঁকেছে আজি তোমারে সুন্দরী
গোপন হৃদয়পটে ; প্রেম দেছে প্রাণ।

শ্রী হেমপ্রভা দত্ত

'নির্বাণ'। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ পৃ ১৩৫-১৪১[1]
'যযাতির স্বর্গপ্রাপ্তি' (নাট্যকবিতা)। শ্রীনিরুপমা দেবী পৃ ১৪২-১৪৫
'লাভ' (কবিতা)। শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী পৃ ১৫০
'মহাকর্ষণ'। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃ ১৬৩-১৬৯
'চন্দ্র ও সূর্য্য' (চতুষ্পদী কবিতা)। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ পৃ ১৬০
'দুই বন্ধু' (চতুষ্পদী কবিতা)। শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় পৃ ২০৩
'নমস্কার' (কবিতা)। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পৃ ১৮৭
'জন্মদুঃখী' (উপন্যাস) প্রথম পরিচ্ছেদ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পৃ ১৮৯-১৯৩[2]

'তোমার সমালোচনা': বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১৭য় প্রকাশিত তারকচন্দ্র রায়ের 'নব্য ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ' প্রবন্ধকে 'কষ্টিপাথরে'র মাসিকপত্র আলোচনা স্তম্ভে চারুচন্দ্র দেড় কলম ৭৪ লাইন ব্যাপী বর্জয়িস অক্ষরে 'চিন্তালেশহীন অক্ষম রচনা' বলে নিপাতিত করেছিলেন।

'লাভ' সনেটের লেখিকার অপর যে রচনাটি রবীন্দ্রনাথ 'প্রশংসার যোগ্য' বিবেচনা করেছিলেন সেটি প্রবাসীর পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়:

'অর্ঘ্য' (শ্রদ্ধাস্পদ কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত)। শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ২৬৫-২৬৬[3]

---

১ পরের সংখ্যায় সমাপ্য এই অংশে 'শাক্যসিংহের ধর্ম্মে'র প্রসঙ্গ আলোচিত।

২ ' 'জন্মদুঃখী' নরওয়ের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক Jonas Lie- রচিত *Livsslaven* নামক উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে'। প্রবাসীতে প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ - চৈত্র ১৩১৮, গ্রন্থাকারে ১৩১৯ পৃ ১৬২।

৩ প্রফুল্লময়ী দেবীর 'অর্ঘ্য' কবিত নিয়ে সাহিত্য পত্রিকা টিপ্পনি করেছিলেন: 'শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী রবীন্দ্রনাথকে "কবি-সম্রাট" উপাধি দিয়াছেন। যদি "সাহিত্যিক"দিগকে খাজনা দিতে হয় তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। আশা করি নূতন সম্রাট অওরঙ্গজেবের মত অপর পক্ষের উপর জিজিয়া কর ধার্য্য করিবেন না।' 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা', সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩১৮।

উল্লেখযোগ্য, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সুকুমার রায়-প্রণীত 'ফটোগ্রাফি' রচনাটির রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন নি।

পত্র ৩৮। 'তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল'॥ 'জীবনস্মৃতি' প্রবাসীতে সমর্পণ করার প্রসঙ্গ। একই দিনে ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮য় রামানন্দকে লেখা চিঠিতে লিখেছেন, 'জীবনস্মৃতি কপি করিতে দিলাম। এবং 'জীবনস্মৃতি' অনেকটা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে…' অর্থাৎ 'সমর্পণে'র এখনও কিছু দেরি।

'অজিতের প্রবন্ধ…'॥ রামানন্দকে লেখা পূর্বোল্লিখিত চিঠির পরের লাইনেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

…কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন— তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তিরূপে এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে।

অজিতকুমারের প্রবন্ধ প্রস্তুত হয়েছিল ১৩১৭ চৈত্রে। দ্র. মীরা দেবীকে লেখা শান্তিনিকেতন থেকে চৈত্র ১৩১৭য় রবীন্দ্রনাথের চিঠি :

'অজিত বোধ করি আমার জন্মদিনে আমার রচনা সম্বন্ধে কিছু একটা পাঠ করবে, তারই জন্যে আমার জীবনবৃত্তান্তের ও ভিন্ন ভিন্ন কাব্য-রচনার দিন ক্ষণ তারিখ নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে…'। চিঠিপত্র ৪ পৃ ১৯।

১৩১৮র রবীন্দ্রজন্মোৎসবে অভ্যাগতদের তিনি লেখাটি পড়ে শোনান। দ্র. সীতা দেবী : 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ২৪। আষাঢ়-শ্রাবণ দুই সংখ্যা প্রবাসীতে অজিতকুমারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

'রবীন্দ্রনাথ'। অজিতকুমার চক্রবর্তী। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ২৩৩-২৫৩ ও প্রবাসী, শ্রাবণ১৩১৮ পৃ ৩৪০-৩৫৯। গ্রন্থাকারে : 'রবীন্দ্রনাথ'। অজিতকুমার চক্রবর্তী। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ১৩১৯ পৃ ১০৫ মূল্য ॥০। প্রবাসীতে সমালোচিত আষাঢ় ১৩২০ পৃ ৩৮৪। গ্রন্থের 'নিবেদন' স্থলে লেখক বলেছেন :

'কবিবর স্বয়ং তাঁহাকে নূতন সংস্করণের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র লেখাটিকে গ্রহণ করিয়া আমাকে আশাতীতরূপে পুরস্কৃত করিয়াছেন। আমার ভক্তির এই তুচ্ছ অর্ঘ্য যে তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, ইহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।'

পত্র ৩৯। 'জ্ঞানের হাত দিয়ে...'॥ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তু. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮র চিঠি :

'কাল জ্ঞানের হাত দিয়া আমার জীবনস্মৃতির কপি আপনার কাছে পাঠাইয়াছি— বোধ হয় পাইয়াছেন।'

অর্থাৎ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ৩১শে মে 'জীবনস্মৃতি'র কপি প্রবাসীতে পাঠানো হয়েছে। চারুচন্দ্রকে লেখা এই চিঠি হয়তো ১৯শে জ্যৈষ্ঠের লেখা। সীতা দেবী জানিয়েছেন, '১৫ই কিংবা ১৬ই মে তিনি শিলাইদহ হইতে বাবাকে একখানি চিঠি লেখেন এবং "জীবনস্মৃতি" এক কিস্তি ডাকে আমার নামে পাঠাইয়া দেন।'

'আর বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে উল্লাস...'॥ ১৮ কার্তিক ১৩১৮র পত্রে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন, 'আমার সঙ-বর্দ্ধনা'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রদত্ত কবি-সংবর্ধনা, ১৪ মাঘ ১৩১৮য় কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত।

'ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে 'জীবনস্মৃতি...'॥ ভাদ্র ১৩১৮ থেকে শ্রাবণ ১৩১৯ পর্যন্ত বর্ষকাল ধরে প্রবাসীতে 'জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

'সাময়িকপত্রাদি…'॥ ১৮ জ্যৈষ্ঠের চিঠিতেই রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সাময়িক পত্র যাহা পান তাহার ব্যবহার শেষ হইয়া গেলে আমাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য আজই আপনাকে চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম এমন সময়ে আপনার পত্রে তাহার উল্লেখ পাইলাম।'[১]

প্রবাসীর জন্য 'সংকলন' লেখবার সূত্রে 'ব্যবহৃত' বা অব্যবহৃত সাময়িকপত্রাদি রামানন্দ বরাবরই পাঠিয়েছেন। রামানন্দের পাঠানো এই-সব পত্রিকা রথীন্দ্রনাথ সংগ্রহ ও রক্ষা করেছিলেন, দ্র. নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা রথীন্দ্রনাথের চিঠি।[২]

পত্র ৪০। 'আমার ব্যাকরণ…'॥ বৈশাখের কোনো সময় রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী-সম্পাদককে লিখেছিলেন, 'ব্যাকরণের প্রথমাংশ পুনরায় সংশোধন করিয়া লিখিতে হইবে—এইজন্য এবার দেওয়া সম্ভব হইবে না— জ্যৈষ্ঠে যাইবে।'

জ্যৈষ্ঠে চারুচন্দ্রকে লেখেন, 'ব্যাকরণের একটা কিস্তি এবার পাঠাই…'। সম্ভবত এতদিনে সে লেখা পাঠানো হয়ে উঠল।

'তির্য্যকরূপের মধ্যে যেরূপ আছে…'॥ প্রবাসী, আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্ রূপ' প্রবন্ধ।

'ব্যাকরণটা কি তোমরা ধারাবাহিক প্রকাশ করতে…'॥ ইতোপূর্বে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ভারতী, বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্বের ব্যাকরণ-লেখা নিয়ে 'গদ্যগ্রন্থাবলী'র পঞ্চদশ ভাগ রূপে 'শব্দতত্ত্ব' (১৩১৫) প্রকাশিত হয়েছিল। এই সূত্রে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' দ্বাদশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় স্থলে বলা হয়েছে: '১৩০৮ সালে বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত যে "আন্দোলনে"র সূত্রপাত হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ তাহার অগ্রণীস্বরূপ।' প্রবাসীর এই পর্যায়েও রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ব্যাকরণ

১ চিঠিপত্র ১২ পৃ ৯

২ 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ্য' ১৯৮৮ পৃ ২৫

প্রসঙ্গ লিখতে প্রবৃত্ত হন, ধারাবাহিকভাবে না হলেও তাতে এই কয়টি প্রবন্ধ পর পর প্রকাশিত হয়—

বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্ রূপ। আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ২২৪-২২৬

বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য। ভাদ্র ১৩১৮ পৃ ৪৬৯-৪৭৮

বাংলা নির্দ্দেশক। আশ্বিন ১৩১৮ পৃ ৬৭২-৬৭৪

বাংলা বহুবচন। কার্তিক ১৩১৮ পৃ ৯০-৯৩

স্ত্রীলিঙ্গ। অগ্রহায়ণ ১৩১৮ পৃ ১২০-১২২

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৮ সংখ্যায় (পৃ ৩৭৬-৩৭৭) সতীশচন্দ্র বসু 'কোন কোন স্থান ঠিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না' বলে 'তির্য্যক রূপে'র এক সমালোচনা লেখেন। অপর সব লেখার অনুবৃত্তি বা প্রতিক্রিয়া রূপে বিজয়চন্দ্র মজুমদার যোগেশচন্দ্র রায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাকরণপ্রসঙ্গ আলোচনাও প্রবাসীতে পিঠোপিঠি প্রকা।শত হয়েছিল।

'জিনিষটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করছি…'॥[১] সেই সঙ্গে লিখেছেন, তাতে 'বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ'ও ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন তবু বিদ্বৎজনের পরিতোষ যদি না হয়—

আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্য প্রত্যয়ং চেতঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ১. ৬।

'এবারকার কষ্টিপাথর…'॥ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীর 'কষ্টিপাথরে' তারকচন্দ্র রায় সম্বন্ধে তিরস্কার কিছু অতিশয় হয়েছিল, 'লাঠির বাড়ি'র বদলে 'এক কোপে সেরে দিলেই' ঠিক হত বলে রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করেছিলেন। তারকচন্দ্র ভারতী বঙ্গদর্শনেরও সংযুক্ত লেখক রূপে গণ্য ছিলেন।

---

১ 'জীবনস্মৃতি'র পূর্বতন খসড়ায় দেখা যায়, গ্রন্থসূচনাটি অন্যরকম ছিল। দ্র 'জীবনস্মৃতি' খসড়া। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ পৃ ১১০-১১১।

'শরৎবাবু···' ॥ শরৎকুমার রায়।

পত্র ৪১। 'সংশোধিত প্রুফ তত্ত্ববোধিনীতে···' ॥ ৫৫ নম্বর অপার চিৎপুর রোডস্থিত আদিব্রাহ্মসমাজের মুদ্রণালয় থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছেপে বার হত।

'সেই নাটকটা···' ॥ 'অচলায়তন'।

পত্র ৪২। 'Tourgenev-এর Triumphant Love নামক একটি সুবিখ্যাত গল্প···' ॥ 'প্রেমের জয়জয়ন্তী' (Turgenieuffএর *The Song of Triumphant Love* গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে)। শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৮ পৃ ৫১০-৫২২। *The Song of Triumphant Love* (১৮৮১) গুস্তাভ ফ্লবেরের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গিত। তুর্গেনেভের শেষ জীবনের গল্প। তাঁর 'আসীয়া' বা 'ফার্স্ট লাভ' ইত্যাদির তুলনায় অপূর্ণতাবহ বলে মনে করা হয়, খানিকটা লীডার বা ফুটকি-চিহ্নের আধিক্যের জন্যও বটে। কার্লাইল ও গল্‌স্‌ওয়ার্দি উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন গল্পটির। দিনেন্দ্রনাথের অনুবাদ, ভারতীগোষ্ঠীর অতুলনীয় রূপে, বিশেষভাবেই মূলানুগ।

'কবিকে আমার কবিজীবনটা···' ॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও 'জীবনস্মৃতি'।

'পথপ্রদর্শক···' ॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। বিবাহ ৪ বৈশাখ ১৩১০।

পত্র ৪৩। 'নাটকখানা···' ॥ 'অচলায়তন' নাটক।

পত্র ৪৪। 'নাটকটা শেষ করেছি···' ॥

২রা জ্যৈষ্ঠের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'একটা নতুন নাটক লেখবার চেষ্টায়' রয়েছেন, 'দুই একদিনের মধ্যেই শুরু' করবেন। ৪১ নং চিঠিতে ফের উল্লেখ পাই 'সেই নাটকটা এতদিন পরে একটু মন দিয়ে লেখবার অবকাশ পাওয়া গেছে', শুধু তাই নয়, 'নাটকটা নিয়ে আটকে পড়া গেছে' বলে কোথাও বেরিয়ে পড়ার বাধা। ১লা আষাঢ়ের চিঠিতে দেখা যায় 'নাটকখানা লিখতে শুরু' করেছেন

এবং 'রাজকীয় আলস্যে ভরপুর হয়ে বসে'ও *এরই মধ্যে 'একটা* অঙ্ক শেষ হয়েছে'। ১৪ই আষাঢ় ২৯শে জুন নাটকখানি শেষ হয়েছে লেখা। অর্থাৎ ১৬ মে থেকে ২৯ জুনের মধ্যে 'অচলায়তন' নাটকের সংকল্প থেকে সমাপ্তি।

জুলাইয়ের প্রথম রবিবার কলকাতায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ নাটকখানি পাঠ করে শোনান। এ সম্বন্ধে সীতা দেবী লিখেছেন :

'সেদিন রবিবার ছিল। বিকাল হইতে-না-হইতে আমরা কয়জন বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম কতক্ষণে তিনি আসিবেন। প্রশান্তচন্দ্রের বাড়িতে ইহারই মধ্যে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।...

শ্রোতার দল আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল।... পাঠের ব্যবস্থা যে জায়গায় হইয়াছিল, লোক তাহার তুলনায় অতিরিক্তই হইয়া গিয়াছিল। ক্রমাগতই একজনের পর একজন নূতন শ্রোতা আসিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ আবার গোড়া হইতে শুরু করিতেছেন। 'অচলায়তনে'র অনেক গান, সবগুলি তিনি একাই গাহিয়া গেলেন। তবে গলা একটু ভার থাকায় নীচু গলায়ই গাহিলেন। লোকের ভীড়ে আর কথাবার্ত্তা বলিবার কোন সুবিধা হইল না। তাহার পরদিনই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন।'[১]

পত্র ৪৫। 'শেষকালে নাটকটা...'॥ 'অচলায়তন' রচনা সমাপ্তি ১৪ই আষাঢ় ১৩১৮। উৎসর্গপত্র লেখা পরদিনে। 'আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপে এই অচলায়তন বইখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের নামে উৎসর্গ করিলাম। ১৫ই আষাঢ়। শিলাইদহ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশ : প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮ পৃ ৫৫৪-৫৯২। গ্রন্থাকারে : অচলায়তন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ

---

১ 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ৫২-৫৪।

যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ২ অগস্ট ১৯১২ মূল্য বারো আনা, পৃ ১৩৮।

'অচলায়তনে'র জন্য প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে এক সংখ্যায় ৪৮ পৃষ্ঠা এবং ২০০ টাকা সম্মানদক্ষিণা দিয়েছিলেন।

'এই [নাটক] নিয়ে কাগজে-পত্রে বিস্তর মারামারি কাটাকাটি চলবে…' ॥ তু. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি : 'আর্য্যাবর্ত্তে অক্ষয় সরকার অচলায়তন সম্বন্ধে খুব একটা সচলায়তনের সমালোচনা ঝেড়েচেন। দেখেছ?' অক্ষয় সরকার লেখেন, 'অচলায়তনে আছে কেবল একরূপ বিকৃত হিন্দুয়ানীর উপর নপুংসকের নৃত্য ও লাঞ্ছনা।' দ্র. আর্য্যাবর্ত্ত, অগ্রহায়ণ ১৩১৮। গ্রন্থাকারে প্রকাশ হওয়া মাত্রে প্রবাসী 'অচলায়তনে'র এই আলোচনা মুদ্রিত করেন :

এই নাটকখানি সমগ্র গত বৎসর আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বাহির হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। ইহার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রতিবাদ, সমালোচনা ভদ্রভাব হইতে অভদ্র-ভাবে পর্যন্ত হইয়া গেছে। ভালো জিনিষ চিরকাল এমনি দুকূল রাখিয়া চলিতে পারে না; একদলের তাহা বরণীয় হয়, এবং অপরদলের হয় অসহনীয়। এই গ্রন্থখানিতে আশ্চর্যরকম নাট্যকৌশলে অর্থহীন আচার ও কুসংস্কারের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিচার ও প্রেমের উদারতার প্রতিবাদ কবিত্বরসে ভিজাইয়া তোলা হইয়াছে। যে সকল রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী লোক ইহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া-ছিলেন তাঁহারা ইহার চমৎকার কবিত্বের অপলাপ করিতে পারেন নাই। মতে না মিলিলেও এই হিসাবে এ পুস্তকখানি সকলেরই পরম উপভোগ্য হইয়াছে। মহাকবির এই অসাধারণ নাটকখানি যে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিচারমূলক প্রতিবাদ হইলেও অসাম্প্রদায়িক তাহা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এ গ্রন্থ প্রবাসীর পাঠকের সুপরিচিত; সুতরাং পল্লবিত সমালোচনা

নিষ্প্রয়োজন।—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯ পৃ ৫৮৪-৫৮৫।

আলোচনা চারুচন্দ্রের করা বলেই মনে হয়।

'তোমাদের সম্বর্দ্ধনাটা…'॥ ১৪ মাঘ ১৩১৮, ২৮ জানুয়ারি ১৯১২য় টাউন হলে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংবর্ধনার আয়োজন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কিন্তু তার সূত্রপাত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'অনামিকা গৃহসভায়' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই 'ক্ষুদ্র পঞ্চকে'র উদ্‌যোগে; প্রস্তাবক, চারুচন্দ্রের সাক্ষ্যে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অতঃপর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরামর্শক্রমে 'কৃতবিদ্য ও কৃতিসমাজের' সহকারে একটি সংবর্ধনা সমিতি গঠিত হয় এবং সমিতির অনুরোধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্র. যতীন্দ্রমোহন বাগচী : 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' ১৩৫৪ পৃ ৩৭-৪২ ; পুলিনবিহারী সেন -সংকলিত 'কবি-সংবর্ধনা : ১৩১৮-১৩২৮', দেশ রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮ পৃ ৩৫-৪৫।

'জীবনস্মৃতিটা নিয়ে পড়েচি… : 'জীবনস্মৃতি'র পাঠ সংস্কার। কালীপদ রায় জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' লেখায় প্রবৃত্ত হন শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের হাতে লেখা 'শান্তি' পত্রিকার ছাত্র-পরিচালকদের নির্বন্ধে। 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পরিচ্ছেদটি 'সর্বপ্রথম' সেখানে প্রকাশ পেয়েছিল। দ্র. 'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ' ১৩৮৮ পৃ ৭২-৭৩।

চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার আগে ১৩১৮র জন্মোৎসবে অভ্যাগতদের কাছে পঠিত 'জীবনস্মৃতি'র লেখা অনেকটাই সংস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রামানন্দকে লেখা চিঠিতে পর পর এই সংশোধনের উল্লেখ আছে :

১. ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ : 'আমি ওই লেখাটার ফাঁক ভরাইয়া আবার একটু সংশোধন করিয়া লইতেছি…'।

২. ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ : 'জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে— সমস্তটাই আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে।'
৩. ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ : যে পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে তার পরের বাকি অংশ 'আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয়া তাহার পরে বিবেচনা করা যাইবে সে অংশটা বাহির করা চলিবে কি না।'
চারুচন্দ্রকেও আগের চিঠিতে লিখেছেন, 'ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধহয় দেখেছ…'।

এই সব পত্রের সাক্ষ্যে বোঝা যায় 'জীবনস্মৃতি'র প্রাথমিক পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত পাঠের অনেকটাই তফাত হয়ে গেছে। রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত প্রথম পাঠের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পুলিনবিহারী সেন ও নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'জীবনস্মৃতির খসড়া' সংকলন করেছিলেন। অতঃপর নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- সম্পাদিত 'জীবনস্মৃতি'র গ্রন্থপরিচয় বিবরণে এই পূর্বতন খসড়ার তথ্য ও পাঠ প্রাসঙ্গিক স্থলে মুদ্রিত হয়। দ্র. 'জীবনস্মৃতির খসড়া'। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০ পৃ ১০৯-১২৭ ও 'গ্রন্থপরিচয় : জীবনস্মৃতি'। বিশ্বভারতী বিশেষ সংস্করণ ১৩৬২ পৃ ১৫৭-২২৯।

'জীবনস্মৃতির খসড়া'র গোড়াতে সংকলয়িতারা খসড়ার মুদ্রণের এই প্রধান দুটি কৈফিয়ত দিয়েছেন :
'আত্মপরিচয় দিতে গিয়া যেখানে ইঙ্গিতমাত্র করিলে চলিত সেখানে কিছু বিস্তারিত করিয়া বলিলে লেখককে যাঁহারা অতিকথনের অপবাদ দিবেন না, তাঁহারা আনন্দিত ও উপকৃত বোধ করিবেন মনে করিয়া এই পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো অংশ মুদ্রিত হইল।'

দ্বিতীয়ত, 'খসড়াটিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি আছে যাহা সম্ভবত কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, এবং মূল চিঠিগুলিও এতদিনে বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে।'

বারংবার 'সাফসোফ করে' 'জীবনস্মৃতি'কে 'সাহিত্যে চলবার

মতো' করে তুলতে সযত্ন হয়েছেন লেখক। বইয়ের যে তিনটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে, তার তৃতীয়টি 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়, এর পরেও গ্রন্থের পাঠ তিনি পুনরায় সংস্কার করেছেন যদিও পত্রিকার শেষ কিস্তি আর গ্রন্থের প্রকাশকালের ব্যবধান সামান্যই। পত্রিকার পাঠ ও গ্রন্থমধ্যে সংস্কার সূত্রে দ্র. প্রতাপ মুখোপাধ্যায়: 'কলকাতার গুপ্ত সমিতি— উনিশ শতক' ১৩৯২ পৃ ১৭৭-১৮৪।

প্রসঙ্গত, 'জীবনস্মৃতি' রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাসী কার্য্যালয় -প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য 'কাব্যের মধ্য দিয়ে আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে' লিখেছিলেন। দ্র. 'বঙ্গভাষার লেখক'। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত ১৩১১ পৃ ৯৬৪-৯৮৪।

'সুফিধর্ম' । হেমলতা দেবী লিখেছেন, 'পূজ্যপাদ কবি আমাকে সুফীবাদের ইংরাজি গ্রন্থ পড়াতেন সে সময়ে। একবার পড়িয়ে দিয়ে পরদিন সেটা লিখে আনতে বলতেন। লেখাগুলি সংশোধন করে দিতেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।... সুফী মতের অনুবাদগুলি সে সময়কার তত্ত্ব-বোধিনীতে প্রকাশ হয়েছিল।' দ্র. 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ম্মুখিন সাধনার ধারা'। বঙ্গলক্ষ্মী, কার্তিক ১৩৪৮ পৃ ৬৪২।

সুফী মত সম্বন্ধে হেমলতা দেবীর এই লেখাগুলি ১৩১৮-১৩১৯ সাল ১৮৩৩-১৮৩৪ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়:

'সুফী ধর্ম্মমত ও সাধনা'। আশ্বিন-কার্তিক ১৮৩৩ শক পৃ ১৫১-১৫৩

'সুফী আশ্রম'। মাঘ ১৮৩৩ পৃ ২৩৮-২৪০

'সুফী গুরু ও সুফী শিষ্য'। চৈত্র ১৮৩৩ পৃ ২৭৫-২৭৮

'সুফীদের ভ্রমণ'। বৈশাখ ১৮৩৪ পৃ ১৫-১৭

'খিল্‌বৎ' (সুফী সাধকদের জন্য নির্দ্দেশ)। অগ্রহায়ণ ১৮৩৪ পৃ ১৯৬-১৯৯

প্রথম লেখাটির উপলক্ষে লেখিকা লিখেছিলেন, 'সুফীধর্ম্মের সমস্ত

বিধিবিধান, ইহার সাধনাপদ্ধতি আলোচনা ও সংগ্রহ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফীসম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত গুরু মহম্মদ ই-সরবর্দ্দি অবারিফুল মআরিক নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহারই ইংরাজি অনুবাদ হইতে আমরা সারসংকলনে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণ আমাদের দেশের প্রচলিত সাধনপদ্ধতির সহিত অনেক ঐক্য দেখিতে পাইবেন। এ সম্বন্ধে সুফীদের সহিত ভারতের ভক্তদের যে আদানপ্রদান ছিল তাহা ঐতিহাসিকের আলোচ্য।'

অন্য লেখার সূত্রে 'পারস্য সুফিশাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ হইতে' এইরূপ উল্লেখ আছে।

প্রসঙ্গত, সুফী মত নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় হেমলতা দেবীর পূর্বে পরম্পরাক্রমে লিখতে শুরু করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৩৩ শকের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

পত্র ৪৬। 'রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি'॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত ওই নামের লেখা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৮৩৩ শক পৃ ১৬৭-১৬৯।[১]

রচনাটি সারসংকলন মাত্র নয়, পুরাতন-ইতিহাস সম্বন্ধীয় একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার সহায়তায় এদেশের আধুনিক ধর্মীয় পরিস্থিতির অনুধাবন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তিন শতাব্দীর প্রাচ্য প্রভাবে রোমীয় বহুদেববাদের যে পরিণতি ঘটিয়াছিল, জর্মান পণ্ডিত ফ্রান্জ্ কুমণ্ট্ তাহার আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ধর্ম্মান্দোলনের সহিত রোমের তাৎকালিক অবস্থার সাদৃশ্যের প্রতি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।'

---

১ 'রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি' প্রবাসী, 'কষ্টিপাথর' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। দ্র. প্রবাসী, পৌষ ১৩১৮ পৃ ৩০৪-৩০৫।

মূল প্রবন্ধের বক্তব্য উপস্থাপনের পর তুলনামূলকভাবে তাঁর দেশকালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সংকলয়িতা :

বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম্মেরও প্রায় এইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়। সেই জন্যই কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের যোগ অথবা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শেষ বয়সের মতের সহিত হিন্দুসমাজের মতের মিলন সম্ভবপর হইয়াছে। বিবেকানন্দ যে একসময়ে উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন তাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী মত পরিবর্ত্তনের কোনো গুরুতর বিঘ্ন ঘটায় নাই। বস্তুত খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমের ন্যায় ভারতেও ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রাচীন মতের সহিত নবীন মতের যে একটি আনাগোনা চলিতেছে তাহা একটু দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে—ইহাদের বিরুদ্ধতা ক্ষয় হইয়া ইহাদের ভেদচিহ্ন যে প্রতিদিন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংকলয়িতার মতে, 'জর্ম্মান পণ্ডিত রোমের বহুদেববাদের যে পরিণতি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এমনি রেখায় রেখায় আমাদের দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মবৈচিত্র্য ও তাহার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ছবি আঁকিয়া দিয়াছে।'

পত্র ৪৭। 'বাংলা নির্দ্দেশক' ॥ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮ পৃ ৬৭২-৬৭৪।[১] 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে 'শব্দতত্ত্বে'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪২) অন্তর্ভুক্ত।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার : 'অশ্বের মনস্তত্ত্ব'। প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৮ পৃ৭৩-৭৬।

'শরৎবাবুর সংকলন' ॥ শরৎকুমার রায়, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

---

১ পরের মাসের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। দ্র. '"বাংলা নির্দ্দেশক" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'। প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৮ পৃ ৯৫-৯৬।

'সোনার তরীর ইংরেজি তর্জমা'॥ *The Fugitive and other Poems*, Macmillan 1921এর ১৭ সংখ্যক কবিতা রূপে আছে 'সোনার তরী'র তর্জমা। অজিতকুমারের অনুবাদটি মুদ্রিত হয়েছিল কি না জানা যায় নি।

'বিখ্যাত কবি ও ঋষি Edward Carpenter...'॥ গীত রচয়িতা ও বিজ্ঞান প্রচারক, ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক এডোয়ার্ড কার্পেন্টার (১৮৪৪-১৯২৯) শ্রমিক আন্দোলনে ও সোশিয়ালিস্ট আন্দোলনে প্রথমাবধি সক্রিয় ছিলেন, পরে প্রধানভাবে ধর্মভাবিত হন। মুক্তছন্দে লেখা তাঁর কবিতায় হুইটম্যানের প্রতি বিশেষ অনুরাগের পরিচয় আছে।

'সেই মহিলা...'॥ সম্ভবত সার হেনরি কটনের সহোদরা মিসেস্ টমাস, বিলাতে অসুস্থতার সময় অজিতকুমারকে মাতৃসমা পরিচর্যা করেছিলেন এবং যাঁর অনুরোধে অজিতকুমার শুয়ে-শুয়েই রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা তর্জমা করে শুনিয়েছিলেন। দ্র. লণ্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ১০ নভেম্বর ১৯১০এর পত্র:

কাল অক্সফোর্ড যাচ্ছি। আপনার কবিতা বিস্তর তর্জমা হয়েছে—এখানে কাউকে কাউকে শুনিয়েছি, সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু কাউকেই পাচ্ছি না যে ওগুলো revise করে নেবে। তাই অপেক্ষা করছি।

'প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুতে আমার ছবি...'॥ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৮য় 'জীবনস্মৃতি' রচনার সূচনাপত্রে (পৃ ৪৪১) মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯১১য় রবীন্দ্রনাথ থেকে যদুনাথ সরকার-অনুবাদিত *Beauty and Self Control* রচনার সূচনাপত্রে (পৃ ২২৫) বাবু সুকুমার রায়-কর্তৃক গৃহীত রবীন্দ্রনাথের 'একপঞ্চাশৎ জন্মদিনের ফটোগ্রাফ' মুদ্রিত হয়েছিল।

'ভারতীর জন্য গল্প...'॥ সম্ভবত 'রাসমণির ছেলে'। ভারতী, আশ্বিন ১৩১৮য় প্রকাশিত। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে গল্পটির বিষয় লিখছেন:

'কাল শনিবারে গল্পটা লিখে শেষ করেছি। আজ রবিবার রেজেষ্ট্রি ডাক বন্ধ বলে ডাকে দেবার সুবিধা হল না। সৌভাগ্যক্রমে ফণী বলে একটি ছাত্র কলকাতায় যাচ্চেন তাঁরই হাতে দিয়ে দিলুম—এতক্ষণে হয়তো পেয়েছ। তোমাদের সময় অল্প বলেই এই উপায় অবলম্বন করা গেল।'

এই গল্পের জন্য রবীন্দ্রনাথ ভারতীর কাছে দক্ষিণার দাবি করেছেন, পূর্ব চিঠিতেই লিখেছেন, 'তুমি বোধ হয় জান অচলায়তনের জন্যে রামানন্দবাবু আমাকে ২০০ টাকা দিয়েছেন। তোমরা যা দেবে আমি শিরোধার্য করে নেব, কিন্তু একেবারে বঞ্চিত হতে ইচ্ছা করি নে।'[২]

পত্র ৪৮। "সওগাদ"॥ সওগাত (ছোটো গল্প সংকলন) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলকাতা ১৩১৮ পৃ ১৫২+৮ মূল্য আট আনা।

'সওগাত' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গিত :

'শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত / প্রিয়বরেষু—'। 'বন্ধু / আমার জীবনের পুলক-বেদনার / সওগাত / তোমাকে দিলাম / চারু'।

'সওগাত' ১৬টি ছোটো গল্পের সংকলন। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮য় আলোচিত।

'তুমি শারদোৎসবে এসো…'॥ পূজার ছুটির আগে ৬ই আশ্বিন ১৩১৮ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে 'শারদোৎসব' অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। তু. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১১ তারিখের চিঠি[১]

'সত্যেন্দ্র ও চারুকে বোলো ৬ই আশ্বিন শনিবার রাত্রে এখানে

---

২ শারদীয়া দেশ পত্রিকা ১৩৭৩ পৃ ১৮।

১ 'পত্রাবলী'। শারদীয়া দেশ পত্রিকা ১৩৭৩ পৃ ১৮।

শারদোৎসব হবে। যদি সেদিন দুপুরের ট্রেনে রওনা হন, তাহলেও যথাসময়ে এসে উপস্থিত হতে পারবেন। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৮।

অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখা চিঠি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১১[২]:

'আমাদের এখানে ৬ই আশ্বিনে শারদোৎসব হইয়া ছুটি হইবে।... যদি সম্ভব হয় তবে তুমি আমাদের ৬ই আশ্বিনের উৎসবে আসিয়া যোগ দিতে পারিলে আনন্দিত হইব।... ইতি শনিবার [৩০ ভাদ্র ১৩১৮]।'

প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠি, ? ১৯১১[৩]

'এখানে শারদোৎসব অভিনয়ের আয়োজন চলচে। আমাকে সবাই মিলে সন্ন্যাসী সাজাচ্চে। কলকাতা থেকে এবারেও মেয়ের দল সব আসচেন।'

কলকাতা থেকে এবারেও এই অনুষ্ঠান দেখতে অনেকেই এসেছিলেন— চারুচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যদুনাথ সরকার, কৃষ্ণকুমার মিত্রের দুই কন্যা। রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী সেজেছিলেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী ঠাকুরদাদা, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় লক্ষেশ্বর, প্রমথনাথ বিশী ধনপতি। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে লালচে কাগজে ছাপা প্রোগ্রামে নতুন তিনটি গান ছিল, তার একটি 'আমাদের শান্তিনিকেতন'। সীতা দেবী এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ রক্ষা করেছেন তাঁর বইয়ে।[৪]

পত্র ৪৯। 'নিবেদিতা' ॥ মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্ (১৮৬৭-১৯১১), নিবেদিতার মৃত্যুতে লেখা প্রবন্ধ 'ভগিনী নিবেদিতা'। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ পৃ ১৬৬-১৭৩, 'পরিচয়' (১৯১৩) গ্রন্থে সংকলিত পৃ ৯২-১০৫।

ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যু হয় ১৩ অক্টোবর ১৯১১য়, মৃত্যুকালে

---

২ রবীন্দ্রবীক্ষা ১১ পৃ ১৯।

৩ চিঠিপত্র ৩ পৃ ১৭।

৪ 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ৫৯-৭১।

জগদীশচন্দ্র-অবলা বসুর আমন্ত্রণক্রমে তিনি দার্জিলিঙে রায় ভিলায় বিশ্রাম যাপন করছিলেন। বসু-পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতার অনেক দিনের প্রিয়সম্বন্ধ, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, জগদীশচন্দ্রের 'কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন নিবেদিতাকে।' প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৪ ও নভেম্বরের মডার্ন রিভিউয়ে (১৯১১) অবলা বসু নিবেদিতার সম্বন্ধে দীর্ঘ স্মৃতি-তর্পণ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও নিবেদিতার সৌহৃদ্য হয়েছিল, জগদীশচন্দ্রেরই সূত্রে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I really wanted to add a new friend to those with which India has already blessed me, and you are so dear to my friend Dr. Bose, that I cd. not help hoping you sd. be *my* friend too!'—রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি, কলকাতা ১৬ জুন ১৮৯৯।[১] নিবেদিতা অতিথি হয়ে এসেছিলেন শিলাইদহে, বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও অপর বন্ধুদের সাথী হয়ে, রবীন্দ্রনাথের গল্প অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও নিবেদিতার সাহায্য চেয়েছিলেন শিক্ষিকারূপে, বঙ্গদর্শনে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের বিবরণ লিখেছিলেন নিবেদিতার পাঠানো তথ্য অবলম্বন করে, গোরার চরিত্র রচনাতেও স্বীকার করেছিলেন নিবেদিতার দৃষ্টান্ত।[২]

---

১ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলকাতা থেকে লেখা চিঠি। *Letters of Sister Nivedita* Vol 1, April 1982 pp 1651-66.

২ ১৯০৪এর বর্ষশেষে নিবেদিতা গিয়েছিলেন শিলাইদহে, অবলা বসু - জগদীশ-চন্দ্র তখন সেখানে, সম্ভবত ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৪ থেকে ২ জানুয়ারি ১৯০৫ এই শিলাইদহ বাস। দ্র. শ্রীমতী ওলি বুলকে লেখা নিবেদিতার চিঠি, ১৭ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ১৯০৫। *Letters of Sister Nivedita* Vol II April 1982 p 711.

রবীন্দ্রনাথ সদলে বুদ্ধগয়া যান ১৯০৪এ পূজাবকাশের সময়। নিবেদিতার

নিবেদিতার মৃত্যুর পর ১৮ কার্তিক ১৩১৮য় শিলাইদহ থেকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'নিবেদিতা সম্বন্ধে

পত্রে দলটির বিবরণ পাওয়া যায়। The Great Day of Durga Puja 1904এ নিবেদিতা মিস্ ম্যাকলিয়ডকে লিখছেন (C/o The Raja of Amwa, Zemindari House, Rajgir থেকে ১৫ অক্টোবর ১৯০৪এ লেখা)
'...We have been a party of 20 spending 4 days at Bodh-Gaya —in the Guest-House— and I think it has been an event in all our lives. The Boses were there— and 2 children, 4 in all. The Poet [রবীন্দ্রনাথ] was there with his son and a friend— a prince with his tutor. 3 of my boys, a distinguished scholar, and another friend, and Swami Sadananda and his nephew, also Christine.
এই distinguished scholar পাটনা কলেজের ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক যদুনাথ সরকার।

যদুনাথ সরকার পরবর্তীকালে ওই ভ্রমণের কথা স্মরণ করেছেন, দ্র. *Sister Nivedita as I knew Her*, Hindusthan Standard, Puja Annual 1952. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সবিস্তারে লিখেছেন এই ভ্রমণের প্রসঙ্গ :
...মনে পড়ে বুদ্ধগয়ার কথা। ১৯০৪ সাল হবে। জগদীশচন্দ্র, শ্রীমতী অবলা বসু ও ভগিনী নিবেদিতাসহ বুদ্ধগয়া যাবেন স্থির করেন, পিতৃদেবকে অনুরোধ করলেন সঙ্গী হতে। ক্রমে দলটি বেশ বড় হয়ে গেল। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, ত্রিপুরার কর্নেল মহিম ঠাকুর ও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর (লালু কর্তা), আমি ও আমার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার— কেউ বাদ পড়লুম না। আমরা বুদ্ধগয়ার মোহান্তের অতিথি হব ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর অতিথিশালার বিরাট বাড়ির তেতলার ঘরগুলিতে থাকতে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘরের বিশেষ প্রয়োজন হয় নি, সামনে যে প্রকাণ্ড বারান্দা ছিল তাতেই আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আসর জমিয়েছিলুম।
এই সময়ের বিবরণ লিখতে গিয়ে রথীন্দ্রনাথ আরো স্মরণ করেছেন
...মন্দিরের পরিবেশ ছেড়ে কারো আর উঠতে ইচ্ছা হয় না। অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস

প্রবাসীতে কিছু লেখবার জন্য জগদীশ আমাকে অনুরোধ করেছিলেন —আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম তাই সেইটে লিখ্‌চি…'। একই দিনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লেখা এই চিঠি, 'আজ সেই নিবেদিতা সম্বন্ধীয় লেখাটি শেষ করিয়াছি—যদি সময় থাকে তবে আজই

নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক-একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন তার যথাযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে। আমরা অন্যেরা তাঁদের প্রশ্নোত্তর তর্ক-বিতর্ক মুগ্ধ হয়ে শুনে যাই। আমার বিশ্বাস, এই বুদ্ধগয়া-সন্দর্শনের ফলে উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে পিতৃদেবের অন্তরের আকর্ষণ প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল।…

বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পূতস্থান বুদ্ধগয়ায় জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ তিন মনীষীর একত্র সমাগমে অপূর্ব এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, মাত্র দু-তিন দিনের তীর্থবাস, কিন্তু তারই মধ্যে কত গল্প, কত আলোচনা, কত পরামর্শই না হয়েছিল। বড়ো দুঃখ যে তার আজ কোনো অনুলিপি নেই।

'আচার্য জগদীশচন্দ্র'। 'পিতৃস্মৃতি'র সংযোজন ১৩৭৮ সং পৃ ২৫৩-২৫৪।

লণ্ডনে ১৯০০ সালের শেষ দিকে নিবেদিতার অনুবাদিত দুটি গল্পের কথা জানা যায়, তার একটি মাত্র ('কাবুলিওয়ালা') গল্পের সন্ধান মেলে পরে।

শিলাইদহ গৃহবিদ্যালয়ের জন্য নিবেদিতার সাহায্য চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজের বাড়ি দিতে চেয়েছিলেন নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার কারণে, দ্র. মিস্ ম্যাক্লিয়ডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি ৪-৫ জুলাই ১৯০৪: 'Mr. R. N. Tagore has offered me his beautiful house for a Normal School.' *Letters of Sister Nivedita* Vol II 1982 pp 653-654. এবিষয়ে নিবেদিতার রক্ষিত চিঠিখানি অবশ্য বঙ্গদর্শনে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দুটির পরে লেখা।

পরবর্তীকালে 'গোরা' অনুবাদ করার সময় পিয়ার্সন 'গোরা'র সঙ্গে নিবেদিতার সম্বন্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন (শান্তিনিকেতন. ১৯২২এ লেখা চিঠি): 'You ask me what connection had the writing of *Gora* with Sister Nivedita. She was our guest in Shilida and in trying to improvise a story according to her request I

পাঠাইব কিন্তু রেজেষ্ট্রি করিবার অবসর যদি না পাওয়া যায় তবে মঙ্গলবারে পাইবেন। নিতান্ত ছোট হইবে না—প্রায় এক ফর্ম্মা হইবে... ইতি ১৮ই কার্তিক ১৩১৮।'[৩]

'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে এ দেশের দরিদ্র লোকসাধারণের জন্য নিবেদিতার 'সকরুণ সুকোমল এবং শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড মাতৃস্নেহে'র পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছেন, দরিদ্রসাধারণের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য তিনি 'সতীর তপস্যা' করেছিলেন। 'মাতৃহৃদয়া' এই বিদেশিনীকে 'লোকমাতা' আখ্যায় ভূষিত করে তাঁর মহত্ত্ব ও তপস্যার গৌরব রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে তাঁদের দুজনের ধাতু ও লক্ষ্য যে ভিন্ন, 'তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে', সে কথাও বলেছেন অকুণ্ঠিতচিত্তে :

অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।'[৪]

নিবেদিতাও যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতী হতে পারেন নি তার অন্তত দুটি পরিচয় লিখে গেছেন মিস্ ম্যাকলিয়ডের কাছে ১৫ অক্টোবর ১৯০৪ ও শ্রীমতী ওলি বুলের কাছে ৫ জানুয়ারি

---

gave her something which came very near to the plot of *Gora*. She was quite angry at the idea of *Gora* being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin.' দ্র. *The Visva-Bharati Quarterly*, August-October 1945 pp 178-179.

৩ চিঠিপত্র ১২ পৃ ১২।

১৯০৫এ লেখা দুখানি পত্রে।

---

৪ নিবেদিতার পত্রাংশ দুটি এইরকম। প্রথমটি বুদ্ধগয়ায় থাকার সময় মিস্ ম্যাকলিয়ডকে লেখা, রাজগির ১৫ অক্টোবর ১৯০৪ :

The Poet, Mr. Tagore was a *perfect* guest. He is almost the only Indian man I have ever seen who has nothing of the spoiled child socially about him. He has a *naif* sort of vanity in speech which is so childlike as to be rather touching. But he thinks of others all the time—as no one but a Western hostess could. He sang and chatted day and night— was always ready— either to entertain or to be entertained— served Dr. Bose as if he were his mother —struggles all the time between work for the country and the national longing to seek mukti. In short— never was any man so *ridiculously maligned* when suspected of things vulgar and immoral. But for all this, Mr. Tagore's is not the type of manhood that appeals to me. He is much more attractive to Christine.

Letters of Sister Nivedita Vol II 1982 pp 685-687.

দ্বিতীয় চিঠি শিলাইদহ বাসের অভিজ্ঞতা থেকে বিবরণ, শ্রীমতী ওলি বুলকে ৫ জানুয়ারি ১৯০৫এ লেখা :

With all our trust and regard for the Poet—and I am grateful to him for having been born !— so tenderly does he love the Bairu [জগদীশচন্দ্র], and so assiduously does he serve him !— we are learning now to understand what it was that Swamiji felt about them all. Gradually as we exhausted what we had taken with us on Friday, we both felt the pressure of an atmosphere in which we could not draw breath— in which all had become commonplace, an atmosphere in which Bo and the Poet were absolutely

'নিবেদিতা' প্রবন্ধের[৫] অল্পকাল মধ্যে বিলাতযাত্রার জাহাজে বসে ভারতবর্ষে আগত 'শ্রদ্ধাপরায়ণ ইয়োরোপীয় তীর্থযাত্রী'দের কথাতে নিবেদিতার কথা পুনরায় উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। দ্র. 'যাত্রার পূর্ব পত্র', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৩১৯এ প্রকাশিত। পরে নিবেদিতার *The Web of Indian Life* বইয়ের নবসংস্করণের (১৯১৮) ভূমিকা লিখে দেন, ভূমিকার তারিখ ২১ অক্টোবর ১৯১৭। 'কাবুলিওয়ালার ইংরেজি'॥ লণ্ডনবাসকালে জগদীশচন্দ্র সে দেশে

---

happy and in place—but in which the Bairu seemed distorted somehow. By Monday noon, I had nothing left in me to say, either to him or to GOD.

Letters of Sister Nivedita Vol II 1982 p 711

এডোয়ার্ড টমসন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করেছেন তার মধ্যেও তাঁর প্রতি নিবেদিতার বিরুদ্ধতার এবং এদেশের লোকসাধারণ সম্বন্ধে নিবেদিতার অপার মমতার প্রসঙ্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ :

'I didn't like her' he said, 'She was so violent. He added, 'She had a great hatred for me and my work, epecially here, and did all she could against me.'

এবং

Speaking to me once of Sister Nivedita's 'violence' he added. 'But there could be no doubt of her devotion to my people. I have seen her, a delicately nurtured lady, living uncomplaining and cheerful in conditions of sheer squalor. And '(his face brightened) 'she could be *ferocious* at any wrong or injustice done to my people.'

E. P. Thompson: *Alien Homage* 1993 p 110 ও Edward Thompson : *Rabindranath Tagore Poet & Dramatist.* 1948 p 284.

৫ নিবেদিতার *Studies from an Eastern Home* (1913) গ্রন্থে 'ভগিনী নিবেদিতা'র আংশিক অনুবাদ গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্ররচনা প্রচারে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। ২ নভেম্বর ১৯০০ তারিখের চিঠিতে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছেন[৬] 'তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব।' প্রসঙ্গত জগদীশচন্দ্র বহুদিন ধরেই রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।[৭] অনুবাদের জন্য তিনি লোকেন পালিত এবং Mrs. Knightএর[৮] নাম প্রস্তাবও করেছিলেন।

---

৬ রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনুবাদ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পত্রবিনিময় সূত্রে দ্র. রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ড ১৯৫৭ পত্র পৃ ১৩-১৯, পত্রপরিচয় পৃ ১৭৪-১৭৯।

৭ এই সূত্রে জগদীশচন্দ্রের বিলাত যাওয়ার পূর্বে শিলাইদহে আসার নানা বিবরণের এক জায়গায় রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

Every week-end that Jagadish came to Shelidah he would make Father read out to him the short story that he had written the previous week and get a promise from him to have another ready the next week-end. It was not only the necessity of filling the pages of *Sadhana* or *Bharati* but this constant demand from his friend that made Father write so many short stories at this period.

On the Edges of Time 1981 edn p 25.

৮ Mrs. Knight বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রসিদ্ধ অনুবাদিকা Miriam S. Knight. *The Poison Tree* translated by Miriam S, Knight, London 1884. মিসেস নাইট *Stories of Bengal Life* (১৯১২) নামে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পেরও অনুবাদ করেছিলেন। প্রসঙ্গত বিলাতবাসকালে প্রভাতকুমারের মিসেস নাইটের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০২এর এক পত্রে লণ্ডন থেকে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন:

মজুমদার এজেন্সী প্রকাশিত দু খণ্ড 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম খণ্ড বেরোনো মাত্রে (প্রকাশ ১ আশ্বিন ১৩০৭) রবীন্দ্রনাথ বিদেশে তাঁর বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে লেখেন, 'প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আপনাকে পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে প্রথম খণ্ডই পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডেই অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তর্জ্জমার যোগ্য গল্প বোধ হয় নিম্ন কয়েকটি হইতে পারে: পোস্টমাস্টার, কঙ্কাল, নিশীথে, কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knightএর রচনানৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।'

২০ নভেম্বর ১৯০০ তারিখে লেখা পরের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'লোকেনকে আমার গল্প তর্জ্জমার জন্য ধরেছি—কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসহীন।'

এই দুই চিঠির উত্তরে জগদীশচন্দ্র লেখেন, 'তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না।... সে যাহা হউক, তোমার ভাগে কেবল glory, লাভালাভের ভাগ্য আমার। যদি কিছু লাভ হয় তার অর্দ্ধেক তরজমাকারীর, আর অর্দ্ধেক কোন সদনুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি? আমি অনেক castles in the air প্রস্তুত করিতেছি।

সম্প্রতি বঙ্কিমবাবুর অনুবাদকারিণী Mrs Knightএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বৃদ্ধা, ভারতবর্ষে তিনি ২৮ বৎসর বাস করে এসেছেন। ১৮৬৩ সালে বাঙ্গলা শিখতে আরম্ভ করেন। বলছিলেন, 'রবিবাবুর এত নাম শুনি আজকাল, বেশী কিছু পড়ি নি।' বল্লাম, আমরা সকলে রবিবাবুর ভক্তশিষ্য। সত্যেন্দ্রর কাছ থেকে 'গল্পগুচ্ছ' দুখানা চেয়ে তাঁকে পড়তে দেব ভেবেছি। দ্র. 'প্রভাত-রবি': দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ পৃ ১৭১।

'এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই। শীঘ্র তোমার অন্যান্য গল্প পাঠাইবে। Mrs. Knightকে দেই নাই।'

অতঃপর ১৬ জানুয়ারি ১৯০১এর পত্রে লেখেন, 'তোমার গল্পের পুস্তক ২য় খণ্ড কবে পাইব? প্রথম খণ্ড হইতে ৩টি গল্প তর্জমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য্য ত আছে। এখন নরওয়ে সুইডেন ইটালী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, সে সবের সঙ্গে তুলনার জন্য তোমার লেখা বাহির করিতে চাই।'[৯]

জগদীশচন্দ্র যে তিনটি গল্পের তর্জমা করিয়েছিলেন তার দুটি—'ছুটি' ও 'কাবুলিওয়ালা'র অনুবাদ করেছিলেন নিবেদিতা, নভেম্বর ১৯০০তেই তাঁর পত্রে সেই উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীমতী ওলি বুলকে লেখা ২৯ নভেম্বরের চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন :

The Cabuliwallah and Leave of Absence are both Englished... one thing I have done—I have made an ink-impression of my right hand—in memory of the Cabuliwallah![১০]

---

৯ ১২ ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় লেখেন, 'আমার গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুই খণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা হইবে। আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল…'। 'চিঠিপত্র' ৬ ১৩৫৭ পৃ ১৮। প্রসঙ্গত মজুমদার এজেন্সী প্রকাশিত 'গল্পগুচ্ছ' দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ ১৩০৮।

১০ 33 Powis Square, Bayswater W. / Thursday Evening, Nov. 29, 1900এর পত্র। দ্র. *Letters of Sister Nivedita* Vol I April 1982 pp 402-404.

জগদীশচন্দ্র বিদেশে রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনুবাদ প্রকাশ বা প্রচারে সক্ষম হন নি। প্রায় এক দশক পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন মডার্ন রিভিউয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্প ছাপাবার উদ্‌যোগ করেন তখন খোঁজ পড়ে নিবেদিতার অনুবাদের। নিবেদিতা তখন জীবিত। রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে ৮ই ফাল্গুন ১৩১৭র চিঠিতে লেখেন :

ডাক্তার বসু বলিতেছেন, Sister Nivedita আমার দুইটি ছোট গল্প (কাবুলিওয়ালা ও ছুটি) ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিয়াছেন— তাহা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে, শুনিয়াছি সে দুটি আপনার কাগজে ছাপিতে দিতে তাঁহার আপত্তি নাই।

সে লেখা সম্ভবত তখন খুঁজে পাওয়া যায় নি। নিবেদিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ পুনরায় রামানন্দকে লেখেন— ১৮ই কার্তিক ১৩১৮য়, বর্তমান চিঠির অব্যবহিত আগে :

নিবেদিতা আমার 'কাবুলিওয়ালা'র যে ইংরেজি তর্জ্জমা করিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। আপনি জগদীশের কাছে সন্ধান লইবেন।[১১]

শেষ পর্যন্ত ১৯১২ জানুয়ারি সংখ্যা মডার্ন রিভিউয়ে *The Cabuliwalla* প্রকাশিত হয়। ম্যাকমিলান কোম্পানি-কর্তৃক *Hungry Stones and Other Stories* (1916) প্রকাশিত হলে সেখানেও শেষ গল্প রূপে গৃহীত হয় নিবেদিতারই অনুবাদ।[১২]

পত্র ৫০। মার্সেল্‌সে॥ ২৪ মে ১৯১২ রথীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী ও সোমেন্দ্র

---

১১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ৮ ফাল্গুন ১৩১৭ ও ১৮ কার্তিক ১৩১৮র দুখানি পত্র, দ্র. 'চিঠিপত্র' ১২ বৈশাখ ১৩৯৩ পৃ ৪-৫, পৃ ১২-১৩।

১২ 'কাবুলিওয়ালা' অনুবাদের সঙ্গে নন্দলাল বসু -অঙ্কিত একখানি চিত্রও মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত হয়, এই পরিচায়িকা সহ : The Cabuliwalla by Babu Nanda Lal Bose/By the courtesy of Babu Rabindranath Tagore.

দেব বর্মন সহ রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ের পথে কলকাতা ছেড়ে ২৭ মে ১৯১২ S. S. City of Glasgow জাহাজে বোম্বাই থেকে মার্সেল্‌সের পথে যাত্রা করেন। ২৯ মে ও ৩০ মে আরব সমুদ্র পাড়ি দেবার পথে লেখেন 'জলস্থল' ও 'সমুদ্রপাড়ি' দুটি নিবন্ধ। ৩১ মে ১৯১২ আরব সমুদ্রের পথেই কন্যা মীরা দেবীকে লেখেন :

জাহাজ তো ভেসে চলেছে। ভয় করেছিলুম খুব seasickness হবে কিন্তু তার লক্ষণ দেখচি নে। সমুদ্র তেমন উতলা নয়। অথচ ঢেউ একেবারেই নেই তা নয়। ঠিক আমাদের মুখের সামনে দিয়ে পশ্চিমে হাওয়া দিচ্চে তাই এক একদিন বেশ একটু দোলা লাগাচ্চে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার তাতে কোনো অসুবিধা হয় নি। সোমেন্দ্রটা মাঝে মাঝে মাথা ঘুরচে বলে ক্যাবিনে চিৎ হয়ে পড়ে চব্বিশ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়ে নিচ্চে।... বৌমা বেশ কাটিয়ে দিচ্চেন। ওঁর ভাবটি বেশ নিঃসঙ্কোচ। নতুন জায়গায় নতুন পথে নতুন লোকদের মধ্য দিয়ে যাচ্চেন বলে যে কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ আছে তা দেখচি নে। ইতিমধ্যে একদিন কেবল seasick হয়েছিলেন।...

চারুচন্দ্রের চিঠির সঙ্গে একই দিনে ডাকে দেওয়া চিঠিতে (15 Juin 1912 St. Denis, Paris 26) বড়ো মেয়ে মাধুরীলতাকে লিখছেন :

বেল, কাল মার্সেল গিয়ে পৌঁছব। সমুদ্রযাত্রাটা নির্বিঘ্নে কেটে গেছে। কাল একটু ঝোড়ো ছিল— বৌমার একটু মাথা ঘুরেছিল আমার ত কোনো কষ্ট বোধ হয় নি।

চারুচন্দ্রকে 'সমুদ্রে ঝড়ে'র উল্লেখ করেছেন। 'লণ্ডনে' শীর্ষক রচনায় পাওয়া যায় 'প্রবল বেগে বাতাস' ও 'তাহাতে' সমুদ্রের আন্দোলনের ফলে 'যেদিন পৌঁছিবার কথা ছিল তাহার দুই দিন পরে পৌঁছিয়াছি' এবং তারপর 'মার্সেল্‌স্ হইতে একদৌড়ে প্যারিসে আসিয়া একদিনের

মতো হাঁপ ছাড়িলাম।'

মার্সেল্‌স্‌ ফ্রান্সের পুরাতনতম শহর এবং প্রধান ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর।

'প্রবাসীর জন্যে··· লেখা···'॥ এ যাত্রায় বাইরে থেকে সমস্ত লেখাই রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে অজিতকুমার চক্রবর্তীর কাছে পাঠান, বিভিন্ন স্থানে নির্দেশমতো বিলিব্যবস্থা সাপেক্ষে, দ্র. ২৬ জুন ১৯১২য় লেখা অজিতকুমার চক্রবর্তীর পত্র :

শ্রীচরণেষু,

গুরুদেব, গত সোমবার পোর্ট সৈয়দ থেকে অতগুলো লেখা একসঙ্গে পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছি তেমনি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি। আপনার সমুদ্রযাত্রা যে দেবতার কৃপায় সুখকর হয়েছে সেজন্য দেবতাকে ধন্যবাদ—কারণ আমাদের ভয় ছিল যে আপনি বুঝি সি-সিক্‌ হয়ে পড়েন···

আপনার লেখাগুলি সবই যেখানে যা পাঠাবার পাঠিয়েছি। তত্ত্ববোধিনীতে শ্রাবণে যে তিনটি লেখা পাঠিয়েছেন তিনটিই যাবে। আশা করছি এমনি অনেক পাব—তাই হাতে না রেখে সমস্তই দিয়ে বসলুম।··· ইতি।

প্রবাসীর লেখাদুটিও শ্রাবণ সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় :

'জলস্থল' (রচনা আরব সমুদ্র বুধবার ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)। 'দুই ইচ্ছা'(রচনা লোহিত সমুদ্র বুধবার ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৯ যথাক্রমে পৃ ৪৩১-৪৩৪ ও পৃ ৪৩৭-৪৪০।

প্রবাসীর ওই সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩১৯) রবীন্দ্রনাথের দুটি গানও বেরিয়েছিল, সম্ভবত আগে দেওয়া :

'নিকটের যাত্রা' (অনেক কালের যাত্রা আমার অনেক দূরের পথ) পৃ ৩৬২ ও 'ঝড়' (ঝড়ে উড়ে যায় গো আমার মুখের আঁচলখানি) পৃ ৩৮৯।

'জলস্থল' চতুর্থ প্রবন্ধ রূপে 'পথের সঞ্চয়' (১৩৪৬) গ্রন্থে এবং গানদুটি

'গীতিমাল্যে'র (১৩২১) যথাক্রমে ১৪ ও ১৯ সংখ্যক গান রূপে গৃহীত হয়।

পত্র ৫১। 'লণ্ডনের পাকের মধ্যে…'॥ ১৮৭৮এ লণ্ডনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কালে তাঁর চোখে পড়েছিল, 'ধোঁওয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কোয়াশা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব—এই হচ্ছে লণ্ডনের যথাসর্ব্বস্ব।' 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র প্রথম পত্র ১৯৬১ সং পৃ ২০। ১৯১২র জুন মাসের গোড়াতে লণ্ডনে পৌঁছে এবারের প্রথম অভিজ্ঞতা 'লণ্ডনের রাস্তার… ভয়ানক প্রকাণ্ড… চলিবার বেগ', 'অতি বিপুল মানুষ-কলের' একটা চেহারা—' কী দাহ, কী শব্দ, কী চাকার ঘূর্ণি!' 'পথের সঞ্চয়' ১৩৫৭ মুদ্রণ পৃ ৯০, পৃ ৯৪। লণ্ডনে পৌঁছে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন ব্লুম্স্বেরি হোটেলে।[১] তারপর রোটেনস্টাইনের সূত্রে কবি-পরিচয়ের প্রসার হওয়ার ফলে অনুরাগীর ভিড়ে দ্রুত পরিবৃত হয়ে পড়েন। জুলাই ১৯১২য় অজিতকুমার চক্রবর্তীকে যে লিখেছেন, 'অজিত, আমি এখানকার পাকের মধ্যে পড়ে গেছি…' (দ্র. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৮ পৃ ১৮) সে এই সমাদরের পাক। এই জুন মাসেই রোটেনস্টাইন-আহূত রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠ সভায় চার্লস ফ্রীয়ার অ্যাণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন (দ্র. C. F. Andrews : "An Evening with Rabindra", *The Modern Review,* August 1928 pp 225-228)। অ্যাণ্ডরুজ পরে লিখেছেন, '"I must get away", he said to me, with pathetic emphasis... this publicity is drying up all that is in me. I must get away and rest and be quiet."

'পাড়াগাঁয়ে একটি পাদ্রির বাড়িতে…'॥ সদ্য পরিচিত অ্যাণ্ডরুজ তাঁর

---

১ *On the Edges of Time* 1981 edn pp 99-100.

বন্ধু স্টাফোর্ডশিয়রের পাদ্রি রেভারেণ্ড ও শ্রীমতী উট্রমের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা করে দেন। দ্র. C. F. Andrews: "With Rabindra in England", *The Modern Review*, January 1913 pp 70-75 ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৩১৯ পৃ ২২০-২২৪, 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এই ব্যবস্থা যে 'ঠিক উলটো ব্যবস্থা' হয়েছে, এই চিঠির অব্যবহিত আগে উইলিয়ম রোটেনস্টাইনকে বাটারটন ভিকারেজ, স্টাফোর্ডশিয়র থেকে ৫ অগস্ট ১৯১২ তারিখে লেখা চিঠিতে তার কিছু সূত্র আছে: '...the country round is beautiful and our host and hostess are nice people. So I have nothing to complain of. But I have made a discovery since I came here that I had grown fond of Hampstead without being aware of it. The reason of it was that while there I could easily go to a place which was dear to me and it gave me a purpose in my daily life in London...' ইত্যাদি। দ্র. Mary M. Lago: *Imperfect Encounter* 1992 pp 51-52.

রোটেনস্টাইন হ্যাম্পস্টীড-এ ভিলাস অফ দি হীদ-এ রবীন্দ্রনাথের বাসা ঠিক করে দিয়েছিলেন।

'ভ্রমণের বিবরণ...' ॥ ভ্রমণের বিবরণ লেখার 'সময় নেই' লিখলেও প্রবাসী ভারতী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই যাত্রার অনেকগুলি বিবরণ স্বতন্ত্র শিরোনামে বা 'বিলাতের চিঠি' পর্যায়ে পরপর পাশাপাশি মুদ্রিত হয় এবং সে লেখা অবলম্বন করে ভাদ্র ১৩৪৬এ 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থ সংকলিত হয় (লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ১)। বৈশাখ

১৩৫৪য় দ্বিতীয়বার মুদ্রিত নতুন সংস্করণে বইয়ের প্রচলিত বিন্যাস এবং রচনার পাঠ স্থিরীকৃত হয়েছে।

'এখানকার কবিসভায়…'॥ ১০ জুলাই ১৯১২য় ট্রোকাডেরো রেস্তরাঁয় ইণ্ডিয়া সোসাইটি আহূত সভায় লণ্ডনের বিশিষ্ট কবিসাহিত্যিকগণ সাদর সংবর্ধনা করেন রবীন্দ্রনাথকে। কবি ইয়েট্স সভাপতিত্ব করেছিলেন সে সভায় এবং বলেছিলেন, 'To take part in honouring Mr. Rabindra Nath Tagore is one of the great events of my artistic life.' হাউস অফ কমন্সের ভারতীয় বাজেট অধিবেশনে এই সংবর্ধনার সপ্রশংস উল্লেখ হয় এবং টাইম্স্ কাগজে এ নিয়ে লেখা ছাপেন (Dinner to Mr. Rabindra Nath Tagore : A Bengali Poet, *The Times*, July 13, 1912) তার আগেই ৩০ জুন রোটেনস্টাইনের গৃহে আর্নস্ট রীজ, এলিস্ মেনেল, মে সিনক্লেয়ার, ইভলীন আণ্ডারহিল, এজরা পাউণ্ড, হেনরি নেভিনসন, চার্লস্ ট্রেভেলিয়ন, চার্লস অ্যাণ্ডরুজ প্রমুখ নির্বাচিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে ইয়েট্স যে 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতা পাঠ করে শোনান তাকে রথীন্দ্রনাথ 'ঐতিহাসিক সন্ধ্যা' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি ইয়েট্সের 'musical ecstatic voice'এর কথা বলেছেন, অ্যাণ্ডরুজ বলেছেন, সে যেন সন্ধ্যা স্তোত্রের মতো : 'As the late evening drew on W. B. Yeats began to recite Rabindra Nath's verses ; each short poem seemed a vesper hymn.' (দ্র. C. F. Andrews : "An Evening with Rabindra", *The Modern Review*, August 1912 pp 225-228 ; Notes : "Rabindranath Tagore in England", *The Modern Review*, September 1912 pp 316-320 ; R. N. Tagore : *On the Edges of*

Time 1981 p 101)। রথীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, সে সন্ধ্যার নীরব মুগ্ধতা পরদিন থেকে ব্যাপক প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে।

'লণ্ডন থেকে দূরে থাকলেও…' ॥ কবি আছেন রেভারেণ্ড উট্রমের গৃহে, স্টাফোর্ডশিয়রে।

'সত্যেন্দ্রকে' ॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পত্র ৫২। সুকুমার ॥ সুকুমার রায় ফোটোগ্রাফি ও প্রিন্টিংয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯১১য় অক্টোবরের শেষ দিকে লণ্ডনে এসে পৌঁছান। ১৯ জুন ১৯১২য় পিয়ার্সনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে 'পেপার' পড়েন তাতে 'রবিবাবুর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ' ছিল। ৯ জুলাই ১৯১২য় হ্যাম্পস্টেড হীদ্‌-এ রবীন্দ্রনাথের বাড়ি তাঁর খাবার নিমন্ত্রণ ছিল। ২৫শে জুলাই ১৯১২র পত্রে সুকুমার লিখছেন : আজ একটা বড় পার্টি আছে। মিসেস নাইডু আসবেন। আমাদেরও সব নেমন্তন্ন হয়েছে। গত সোমবার এখানের একটা ক্লাবে, East West Societyতে, 'The Spirit of Rabindranath' বলে একটা paper পড়লাম। লোক মন্দ হয় নি। Quest কাগজের editor Mr. Mead (যিনি এখানে রবিবাবুর lecture সব arrange করেছিলেন)— তাঁর প্রবন্ধটা খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি সেটা Questএ ছাপাবেন।

রবিবাবু দু সপ্তাহ nursing homeএ ছিলেন, কয়েকদিন হল সেখান থেকে এসেছেন। তরশু দিন আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন Royal Court Theatreএ তাঁর ডাকঘর অভিনয় হয়েছিল! 'মালিনী' আর 'চিত্রাঙ্গদা'ও বোধ হয় শীগ্‌গির-ই কোথাও করা হবে। বিলেতে রবিবাবুর খুব-ই নাম হয়েছে। এখানকার বড় বড় poetরা রবিবাবুর নাম করতে পাগল। এবার যিনি Poet Laureate হলেন, Dr. Bridges, তিনি তাঁর ছেলেকে রবিবাবুর

সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।[১]

'Modern Reviewতে যে কটা গল্পের তর্জ্জমা…'-ইত্যাদি॥ মডার্ন রিভিউয়ে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পের তর্জ্জমা' ১৯১০-১৯১২ :

দি মডার্ন রিভিউ ১৯১০

We Crown the King, trs. by Prabhat Kumar Mukherji, January pp 20-26.

The Hungry Stone, trs. by Panna Lal Basu, February pp 185-191.

The Skeleton, trs. by Prabhat Kumar Mukherji, March pp 213-217.

At Midnight, trs. by Anath Nath Mitra, April pp 387-393.

The Trust Property, trs. by Prabhat Kumar Mukherji, May pp 426-431.

The Elder Sister, trs. by Rashbehari Mookerjee, July pp 31-36.

The Renunciation, trs. by Prabhat Kumar Mukherji, August pp 163-167.

Subha, trs. Anath Nath Mitter, September pp 289-293.

দি মডার্ন রিভিউ ১৯১১

The Postmaster, trs. by Debendra Nath Mitter, January pp 36-39.

---

১ শান্তিলতা চৌধুরীকে লেখা চিঠি। লীলা মজুমদার : 'সুকুমার রায়' ১৩৭৬ পৃ ১১৪য় উদ্‌ধৃত।

Raja and Rani, trs. by Keshab Chandra Banerjee, June pp 560-561.

The Innocent Injured, trs. by Keshab Chandra Banerjee, November pp 482-483.

Victorious in Defeat, trs. by Jadunath Sarkar, December pp 560-565.

দি মডার্ন রিভিউ ১৯১২

The Cabuliwallah, trs. by the Sister Nivedita, January pp 50-56.

The Supreme Night, trs. by Jadunath Sarkar, June pp 579-583.

The River Stairs, trs. by Jadunath Sarkar, October pp 340-345.[১]

Adamant, trs. by Jadunath Sarkar. December pp 571-573.[২]

• তিন বছরে মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত এই ষোলোটি গল্পের মূল, যথাক্রমে :
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত *We Crown the King* : 'রাজটিকা'।
পান্নালাল বসু অনুবাদিত *The Hungry Stones* : 'ক্ষুধিত পাষাণ'।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত *The Skeleton* : 'কঙ্কাল'।
অনাথনাথ মিত্র অনুবাদিত *At Midnight* : 'নিশীথে'।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত *The Trust Property* : 'সম্পত্তি সমর্পণ'।
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত *The Elder Sister* : 'দিদি'।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত *The Renunciation* : 'ত্যাগ'।
অনাথনাথ মিত্র অনুবাদিত *Subha* : 'সুভা'।
দেবেন্দ্রনাথ মিত্র অনুবাদিত *The Postmaster* : 'পোস্টমাস্টার'।
কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদিত *Raja and Rani* : 'সদর ও অন্দর'।
কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদিত *The Innocent Injured*: 'উলুখড়ের বিপদ'।

আগের দিনের ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২ তারিখের পত্রে অজিত চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

আমার গল্পের যে কটা তর্জ্জমা মডার্ন রিভিয়ুতে বেরিয়েছে পড়ে রোটেনষ্টাইন খুব বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।[৩] তিনি বলেন এগুলো সংশোধন করে ছাপতেই হবে। কিন্তু আমার ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমাই হয় নি সেই জন্যে দ্বিধা বোধ করছি।

যদুনাথ সরকার অনুবাদিত *Victorious in Defeat* : 'জয়-পরাজয়'।
ভগিনী নিবেদিতা অনুবাদিত *The Cabuliwallah* : 'কাবুলিওয়ালা'।
যদুনাথ সরকার অনুবাদিত *The Supreme Night* : 'এক রাত্রি'।
যদুনাথ সরকার অনুবাদিত *The River Stairs* : 'ঘাটের কথা'।
যদুনাথ সরকার অনুবাদিত *Adamant* : 'মহামায়া'।

৩ রোটেনস্টাইন স্মরণ করেছেন, 'I happened, in *The Modern Review,* upon a translation of a story signed Rabindranath Tagore which charmed me, I wrote to Jorasanko— were other stories to be had? Some time afterwards came an exercise book containing translations of poems by Rabindranath, made by Ajit Chakravarty, a schoolmaster on the staff at Bolpur. The poems, of a highly mystical character, struck me as being still more remarkable than the story, though but rough translations.

—*Men and Memories* : Recollections of William Rothenstein 1900-1922 Vol II 1932 p 262.

ম্যাকমিলান কোম্পানির গ্রন্থপরীক্ষক (রীডার) চার্লস্ হুইবলি প্রকাশার্থ পাঠানো রবীন্দ্রনাথের কবিতা-ব্যতীত গদ্যরচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন : 'Then there is a collection of essays and short stories, badly translated, which may for the present be neglected.'

—*Macmillan Reader's Reports*, Vol F, November 1912. Mary M. Lago : *Imperfect Encounter* 1972 pp 21-22-এ উদ্ধৃত।

এর আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ২৭ জুন ১৯১২ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

আমার ভাল গল্পগুলির মাঝারি রকমের তর্জ্জমা খাড়া করিয়া দিলে ইহারা যত্নপূর্বক মাজিয়া ঘষিয়া লইবার ভার লইতে প্রস্তুত আছেন— এবং ভাল Publishers পাওয়া যাইবে এমন আশা পাওয়া গেছে।

Modern Reviewতে যে কয়টি বাহির হইয়াছিল পাঠাইয়া দিবেন। তাহা ছাড়া আর কিছু কি করা যাইতে পারে ?[৪]

মডার্ন রিভিউয়ের আগেও বিপিনচন্দ্র পালের *New India* কাগজে ১৯০১-১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' (Subha), 'বিচারক' (The Judge), 'কাবুলিওয়ালা' (The Kabuli), 'জীবিত ও মৃত' (Alive and Dead), 'কঙ্কাল' (The Skeleton) অন্তত এই পাঁচটি গল্পের তর্জমা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়, তার প্রথম দ্বিতীয় ও পঞ্চম গল্প কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অনুবাদ।[৫]

৪ চিঠিপত্র ১২ পত্র ২৭ পৃ ২৭।

৫ চারুচন্দ্রকে লেখা এই চিঠির অব্যবহিতকালের মধ্যেই Natesan কোম্পানি *Glimpses of Bengal Life* (জুন ১৯১৩) নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ১৩টি গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

আগেই উল্লেখ করেছি বিপিনচন্দ্র পালের *New India* কাগজে যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর 'সুভা' 'বিচারক' ও 'কঙ্কাল' গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। *New India*য় তাঁর আরো কোনো কোনো গল্পের অনুবাদ ছাপা হয়। মোট অনুবাদ-তালিকা এই রকম :

Subha (সুভা) ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০১ সংখ্যা, অনুবাদক J. M. Bagchi

The Judge (বিচারক) ৪ নভেম্বর ১৯০১ সংখ্যা, অনুবাদক J. M. Bagchi

The Kabuli (কাবুলিওয়ালা) ৩১ মার্চ ১৯০২ সংখ্যা, অনুবাদক G. Sarma

Alive and Dead (জীবিত ও মৃত) ১৮ নভেম্বর ১৯০১ ও ২৫ নভেম্বর ১৯০১ দুই সংখ্যায়। অনুবাদকের নাম নেই।

এই চিঠির কয়েক মাস মধ্যেই মাদ্রাজের G. A Natesan কোম্পানি *Glimpses of Bengal Life* নামে রবীন্দ্রনাথের তেরোটি গল্প নিয়ে বই ছেপেছিলেন, অনুবাদ রজনীরঞ্জন সেন -কৃত (ভূমিকার তারিখ ১৩ জুন ১৯১৩)।[৬] নতুন প্রকাশিতব্য গল্পসংগ্রহের জন্য অবশ্য এই-সব অনুবাদ বিবেচিত হয় নি।

১৯১৬ ও ১৯১৮য় ম্যাকমিলান কোম্পানি রবীন্দ্রনাথের *Hungry Stones and Other Stories* এবং *Mashi and Other Stories* নামে নানা জনের অনুবাদ সংবলিত দুখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রথম বইয়ে তেরো ও দ্বিতীয় বইয়ে রবীন্দ্রনাথের চোদ্দটি গল্প সংকলিত হয়েছিল। সূচীপত্র ও মূল গল্প এই রকম :

Hungry Stones and Other Stories ১৯১৬

The Skeleton (কঙ্কাল) ১৯ মে ১৯০২ সংখ্যা. অনুবাদক J. M. Bagchi. দ্র. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবিজীবনী' পঞ্চম খণ্ড ১৩৯৭ পৃ ৩২-৩৩।

এ ছাড়াও অজিতকুমার চক্রবর্তী 'কাবুলিওয়ালা'র অনুবাদ করেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। ১৯১০ নভেম্বরের গোড়ার দিকে অসুস্থ অবস্থায় লণ্ডন থেকে অজিতকুমার লেখেন মিসেস টমাস, অসুখে যিনি তাঁকে মায়ের মতো যত্ন করছেন, 'তাঁর অনুরোধে শুয়ে শুয়ে কাবুলিওয়ালাটা তর্জমা করে তাঁকে দিয়েছি— তিনি বললেন, "it is charmingly done— একটু আধটু সংশোধন করতে হবে— সে আমি করব"। দ্র· এই বই পৃ ৪১২।

৬ রজনীরঞ্জন 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'পণরক্ষা', 'সুভা', 'অতিথি', 'শুভদৃষ্টি', 'কঙ্কাল', 'ঘাটের কথা', 'শাস্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'স্বর্ণমৃগ', 'অনধিকার প্রবেশ' ও 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অনুবাদ করেছিলেন।

৮ অক্টোবর ১৯১৩য় জে. ডি. অ্যাণ্ডার্সন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'I have written an indulgent review of Rajani Ranjan Sen's versions of your galpas in the current Spectator.' প্রসঙ্গত আর্নেস্ট রীজ তাঁর রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থের ভূমিকায় (নভেম্বর ১৯১৪) রজনীরঞ্জনের সহায়তার স্বীকৃতি করেছিলেন।

The Hungry Stones (ক্ষুধিত পাষাণ)।
The Victory (জয়-পরাজয়)।
Once there was a King (অসম্ভব কথা)।
The Home-Coming (ছুটি)।
My Lord, the Baby (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন)।
The Kingdom of Cards (একটা আষাঢ়ে গল্প)।
The Devotee (বোষ্টমী)।
Vision (দৃষ্টিদান)।
The Babus of Nayanjore (ঠাকুর্দা)।
Living or Dead ? (জীবিত ও মৃত)।
"We Crown the King" (রাজটিকা)।
The Renunciation (ত্যাগ)।
The Cabuliwallah (কাবুলিওয়ালা)।

এই তেরোটি গল্পের The Victory লেখকের নিজস্ব অনুবাদ, পরের সাতটি লেখকের সাহায্য নিয়ে চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ডরুজের নতুন তর্জমা। ভূমিকায় অধিকন্তু উল্লেখ আছে : 'Assistance has also been given by the Rev. E. J. Thompson, Panna Lal Basu, Prabhat Kumar Mukerji and Sister Nivedita.'

Mashi and Other Stories ১৯১৮

Mashi (শেষের রাত্রি)।
The Skeleton (কঙ্কাল)।
The Auspicious Vision (শুভদৃষ্টি)।
The Supreme Night (এক রাত্রি)।
Raja and Rani (সদর ও অন্দর)।
The Trust Property (সম্পত্তি সমর্পণ)।

The Riddle Solved (সমস্যা-পূরণ)।

The Elder Sister (দিদি)।

Subha (সুভা)।

Postmaster (পোস্টমাস্টার)

The River Stairs (ঘাটের কথা)।

The Castaway (আপদ)।

Saved (উদ্ধার)।

My Fair Neighbour (প্রতিবেশিনী)।

এই বইয়ের গল্পও নানাজনের অনুবাদ দ্বারা প্রস্তুত হয়।[৭]

'এ দেশে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত...' ॥ ১৯ অক্টোবর ১৯১২য় রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যাত্রা করেন।

শান্তিনিকেতনের 'ভাণ্ডারী' ॥ রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, তাঁর অনুপস্থিতিকালে সে কাগজের দায়িত্ব পেয়েছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। বাইরে থেকে তত্ত্ববোধিনী এবং অন্যান্য কাগজের লেখাও রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারের কাছে পাঠিয়েছেন। দ্র' রবীন্দ্রনাথকে লেখা অজিতকুমারের চিঠি :

এবার যে দুটো লেখা পাঠিয়েছেন তা ভাদ্র মাসে যাবে—কারণ শ্রাবণ সংখ্যা দু-চারদিনের মধ্যেই বের হবে। একটা—'কাজ ও

---

৭ বহু অবধান সত্ত্বেও ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের গল্প সংগ্রহ প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ হয় নি। কেউ কেউ বলেছেন, গৃহীত গল্পের অসম মান ও অনুবাদের ত্রুটি তার কারণ। চার্লস্ অ্যাণ্ডরুজের অভিভাবকত্বে চূড়ান্ত পাঠ প্রস্তুত হয়েছিল, অ্যাণ্ডরুজের সাহিত্যবোধের অভাবও অনেকে কারণ বলে মনে করেন। প্রসঙ্গত দীর্ঘ অপেক্ষিত বইয়ের পাণ্ডুলিপি জমা দিতে বিলম্বের কারণ হিসেবে অ্যাণ্ডরুজ ম্যাকমিলানকে জানিয়েছিলেন, কবি বহু কাজে ক্লান্ত এবং অনুবাদ তিনি নিজে হাতে করতে চান। সে সময় তিনি পান নি। দ্র. Mary M. Lago *Imperfect Encounter* 1972 pp 166-167, 219-223 এবং E. P. Thompson : *Alien Homage* 1993 pp 16-25.

খেলা' পত্রিকায় যাবে— অন্যটা লণ্ডনের লেখাটা প্রবাসীতে পাঠিয়ে দেব মনে ভাবছি। আপনার লেখাগুলো আমার কাছে পাঠালে আমি যেখানে যা দেবার ঠিকমত পাঠিয়ে দেব। দ্র. দেশ সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৭৬ পৃ ১৫৮-১৫৯।

তু' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ২৭ জুন ১৯১২র চিঠি :

প্রবাসীর জন্য পথ হইতে দুইটি লেখা পাঠাইয়াছি, আশা করি শান্তিনিকেতন ঘুরিয়া সেগুলি আপনার হস্তগত হইয়াছে।

কুকেদের কেয়ারে : Thomas Cook & Son, Ludgate Circus, London ঠিকানায়।

শীর্ণ নিভৃত গলি॥ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশের সমাজপাড়ার গলি। এই গলির ২১০/৩/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রবাসী অফিসের বাড়ি। সীতা দেবী শান্তা দেবী দুজনেই রবীন্দ্রনাথের এই 'শীর্ণ নিভৃত গলিটি'র মনে পড়ার কথা তাঁদের বইয়ে উল্লেখ করেছেন। দ্র. সীতা দেবী : 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ১১৮। শান্তা দেবী : 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৪২।

পত্র ৫৩। 'আমার সম্মান-সম্বর্দ্ধনার কথা কাগজে পড়তে···'॥ সম্ভবত প্রবাসীতে প্রকাশিত বিবরণের উল্লেখ: 'ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা'। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯ পৃ ৫৬১-৫৬৬।

বিলেতের 'খবর জোড়াতাড়া দিয়ে ঢাকঢোল বাজা'নোতে সংকোচের কথা জানালেও অনাম্নিত বিবরণটি লিখেছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। দ্র. ১৪ অগস্ট ১৯১২য় লেখা অজিতকুমারের পত্র :

আপনার গৌরবের কথা একটুখানি এবার প্রবাসীতে দিয়েছি— 'ইংলণ্ডে রবীন্দ্রসম্বর্দ্ধনা' নাম দিয়ে— অবশ্য কারো নামে বের হবে না।

দ্র. দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৬ পৃ ১৬২।

এর আগের চিঠিতে ৭ অগস্ট ১৯১২ অজিতকুমার লিখেছিলেন :

গুরুদেব, এবার রথী সন্তোষকে যে দীর্ঘ পত্র দিয়াছেন তাহাতে

ওখানকার উৎসবের সমস্ত সংবাদ জানিলাম। ইহার পূর্ব্বে এখানকার কাগজে তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়া গিয়াছে। মিস Sinclair প্রভৃতি পত্রযোগে যে ভক্তির অর্ঘ্য পাঠাইয়াছেন তাহাও দেখিলাম।
দ্র. দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৬ পৃ ১৬১।

রবীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্রকে স্টপফোর্ড ব্রুকের প্রশংসার চিঠিখানিও পাঠিয়ে লিখেছিলেন, 'আশা করি তোমরা এটাকে কাগজে ছাপিয়ে বসবে না।' অতঃপর ইভলীন আণ্ডারহিল, রোটেনস্টাইন এবং ইয়েট্সের মন্তব্য এবং অয়কেনের পত্র পাঠিয়ে লেখেন, 'দেখো যেন ছাপিয়ে বোসো না।' ১৭ অক্টোবর ১৯১২, ১৪ ডিসেম্বর ১৯১২ ও ৩০ জানুয়ারি ১৯১৩র পত্র, দ্র. 'রবীন্দ্রভাবনা' ১৯৮৭ পৃ ২০-৩০।

'ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা' লেখায় রোটেন-স্টাইনের বাড়িতে আয়োজিত সান্ধ্যসম্মিলনে ইয়েট্স -কর্তৃক রবীন্দ্র-নাথের কবিতা পাঠ ও কবিতাপরিচয়-ভাষণ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি-ভাষণের প্রসঙ্গ ও পাঠ সংকলিত হয়েছিল। ভুলক্রমে বিবরণলেখক একে ইণ্ডিয়া সোসাইটি -সংবর্ধনার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছেন। বিবরণের অংশ এইরকম :

সংবাদপত্রের পাঠকেরা অবগত আছেন যে ইংলণ্ডের সাহিত্য-সমাজ এই বঙ্গীয় কবিকে গত ১২ই জুলাই এক সান্ধ্য নিমন্ত্রণে কিরূপে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিয়াছিলেন। সেই সান্ধ্যসভায় ইংলণ্ডের প্রায় সকল বড় বড় সাহিত্যিক এবং সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কবি য়ীট্স ছিলেন সভাপতি। এচ্, জি, ওয়েল্স্ উপস্থিত ছিলেন,— তিনি সোস্যালিষ্ট এবং ঔপন্যাসিক বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক *A Modern Utopia* সাহিত্যসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মিস্ মে, সিন্‌ক্লেয়ার ছিলেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী। নেভিন্‌সন্, হ্যাভেল, রদেনষ্টাইন তো সুপরিচিত নাম। রলেস্‌টন ছিলেন, তিনিও একজন বড় কবি। একটা

বিরাট্ জনতাময় সভা না করিয়া ইণ্ডিয়া সোসাইটি যে এই বাছা বাছা লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কবিসম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহারা তাঁহাদের সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, এবং অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। যে বৈঠক উপযুক্ত সমজ্‌দারের দ্বারা পূর্ণ হয়, সেখানে যে উৎসবটি জমিয়া উঠে, হৃদয়ের ভাব-উৎস যেমন সহজে খুলিয়া যায়, এমন কেবল বাজে লোকের দলবৃদ্ধির দ্বারা হয় না। স্বভাবত উত্তেজনাপ্রিয় ইংলণ্ডবাসী আপনা হইতে যে এরূপ চিত্তবিভ্রান্তকারী বারোয়ারি সৃষ্টি না করিয়া একটি রসিকজনসম্মিলনের মনোহর মধুচক্র রচিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।

ইহার পর কবির কাছে নানা স্থান হইতে ভক্তির অর্ঘ্য বহন করিয়া যেসকল পত্র আসিয়াছে তন্মধ্যে দুইজন স্ত্রী-কবির পত্রই শুনাইবার মত। একজন লিখিয়াছেন :— 'যে দিন প্রথম বাইবেলের কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়াছিলাম সেই দিনটি বাদে, আমার মনে পড়ে না যে গতরাত্রে যেমন অনুভব করিয়াছিলাম জীবনে আর কোন দিন সেরূপ অনুভব করিয়াছি কিনা।'

আর একজন লিখিয়াছেন, 'আপনার কবিতাগুলির যে কবিত্ব হিসাবে একটি সম্পূর্ণতা এবং অখণ্ড সৌন্দর্য্য আছে মাত্র তা নয়— কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় জিনিস বিদ্যুৎচমকের মত আসে, যাহা অনিশ্চয়তার বেদনায় অন্তরকে পীড়া দিতে থাকে—সেই তাহারি একটি চিরন্তন রূপ ইহাদের মধ্যে আমি পাইলাম। একজন লোক আরেকজনের চোখ দিয়া দেখিতে পারে কিনা আমি জানি না বোধ হয় পারে না; কিন্তু একজনের অন্তরের সুদৃঢ় প্রত্যয় নিশ্চয় আর একজনের বিশ্বাসকে জাগায়। St. John of the Crossএর 'আত্মার অন্ধকার রাত্রি' নামক কবিতাটি ছাড়া আপনার কবিতার তুলনা খুঁজিয়া পাই না— কিন্তু আপনি একটি পরিপূর্ণ অদ্বৈত বোধে

এবং একটি অধ্যায় তত্ত্বদৃষ্টিতে St. John এবং অপর সকল খৃষ্টান কবিকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টান "মিষ্টিসিজ্‌ম" ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমায় পরিপূর্ণ: সে যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়— জগতের মায়াবরণ ভেদ করিয়া সে সত্যকে দেখে নাই। সেই জন্য তাহার হৃদয়াবেগ যথেষ্ট নির্ম্মল নয়। তাহার এই অসম্পূর্ণতা আমাকে কোনো দিনই সন্তোষ দেয় নাই। কিন্তু যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিটি আমি চাই, তাহা গতরাত্রে আপনার কাব্যই আমাকে দিয়াছে। আপনি অতি স্বচ্ছসুন্দর ইংরাজীতে এমন জিনিষ আনিয়া দিয়াছেন যাহা আমি ইংরাজীতে কেন, কোনো পাশ্চাত্য ভাষায় কোনো দিন দেখিব না ভাবিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছিলাম।"

প্রথম পত্রের লেখিকা মার্গারেট র‍্যাডফোর্ড, দ্বিতীয়টি লিখেছিলেন মে সিনক্লেয়ার। মে সিনক্লেয়ার তখন বিলেতে মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী, ওই সময়ই তাঁর *Feminism for the Women Writers' Suffrage League* (১৯১২) প্রকাশিত হয়। মূল চিঠি দুখানি এখানে উদ্ধৃত করি :

1 Portland Villas
East Heath Road
Hamstead
July 8th

I should like to try and tell you if I may what a great experience it was to me, to hear your poems. They fill my spirit.

I have never felt as I felt last night save when I first read certain parts of our English Bible. I thank God that I heard them as I did— it was a wonderful evening to me.

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র আলোচনাও লেখেন : *Song Offerings of Rabindra Nath Tagore. The North American Review*, May 1913.

We are just going away— it will be a grand memory to my brother and my Mother and to me that we have met you. I look forward eagerly to having your poems when they are printed. I have the pleasure at having your daughter-in-law to tea with me—but I go away tomorrow.

Margaret Radford.

২

4 Edwardes Sqr. Studios
Kensington
July 8. 1912.

Dear Mr. Tagore,

It was impossible for me to say anything to you about your poems last night, because they are of a kind not easily spoken about. May I say now that as long as I live, even if I were never to hear them again, I shall never forget the impression that they made. It is not only that they have an absolute beauty, a perfection as poetry, but that they have made present for me forever the divine thing that I can only find by flashes and with an agonizing uncertainty. I don't know whether it is possible to *see* through another's eyes. I am afraid it is not; but I am sure that it is possible to believe through another's certainty.

There is nothing to compare with what you have done except the poem of St. John of the Cross : 'The Dark Night of the Soul' and you surpass him and all

Christian poets of Mysticism that I know by that sense of the Absolute, that metaphysical insight. It, to my mind, Christian mysticism almost completely lacks.[১] It deals too much in sensual imagery, it is not sufficiently austere and subtle— it has not really *seen through* the illusion of the world. And therefore its passion is not and cannot be entirely pure.

At least so it has always seemed to me, and that is why finding this imperfection in it, it sends me away still unsatisfied.

Now it is satisfaction— this flawless satisfaction— you gave me last night. You have put into English which is absolutely transparent in its perfection things it is despaired of ever seeing written in English at all or in any Western language.

I am rejoiced to learn that the Poems are to be published here in the autumn.

With kind regards,

Sincerely yours
May Sinclair

'য়েট্‌স্‌ যে বইটা Edit করচেন . . .' ইত্যাদি॥ 'বইটা' : *Gitanjali or Song Offerings*. ইয়েট্‌সের ভূমিকা লেখা শেষ হয় ৭ সেপ্টেম্বর

---

১ অজিতকুমার লেখেন, 'Miss Sinclair ঠিকই লিখিয়াছেন, Christian mysticismএ ইহার সঙ্গে তুলনীয় কি আছে? সেখানে আছে পাপবোধের খণ্ডতা এখানে আছে অমৃতবোধের পূর্ণতা।' ৮ই শ্রাবণ ১৩১৯এর পত্র।

১৯১২র মধ্যে। দ্র. রোটেনস্টাইনের *Men and Memories* দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩২ পৃ ২৬৬-২৬৭।

'সুকুমারের তর্জ্জমা ...'।। পিয়ার্সনের বাড়িতে পড়া 'বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে paper'এ সুকুমার রায় 'রবিবাবুর কয়েকটি কবিতা ('সুদূর', 'পরশপাথর', 'সন্ধ্যা', 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ' ইত্যাদি) অনুবাদ' করেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে লেখা ২১ জুন ১৯১২র চিঠি, দ্র. লীলা মজুমদার : 'সুকুমার রায়' ১৩৭৬ পৃ ১১১-১১২ ।

অপিচ, ১৮ অগস্ট ১৯১২ তারিখের এক পত্রে উইলিয়ম রোটেনস্টাইন ইয়েট্‌সকে লিখেছিলেন : 'Tagore is busy here translating plays and poems he has written for children ... & Sakumar *(sic)* Roy is doing his best with some of the longer poems.'

দ্র. ফিনেরান, হার্গার ও মার্ফি স' *Letters to W. B. Yeats* ১৯৭৭ পৃ ২৪৮-২৪৯ ।

সুকুমার রায়ের করা রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্প তর্জমার কথা জানা যায় নি।

'গোটা তিনেক নাটক' অনুবাদ।। প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে সঞ্জীবনীর লন্ডনস্থ সংবাদদাতা 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে' যে সব সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল :

রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা', 'মালিনী' ও 'ডাকঘর' অনুবাদ করিয়াছেন। কবি ত্রিভেলীয়ান তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'ডাকঘর' পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি মিঃ রদেনস্টাইনকে জানাইছেন যে, ইহা জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করিবে। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের আর কোনও নাটক আছে কি না এবং থাকিলে তাহা অনুবাদ করিয়া অতি সত্বর যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়। আমাদের সুপরিচিত

ক্ষিতীশচন্দ্র সেন— যিনি এদেশে ইংরেজীতে প্রথম হইয়া সুবর্ণ পদক পাইয়াছেন এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন— রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক অনুবাদ করিতেছেন। দ্র. প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৯ পৃ ১১৫-১১৬।

প্রসঙ্গত 'চিত্রাঙ্গদা' *Chitra* (১৯১৬) নামে ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 'মালিনী' *Sacrifice and Other Plays* (১৯১৭) এর অন্তর্গত হয়ে ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্তৃক প্রকাহিত হয়। 'ডাকঘর' অনুবাদ করে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, *The Post Office* (জুলাই ১৯১৪) নামে কুয়ালা প্রেস ডাবলিন দ্বারা প্রকাশিত।

'ক্ষণিকায় লিখেছিলুম পরজন্মে . . .' ইত্যাদি ।। দ্র 'কর্মফল' কবিতা, ক্ষণিকা :

> যে বইখানি পড়বে হাতে
> দগ্ধ করব পাতে পাতে,
> আমার ভাগ্যে হব আমি
> দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।
> আমায় হয়তো করতে হবে
> আমার লেখা সমালোচন।

মডার্ন রিভিউয়ে রোটেনস্টাইনের প্রবন্ধ ।। ১৪ নভেম্বর ১৯১২র চিঠিতে রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'Ramananda Babu wrote to me last week, & I will try to find time to write something for the Modern Review.'

রোটেনস্টাইনের প্রবন্ধ মডার্ন রিভিউ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় : *A Basis for the Appreciation of Works of Art.* A lecture delivered before the Cambridge University, by William Rothenstein. Modern Review, February 1913

pp 125-136। প্রবন্ধের পৃ ১২৭এ রোটেনস্টাইন[১] ও রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাপা হয়।

'ভারতীয় আর্ট সমাজ . . . আমাদের আধুনিক শিল্পীদের প্রতি তিনি যদি কিছু সদুপদেশ দেন . . .'॥ জানুয়ারি ১৯১০এ লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি অফ আর্টসের ভারতীয় বিভাগের অধিবেশনে কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পকে হীনজ্ঞান করার সরকারি মনোভাবের বিরোধিতা করে পেপার পড়েছিলেন, রোটেনস্টাইন তাঁকে সমর্থন করেন সভায় এবং টাইম্‌স্ কাগজে লেখা চিঠিতে। তাতে ভারতীয় শিল্পের স্বাতন্ত্র্য ও মহিমা এবং পশ্চিমি শিল্পীদের শিক্ষণীয় সম্পদের কথা ছিল। এই বাদানুবাদের ভিত্তিতে টাইম্‌স্ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধও ছাপেন (Art in India, Times, March 1, 1910)। রোটেনস্টাইনের চিঠি এবং টাইম্‌সের সম্পাদকীয় দুইই মডার্ন রিভিউ কাগজে পুনর্মুদ্রিত হয়, এখানকার শিল্পীমহলেও তা নিয়ে সাড়া পড়ে যায়। মডার্ন রিভিউ এ নিয়ে নিজেদের সম্পাদকীয়ও প্রকাশ করেছিলেন (Eastern Art Makes Events in the West। জুলাই ১৯১০)। এই বাদানুবাদের প্রত্যক্ষ সুফলে রোটেনস্টাইনকে সভাপতি করে ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৫ জুন ১৯১০এ। ভারতের ভাস্কর্য স্থাপত্য চিত্রকলা এমন-কি সংগীত ও সাহিত্যের আরও অনাবিষ্কৃত প্রসার রয়েছে এই বিশ্বাসে এবং ভারতবর্ষের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা আরও ভালোভাবে বোঝার আগ্রহকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। এখানকার আধুনিক শিল্পী— পশ্চিমি শিল্পাদর্শকে যাঁরা দৃষ্টান্তজ্ঞান করে শিল্পচর্চা করছিলেন, তাঁদের সদুপদেশ দেবার জন্যেই নিশ্চয় রোটেনস্টাইনের ভূমিকা।

১ রোটেনস্টাইন সম্বন্ধে আগেই প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায় পরিচায়িকা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। দ্র. 'চিত্রকলাবিদ্যা ও উইলিয়াম রোটেনস্টাইনের চিত্রাবলী'। অশ্বিনীকুমার বর্মন (ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন)। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৭ ও 'উইলিয়ম রোটেনস্টাইন'। অসিতকুমার হালদার। ভারতী, চৈত্র ১৩১৭।

'জ্যোতিদাদার ছবি তাঁর . . .'॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবি প্রসঙ্গে রোটেনস্টাইন। রোটেনস্টাইন ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৮য় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি ছবির প্রতিলিপি দেখে অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মূল ছবির খাতা দেখে তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। পাশাপাশি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২য় লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ আরেকটু বিশদ করে রোটেনস্টাইনের মনোভাব জানিয়েছেন :

সম্প্রতি জ্যোতিদাদার গোটাতিনেক ছবির খাতা আনিয়ে আমি রোটেনস্টাইনকে দেখতে দিয়েছি। তিনি দেখে স্তম্ভিত হয়েছেন। আমাকে তিনি বল্লেন, আমি তোমাকে গোপনে বলচি, অন্য লোকে শুনলে হয় ত বেদনা পেতে পারে, ইনিই তোমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের হাতের যে নৈপুণ্য তাই এই ছবির মধ্যে আছে। এই ছবির খাতা এখানে যে দেখচে সেই খুব প্রশংসা করচে। এতদিন এই ছবির খাতা আমাদের দেশে যে অখ্যাতভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেছে এতে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। এঁর ছবির বিষয়ে এখানে ইনি লিখবেন বলেছেন। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠতা যে কোথায় কোথায় আছে তা জানি নে বলেই আমাদের দারিদ্র্য এত সুগভীর ।... এ ছবির একটা selection ছাপাবার জন্যে রোটেনস্টাইন আমাকে বলচেন। ছবি ছাপানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য তবু যেমন করে হোক এর একটা গতি করতে হবে।

আগের দিন ৩ সেপ্টেম্বর ১৯১২র চিঠিতে স্বর্ণকুমারী দেবীকেও রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

জ্যোতিদাদার ছবির খাতা এখানকার কোনো কোনো আর্টিস্ট দেখে খুব প্রশংসা করচে। এরা বলে ওঁর drawing একেবারে প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের হাতের উপযুক্ত। এখানকার কাগজে ভাল লোক দিয়ে ওঁর ছবির সমালোচনার বন্দোবস্ত করা যাচ্চে। এঁরা বল্‌চেন, উচিত ওঁর ছবির একটা slection ছাপাতে। ছবি ছাপানো ভয়ানক খরচ। অন্তত হাজার দেড়েকের

কমে হতেই পারে না। জ্যোতিদাদাকে লিখেচি যদি কিছু টাকা পাঠাতে পারেন তাহলে ছাপবার ব্যবস্থা করা যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পর পর তিনখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির প্রশংসা ও ছবি ছাপবার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে লেখেন।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২র পত্রখানি এই :

ভাই জ্যোতিদাদা,

আপনার ছবির খাতা আমি Rothensteinকে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত artist; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বল্‌ছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রয়িং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। most marvellous, most magnificent— এই ত তাঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত art criticকে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। Portfolioর আকারে একটা selection তোমাদের করা উচিত। . . . যেটা যথার্থ আপনার নিজের জিনিয এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এই ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। রোথেনস্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এঁর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত; এ কথাটা চাপা রাখলে চলবে না।

২৯ ভাদ্র ১৩১৯

আপনার স্নেহের রবি

ওই দিনেই রোটেনস্টাইনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেছিলেন :

11, Oak Hill Park, Frognal
Hampstead
Sept 14. '12

My dear Sir.

Let me thank you for your kindness in sending over the three books containing your drawings. As I expected from the reproductions I saw in an article on your brother, they are admirable. I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it would be difficult to match. I do not know which I prefer, the drawings of the men or of the women. Your drawings of ladies remind me of the early drawings by Dante Gabriel Rossetti and the admirable drawings by the great French artist, Puvis de Chavanes. Indeed the books have been— and still are a source of great delight to me, and all to whom I have shown them have had similar feelings regarding them. One or two of your sisters it has been my privilege to meet— I need not speak of your brother Rabindranath, so dear to all of us here: there is a beautiful drawing of his son and one of Kawagachi, whom I saw at Benares. I hope, with your permission, to get one or two of your drawings reproduced here. If ever I return to India— a hope which is very near my heart— the privilege of your

acquaintance will be one of the pleasures to which I shall look forward.

Your brother's presence among us is a great joy to us and his friendship I count as one of the great assets of my life. Once more let me thank you for your prompt response to my wish to see more of your work.

Believe me to be most faithfullly yours
William Rothenstein

এর পরের পত্রে ১৭ অক্টোবর ১৯১২ রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

ভাই জ্যোতিদাদা

গত মেলে আপনার চিঠি পেয়েছি কিন্তু ছবির খাতা এসে পৌঁছতে বোধ হয় দু-এক মেল দেরি হতেও পারে। আমরা আবার পর্শু আমেরিকায় যাত্রা করচি। এখানে বলে দিয়ে যাব খাতা এসে পৌঁছলে Rothenstein এর কাছে পাঠিয়ে দিতে। তাঁর সঙ্গে ঠিক করচি আপনার ছবি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ এখানকার Studio কাগজে এবং আমাদের Modern Reviewতে লিখতে। তাতে কিছু কিছু উদাহরণ আপনার খাতা থেকে সংগ্রহ করে দিতে পারেন।

শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ছবির খাতা এসে পৌঁছয় নি। ১৪ নভেম্বর ১৯১২য় রোটেনস্টাইন আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানান :

No parcels have yet come from India, but I had a charming letter from your brother and when the new books come I will set about getting the reproductions made.

২৬ নভেম্বর এবং ১৫ ডিসেম্বরের চিঠিতেও রোটেনস্টাইন খাতা এসে না পৌঁছনোর কথা জানান রবীন্দ্রনাথকে। অতঃপর ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩য় নিউইয়র্ক থেকে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রিনাথকে লেখেন :

আপনার খাতাগুলো সমস্তই রোটেনস্টাইনের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে। আমি লন্ডনে ফিরে গেলে সেগুলো থেকে ছবি নির্বাচন করে কিভাবে কি করা যেতে পারে তা স্থির করব। ইতিমধ্যে আপনি সেগুলো ছাপাবার খরচ কিছু সংগ্রহ করে রেখে দেবেন।

১৯১৪য় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবির বই প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্র নিম্নরূপ : Twenty-five Collotypes / From the Original Drawings by / Jyotirindra Nath Tagore. / Hammersmith. / Made and Printed by / Emery Walker Limited. / 1914.

বইয়ের ভূমিকা লেখেন উইলিয়ম রোটেনস্টাইন। দেড়-পৃষ্ঠার ভূমিকার শেষাংশে রোটেনস্টাইন লেখেন :

Art is the cultivation of passion, which like all cultivation, demands infinite labour, skill and patience, as well as infinite will, if it is to bear ripe and wholesome fruit. Something of this passion I feel in the drawings of Mr. Joytirindra Nath Tagore. He is of a simple and modest kind, but in each of the drawings one feels he was absorbed by the unique desire to express something of the delicacy of form and gravity of character of his sitter.

We are so used to seeing protraits of Maharajahs in their state apparel, or photographs of unusual types in books of travel, that this straightforward Portraiture of cultured Indian ladies and gentlemen, of whom we in England hear and know so little, is a new and delightful

thing. Mr. Jyotirindra Nath Tagore has allowed some twenty-five of his drawings to be reproduced by Mr. Emery Walker. and I believe these will give to many of us the human and intimate picture of Bengali character we get from the novels of Bankim Chandra Chatterjee.

'জীবনস্মৃতি'তে গগনেন্দ্রনাথের ছবি॥ 'জীবনস্মৃতি'র জন্য গগনেন্দ্রনাথ চব্বিশখানি ব্রাশে আঁকা সাদা-কালো ছবি এঁকে দেন। আমেরিকা থেকে ১৪ ডিসেম্বর ১৯১২য় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'জীবনস্মৃতি'র বাঁধানো বই এখনো আমার হাতে আসে নি। আলগা অবস্থায় যখন এসেছিল তখনই ওর ছবিগুলো দেখেছি। যাঁরা দেখেছেন সকলেরই খুব ভালো লেগেচে। এখানকার একজন অধ্যাপককে দেখাচ্ছিলুম, তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। গগনের এই ছবিগুলি যে আমার জীবনস্মৃতির সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে জড়িত হয়ে রইল এতে আমি ভারি আনন্দ বোধ করচি।

এর পরে মণিলালকে পুনরায় লেখেন :

গগন তাঁর সেই জীবনস্মৃতির ছবিগুলি যেন আমাকে পাঠিয়ে দেন— সেগুলি আমি ভাল করে বাঁধিয়ে নিতে চাই। রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়ো।

গগনেন্দ্রনাথের ১৯১২ সালের এই ছবিগুলির সঙ্গে ১৯১০এ প্রকাশিত চীনা কালিতে আঁকা তাঁর Twelve Ink Sketchesএর মিল আছে বলা হয় কিন্তু অন্যান্য ছবির সঙ্গে এই ছবিগুলি অতুলনীয়। নীরদচন্দ্র চৌধুরী গগনেন্দ্রনাথের চিত্রব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন : এই চিত্রগুলিতে আমরা যে শুধু চিত্রার্পিত বিষয়ের বস্তুসত্তা অনুভব করি তাহাই নয়— বরঞ্চ তাহা বড় একটা করিই না— আমাদের মন দৃষ্টিগ্রাহ্য জিনিসগুলির অতিরিক্ত একটা ভাবের আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। এই ভাবাবেশের স্বরূপ কি তাহা পুস্তকের পৃষ্ঠাতে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা পড়িলেই বোঝা যায়। এই ছবিগুলিতে গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত দৃশ্যগুলি আঁকিয়া ক্ষান্ত হন নাই, চিত্রে যতটা

সম্ভব রবীন্দ্রনাথের মনকেও আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[১]

।বনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র'।। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' ব্যয়বহুল গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নগেন্দ্রনাথ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৯ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের নিম্নোদ্‌ধৃত এই বিজ্ঞাপন ছাপা হয়।

শী ঘ্র ই প্র কা শি ত হ ই বে

প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত কবিকলগুরু রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি" বহুলপরিমাণে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস হইতে শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থের নানা স্থানের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া ওরিয়েন্ট্যাল আর্ট সোসাইটির বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাইশখানি একেবারে নূতন ধরনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বইখানিকে কাগজে, চিত্রে, ছাপায়, বাঁধাই— সকল দিকেই সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রকাশক চেষ্টার ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি রাখেন নাই। 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে কবিজীবনের যে পরিচয়টুকু আমরা পাই তাহাকে আমরা আরো স্পষ্ট, আরো সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশে কবিবরের লিখিত বহুদিন সঞ্চিত রাশীকৃত চিঠিপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া 'ছিন্নপত্র' নামে একখানি গ্রন্থও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বাংলাদেশের বাংলাকবির যথার্থ পরিচয় এই গ্রন্থ দুইখানিতে পাওয়া যাইবে। বাঙালীর ঘরে ঘরে এই গ্রন্থদুইখানির আদর হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

জীবনস্মৃতির মূল্য ৫, টাকা ও ছিন্নপত্রের মূল্য ৩ টাকা।

---

১ দ্র 'গগনেন্দ্রনাথের ছবি'। নীরদচন্দ্র চৌধুরী। বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ ২১১-২১২।

প্রসঙ্গত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গগনেন্দ্রনাথের দৃশ্যচিত্রসমূহ সূত্রে লিখেছেন, 'এই শ্রেণীর অনেক চিত্রে তিনি ভারতীয় রীতির ইম্প্রেশনিজ্‌ম বা প্রতীতিবাদের একটি নতুন অধ্যায় করেছেন রচনা।' 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' ১৩৭৬ পৃ ১৮৪।

বিশেষ সুবিধা— ৩০ আশ্বিন মধ্যে দুইখানি পুস্তকের জন্য আদেশপত্র এক নামে একত্র পাঠাইলে ৮ টাকা স্থলে ৬॥০ সাড়ে-ছয় টাকায় দেওয়া হইবে।

নিম্নে আদেশপত্র দেওয়া হইল। অবিলম্বে উহা প্রেরণ করুন।

আ দে শ প ত্র

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সমীপেষু—

৫৫ নং অপার চিংপুর রোড— কলিকাতা।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে শ্রীযক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নবপ্রকাশিত দুইখানি গ্রন্থ "জীবন-স্মৃতি" / "ছিন্নপত্র" . . . সেট্ ভি.পি.-তে / লোকমারফৎ পাঠাইয়া দিবেন। ইতি

১৩১   সাল, তারিখ . . .

নাম—

ঠিকানা—

দ্রষ্টব্য :— আগামী ৩০শে আশ্বিন মধ্যে প্রকাশকের নিকট এক নামে দুইখানি গ্রন্থের আদেশপত্র পৌছিলে ৮ টাকার স্থলে ৬॥০ টাকায় দেওয়া যাইবে। কলিকাতার অর্ডার লোকমারফৎ- ও মফস্বলের অর্ডার ভি.পি.তে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে।

বিজ্ঞপ্তিটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একাধিক্রমে তিন মাস মুদ্রিত হয়। অতঃপর 'জীবন-স্মৃতি' ২৫ জুলাই ১৯১২ এবং 'ছিন্নপত্র' ২৮ জুলাই ১৯১২ তারিখে প্রকাশ লাভ করে।

প্রকাশমাত্রেই প্রবাসী পত্রিকায় 'জীবন-স্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্রে'র পৃথক পৃথক আলোচনা হয়েছিল। দ্র. 'জীবন-স্মৃতি'। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ পৃ ২১৯-২২০। 'ছিন্নপত্র'। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ পৃ ২২০। অনামিত **আলোচনা।**

পরে অজিতকুমার চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রনাথের দুখানি নূতন পুস্তক' নামে 'বড়সড় ভদ্ররকম সমালোচনা' লেখেন। দ্র. প্রবাসী. পৌষ ১৩১৯ পৃ ২৮৫ -২৯০। অজিতকুমারের 'কাব্যপরিক্রমা' (১৩২২) গ্রন্থে সংকলিত।

পত্র ৫৪। 'কিছুদিন থেকে প্রবাসীতে আমার লেখা পৌঁচচ্ছে না কেন...'।। অগ্রহায়ণ ১৩১৯ থেকে কার্তিক ১৩২০ এই বর্ষকাল প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংবাদ ও আলোচনা. অথবা ভারতী তত্ত্ববোধিনী মানসী থেকে রবীন্দ্ররচনার আহৃতি মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

'ইংরেজি গীতাঞ্জলি ম্যাকমিলানরা... ওরাই আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে'।। তু. রামানন্দকে লেখা চিঠি ২ ডিসেম্বর ১৯১২ : 'ইংরেজি গীতাঞ্জলি আশা করি কোনো ব্যবসাদার ইংরেজ প্রকাশক গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিবে এবং সেই সঙ্গে আমার তরফেও আমি কিছু প্রস্তাব করিব...'। এবং মাধুরীলতাকে ৩ মার্চ ১৯১৩ : 'ইংলন্ডের ম্যাকমিলান কম্পানি আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে বলে কথাবার্ত্তা চল্‌চে।'

ইন্ডিয়া সোসাইটির স্বল্পমুদ্রিত সংস্করণের পাশাপাশি 'গীতাঞ্জলি'র, সেই সঙ্গে অপরাপর রবীন্দ্রগ্রন্থানুবাদসমূহের ব্যাপক বাণিজ্যিক সংস্করণের সম্ভাবনা নিয়ে রোটেনস্টাইন ও ইয়েট্‌সের মধ্যে কথা হয়েছিল, লক্ষ্য করা যায়। ১৮ অগস্ট ১৯১২-র এক পত্রে রোটেনস্টাইন ইয়েট্‌স্‌কে লেখেন, এখন তাঁরা ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে ৭৫০ কপি পরিমিত একটি শালীন 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ করবেন। 'then we propose to offer the book to a publisher, in order that he may issue a larger and more popular Edition, together with other words of Tagore which he and others are working on, in a cheaper form'. রোটেনস্টাইন এই সূত্রে 'উইজ়ডম অফ দি ঈস্ট' গ্রন্থমালার প্রকাশক জন মারে-র কথা বলেন ('Murray I believe is already writing through Cranmer Byang to produce

several volumes of translations...', ওই পত্রে, এবং ইয়েট্স্ তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করার পর : 'There is a rich mine. & if Murray has the courage, these might easily be three or four volumes— the Indian Society book would of course be one of them.')। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাকমিলান কোম্পানির দফ্তরেই সদ্যপ্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি' ও রবীন্দ্রনাথের পরের গ্রন্থানুবাদগুলির পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া হয়। ম্যাকমিলান কোম্পানির রীডার চার্ল্স্ হুইবলি তাঁর সুপারিশপত্রে (নভেম্বর ১৯১২) লেখেন :

Obviously you cannot publish all that at once... what I would suggest to you is this : I would take the already printed volume and publish it with Yeats's preface. Then if that were a success, you might publish another volume of verse, carefully edited by the author and possibly also a volume of dramatic dialogues. In the meantime I do not think you could run any risk by publishing Gitanjali, and you could have the satisfaction of introducing to English readers a real poet.

ম্যাকমিলানের সঙ্গে আর্থিক ও অন্যান্য চুক্তি নিয়ে ব্যবসায়িক কথাবার্তা চালাবার জন্য আর্থার ফক্স্ স্ট্র্যাংওয়েজকে রবীন্দ্রনাথ আইনানুগ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন (দ্র. আর্বানা থেকে ১৩.১.১৯১৩-য় রোটেনস্টাইনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে : '... I have get to sign a document before the notary public empowering Mr. Fox Strangways to negotiate with Messrs MacMillans on my behalf...' অতঃপর রোটেনস্টাইনের ১৭.১.১৯১৩-র চিঠিতে : '... Fox Strangways who has conducted the difficult

negotiations with Macmillan with patience and firmness. & obtained for Gitanjali I fancy the best terms possible.')।

রোটেনস্টাইনকে লেখা ১৬.১.১৯১৩-র পত্রে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর বিদ্যালয়ের অর্থাভাব হেতু আরো অনুকূল শর্তে মার্কিন প্রকাশকদের কাছে তাঁর শিশুকবিতা ও নাট্যানুবাদ ছাপার প্রস্তাব করবেন কি না জানতে চেয়ে লেখেন : 'Dr. Lewis of Chicago told my son that publishers here are much more liberal and prompt with their cash than they are on your side'.

এই চিঠির সূত্রে রোটেনস্টাইন ফক্স্ স্ট্র্যাংওয়েজকে ম্যাকমিলানের সঙ্গে সংযোগ করতে বলেন এবং তাঁর লেখা ম্যাকমিলানের উত্তর লিখে জানান রবীন্দ্রনাথকে :

They write "—in regard to Mr R's letter, we told him [F Str] at the time when he first sent us the book & the unpublished manuscripts that we should be very glad to bring out a second volume of poems if the sale of 'Gitanjali' were satisfactory. & our attitude on the subject is still the same. We think therefore nothing in the meantime should be done either in America or elsewhere in regard to these poems, for if Gitanjali is as successful as we wish it to be we should no doubt be able to arrange to copyright the new poems in the United States & to publish them on both sides of the Atlantic on a royalty basis similar to that which has

been arranged for Gitanjali...''—[১]

'তর্জ্জমা জমে উঠচে... শারদোৎসব তর্জ্জমা...'॥ তু. ইয়েট্‌স্‌কে রবীন্দ্রনাথ ২৪ অগস্ট ১৯১২ : 'He has been most prolific here— he has translated 22 new poems on children, making 26 in all for a volume of children's verses, & also 3 plays, each one of which is remarkable'।

মীরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১২ : 'চিত্রাঙ্গদা মালিনী এবং ডাকঘর তর্জ্জমা করেছি সেইগুলো ছাপাবার জন্যে আমার বন্ধু রোটেনস্টাইন খুব উৎসাহ করচেন। তা ছাড়া "শিশু" থেকে এবং অন্যান্য বই থেকেও অনেকগুলো তর্জ্জমা করেছি। সব শুদ্ধ নিতান্ত কম জমেনি।'

অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ৪ জানুয়ারি ১৯১৩ : 'অজিত পর্শুদিন Yeats-এর গোটা দুয়েক ছোটো নাটক পড়ে আমার হঠাৎ ধারণা হল যে আমার শারদোৎসবটা নিতান্ত মন্দ লেখা হয় নি। সেই উৎসাহে তখনি সেটা তর্জ্জমা করতে লেগে গেলুম এবং কাল রাতেই সেটা শেষ করে ফেলেছি...'।

The Autumn-Festival নামে মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশ।[২] নভেম্বর ১৯১৯ পৃ ৪৬৯-৪৮২, এক লাইন এই মন্তব্যসহ : 'Translated by the author from a Bengali play written for the boys of Shantiniketan.'

---

১ দ্র চিঠিপত্র ১২ পৃ ৩২, চিঠিপত্র ৪ পৃ ১০, *Letters to W.B Yeats*, ১৯৭৭, পৃ ২৪৮-২৫০। Lago *Imperfect Encounter* পৃ ২১-২২, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৩, ৯৫, ৯৭। জন মারে প্রকাশিত 'উইজ্‌ডম অফ দি ইস্ট' গ্রন্থমালার সম্পাদক আলফ্রেড ক্র্যানমার বীং। প্রসঙ্গত ১৯১৩ সালেই ম্যাকমিলান 'গীতাঞ্জলি' ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের *The Gardener* (অক্টোবর) *Sadhana* (অক্টোবর) এবং *The Crescent Moon* (নভেম্বর) ছেপে ফেলেছিলেন।

২ রবীন্দ্রবীক্ষা ২৭ , পৌষ ১৪০১-এ প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ পুনর্মুদ্রিত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ২৫ নভেম্বর ১৯১৯ লিখেছেন, 'Autumn Festival তর্জ্জমার সম্মতি চাহিয়া আমার কাছে বিস্তর পত্র আসিতেছে...', সম্ভবত অপর কোনো ভাষায় তর্জ্জমার সম্মতি চেয়ে।[১]

'এ দেশের লোকেরা বক্তৃতার কাঙাল...'॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মাধুরীলতা মীরা দেবীকে, ইন্দিরা দেবীকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই উপর্যুপরি বক্তৃতার কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। মীরাকে ২২ অক্টোবর ১৯১২-র চিঠিতে লিখেছেন, 'এখানে এসে অবধি সহরে সহরে বক্তৃতা দিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্চি।' তারপর ২২ জানুয়ারি ১৯১৩-য় লিখেছেন, রচেস্টার, সেখান থেকে বস্টন, নিউ ইয়র্ক, কালিফর্নিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দেওয়ার কথা। লিখেছেন, 'প্রথমে আমি অস্বীকার করেছিলুম— কিন্তু তোরা তো জানিস শেষ পর্য্যন্ত আমার অস্বীকার টেঁকে না। পীড়াপীড়ি এড়াতে পারি নে।' মাধুরীলতাকে লিখেছেন, 'এদেশের লোকের ভয়ানক বক্তৃতা শোনবার সখ। তাই এখানে এরা আমাকে ক্রমাগত বক্তৃতা করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে...' (১৯.২.১৯১৩-র পত্র)। রামানন্দকে লিখছেন (১.২.১৯১৩-র পত্র) : 'আমি এখানকার সভায় পড়বার জন্যে গোটাকতক ইংরেজি বক্তৃতা লিখেছি। তার একটা শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে পড়েছি। সেখানকার শ্রোতাদের ভাল লেগেছে। সম্ভবত এখানেও [বস্টনে] পড়তে হবে। তার পরে Wisconsin, Iowa, Perdue এবং Michigan বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। অর্থাৎ এদেশে যতদিন আছি এগুলো পড়তে হবে।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ১৩.২.১৯১৩ তে লিখছেন, শিকাগো য়ুনিভার্সিটি, বস্টনে হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি, ইলিনয় য়ুনিভার্সিটি, তারপর, 'Michigan, Pardue, এবং Iowa University থেকেও নিমন্ত্রণ পেয়েছি কিন্তু আমার আর পোযাচ্ছে না।' তারপর ৬ মে ১৯১৩-য় লিখছেন

১ দ্র. *Letters to W B. Yeats* ১৯৭৭ পৃ ২৫০; চিঠিপত্র ৪ পৃ ৬৯; দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৭ পৃ ১৩৮; চিঠিপত্র ১২ পৃ ৭৬।

ইন্দিরা দেবীকে : 'আমি সহরে একটু গুছিয়ে বসবামাত্রই বক্তৃতার জন্যে তাগিদ আসতে লাগল।... বলতে পারব না একথা বারবার বলার চেয়ে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সহজ। এমনি করে আমেরিকায় আমার টুঁটি চেপে ধরে বক্তৃতা বের করে নিলে।'

এর মধ্যে ১৭ জানুয়ারি ১৯১৩-য় রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'I am sure you are most wise not to take unnecessary tasks upon yourself— I can imagine how people will be pressing you to lecture and write'.[১]

দ্বিজেন্দ্রবাবুর জন্যে আমি সত্যই দুঃখ বোধ করি... প্রার্থনা করি এই কালিমা সম্পূর্ণ কাটিয়ে তিনি তাঁর প্রতিভাকে পবিত্র করুন'॥ ১৬ ডিসেম্বর ১৯১২ তারিখে স্টার থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিত 'আনন্দবিদায়' প্রহসনের উদ্‌বোধনী অভিনয় প্রবল বিক্ষোভে হট্টগোলে অর্ধপথেই ভেঙে যায় এবং মারমুখী দর্শকের উত্তেজনার হাত থেকে বাঁচাতে রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ থিয়েটারের পিছন-গলি দিয়ে নাট্যকারকে নিরাপদ স্থানে বার করে নিয়ে যান, এ বাবদে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব এই দুই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। ভারতী গোষ্ঠীর তরুণ কবি-লেখকেরা এই রবীন্দ্রনিগ্রহনাট্যখানি দল বেঁধে দেখতে গিয়েছিলেন। প্রভাতচন্দ্র লিখেছেন, 'নাটকের উদ্‌বোধনী দিবসে আমরা "ভারতী"র আড্ডার আড্ডাধারী কজন দেখতে গিয়েছিলাম সে ব্যঙ্গের স্বরূপটিকে; প্রতিবাদ করা বা ঝঞ্ঝাট পাকাবার মত কোন মৎলব তখনও পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে ক্রমশঃই উত্তেজনা বাড়তে থাকে, ধৈর্য ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ উত্তেজনার আধিক্যে পায়ের জুতো ছুঁড়ে মারেন এবং অন্যান্য দর্শকেরাও তাঁদের সঙ্গে সক্রিয় প্রতিবাদে যোগ দেন।

---

১ দ্র. যথাক্রমে চিঠিপত্র ৪ পৌষ ১৩৫০ পৃ ৪০, ৪৮-৪৯, ৭৫: চিঠিপত্র ৫ পৌষ ১৩৫২ পৃ ১৪-১৫: Lago : *Imperfect Encounter* ১৯৭২ পৃ ৮৯

অপরপক্ষে নরেন্দ্র দেব লিখেছেন, 'আনন্দ বিদায়' বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর 'ভারতীর দল স্থির সংকল্প করলেন এ নাটক কিছুতেই অভিনয় করতে দেওয়া হবে না। প্রথম অভিনয় রজনীতেই এ নাটকের কণ্ঠরোধ করবার জন্য ভারতীর দল প্রেক্ষাগৃহের সকল শ্রেণীর আসনের বেশ কিছু প্রবেশপত্র কিনে ফেললেন এবং স্টার থিয়েটার বা দ্বিজেন্দ্রভক্তদের কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেওয়া হল না যে 'আনন্দবিদায়'কে শুরুতেই রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় করবার জন্য ভিতরে ভিতরে কি বিপুল ষড়যন্ত্র হয়েছে।'[১]

প্রভাতচন্দ্র ভারতীর দর্শকদলের নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নেই, অভিনয় দেখতে না গেলেও সম্ভবত তাঁরই কাছে দ্বিজেন্দ্রলালের অশালীন ব্যঙ্গনাট্য এবং প্রতিলাঞ্ছনার তথ্য রবীন্দ্রনাথ জানতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রীতিসম্বন্ধে চিড় ধরেছিল 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০৪) গ্রন্থে অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত স্বলিখিত 'জীবনবৃত্তান্তে'র সূত্রে। সে লেখায় জীবনদেবতা ও দৈব প্রেরণা প্রসঙ্গে 'রবিবাবু তাঁহার সকল রচনা সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষভাবে Divine Inspiration দাবি করেন' এই দম্ভ ও অহমিকায় 'বিরক্ত, উত্যক্ত ও উত্তেজিত' হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল 'তীব্র ভাষায় তিরস্কার' করে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন, রবীন্দ্রনাথও তার এক 'উগ্র' উত্তর দেন এবং তারপর আরো উত্তপ্ত পত্রালাপ চলে[২] — তার একটি মাত্র ২৩শে বৈশাখ ১৩১২ তারিখের রবীন্দ্র-লিখিত পত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে উদ্‌ধৃত করেছেন (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড ১৩৯৫ পৃ ৩৭৩-৩৭৫)। অতঃপর ১৯০৬-এ গয়ায় বদলি হয়ে লোকেন পালিতের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা সূত্রে, 'তাঁর মতো সূক্ষ্মদর্শী ও মনস্বীব্যক্তি' রবীন্দ্রনাথের

---

১ পুলিনবিহারী সেন সংগ্রহ, রবীন্দ্রভবন।

২ দেবকুমার রায়চৌধুরী : 'দ্বিজেন্দ্রলাল', বন্ধু বাৎসল্য অধ্যায় পৃ ৩৪৯-৩৫১।

অস্পষ্ট ও লালসাপূর্ণ রচনার বিরুদ্ধে যুক্তি খণ্ডন করতে অপারগ হয়েও তাঁর মতানুকূলে এলেন না দেখে, আর কেবল লোকেন পালিত নন, 'রবিবাবুর প্রতিভার যেরকম দুর্দম্য প্রতাপ তাতে নিশ্চয়ই এসব দেশে অধিকাংশ নবীন লেখকের লেখায় সংক্রামিত হয়ে পড়বে।' এই আশঙ্কায় তাঁরই পরামর্শে লিখিতাকারে কাগজে ছাপতে সংকল্পিত হলেন তাঁর বক্তব্য,[১] এবং ক্রমে ক্রমে 'কাব্যের অভিব্যক্তি' (প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৩), 'কাব্যের উপভোগ' (বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪) ও 'কাব্যে নীতি' (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬) এই তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। 'কাব্যের অভিব্যক্তি'র প্রত্যক্ষ ইন্ধন 'অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থনে' অজিতকুমার চক্রবর্তীর লেখা 'কাব্যের প্রকাশ' (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৩) প্রবন্ধ। অজিতকুমার লিখেছিলেন কাব্য অস্পষ্ট হয় আইডিয়া বা ভাববিষয়ের বৃহত্ত্বের ফলে, দ্বিজেন্দ্রলালের মতে, 'সেটা বৃহৎ আইডিয়ার ফল নহে, অস্পষ্ট আইডিয়ার ফল।' 'আমাদের দেশের অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শীর্ষস্থানীয় কবিতা 'সোনার তরী' অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখান 'অস্পষ্টতা একটা দোষ, গুণ নহে।' 'কাব্যের উপভোগে'র সম্পৃক্ত রূপে পিঠোপিঠি বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়েছিল 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য'। বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, তাঁর রচনায় অহংকার বা অস্পষ্টতাজনিত 'বিকৃতি যদি লক্ষিত হইয়া থাকে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহার শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র আলস্য করেন নাই।' আর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রবন্ধে প্রবুদ্ধ উপভোগজনিত সমালোচনায় এদেশে নিতান্ত অভাবের কথা উল্লেখ করে লেখেন 'বঙ্গ সাহিত্যের মঙ্গল হিসেবেই তিনি অস্পষ্টতার প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তদুপরি 'রবীন্দ্রবাবুর জনকতক নগণ্য চেলা তাঁর উত্তমগুলি অনুকরণে অসমর্থ হয়ে তাঁর অর্থহীন কবিতাগুলোর অন্ধ অনুকরণে ভাবহীন ঝঙ্কার কর্ত্তেন। তাই আমার উক্ত প্রবন্ধটি লেখার প্রয়োজন হয়েছিল।' 'কাব্যে নীতি'তেও তাঁর লক্ষ্য সেই অনুকারীদল।

---

১ পূর্ব গ্রন্থ পৃ ৪১৪-৪১৬।

'রবিবাবুর কবিতার প্রাণহীন ভাবহীন অনুকরণের জ্বালায় মাসিক পত্রের সম্পাদক ও পাঠক উভয়েই জ্বালাতন।' তাঁরা 'রবিবাবুর দোষগুলি হুবহু নকল করিতেছেন।' সে দোষও অতি অধর্মজনক, গর্হিত দোষ। 'রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি' এবং 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যখানি অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখান লম্পটের বা অভিসারিকার সে-সব গান এবং কাব্যখানিতে 'রবীন্দ্রনাথ পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তেমনি বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই।' দুই কবির পক্ষাবলম্বীদের বাদবিতণ্ডার পাশাপাশি সাময়িক পত্রিকায় ব্যক্তিবিরোধ ও সাহিত্য বিতর্ক দুইই প্রবলভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।

এই বিসংবাদের চূড়ান্ত 'আনন্দ বিদায়' নাট্য ও তার অভিনয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের প্রকাশ তারিখ ১৬ নভেম্বর ১৯১২ বলে উল্লেখ করেছেন।[১] দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন অভিনয়ের দিন (১৬ ডিসেম্বর ১৯১২) গিয়ে তিনি দেখেন, 'বইটা তখনও প্রেস হইতে ছাপিয়া আসে নাই' ('দ্বিজেন্দ্রলাল' পৃ ৪৪৪)। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমথ চৌধুরীকে পত্রে লিখেছেন। ' ''আনন্দবিদায়ের''র চাবুক আট বৎসর আগেকার। অধুনা সেটা অভিনীত হয়েছে এই মাত্র।' তা হলে এ নাটক 'বঙ্গভাষার লেখকে'রই সময়কার। বইয়ের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, 'যদি কোনও কবি কোনওরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য।' তাঁর জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন, 'দ্বিজেন্দ্র যে দুর্নীতির প্রভাব হইতে বঙ্গসাহিত্যকে রক্ষা করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি বাণীভক্ত মাত্রেরই আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।' আরো লিখেছেন, তিনি 'এ বিবাদ ব্যক্তিগতভাবে দেখেন নাই। কবিদ্বয়ের স্তাবকগণই এ বিবাদকে প্রধূমিত করিয়াছিলেন।'[২]

১ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৯, আষাঢ় ১৩৬৬ পৃ ২৮।

২ নবকৃষ্ণ ঘোষ : 'দ্বিজেন্দ্রলাল' ১৩২৩ পৃ ২৯১-২৯২।

প্রবাসে, ব্যবধানে, বৃহৎবিশ্বের অভ্যর্থনার মুখে দাঁড়িয়ে দেশজ দলাদলির ক্ষুদ্রতা এবং অনুরাগী অনুজ বন্ধুদের লাঞ্ছনার সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ অসহায় বোধ করেছিলেন। পরের চিঠির উপান্ত্য অনুচ্ছেদে তা লক্ষ্য করা যায়। 'তোমাদের প্রতি একান্ত স্নেহ সত্ত্বেও আমাকে বোধ হয় হার মানতে হবে।' (দ্র. এই বই পৃ ৬৫)— যেদিন একথা লেখেন দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয় সেদিন। সম্ভবত পরাজয় স্বীকার করে নিয়েই দ্বিজেন্দ্রলালকে তিনি পত্র লিখেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বাহ্ণে দ্বিজেন্দ্রলাল সে পত্রের উত্তর দিতেও বসেছিলেন।[১] প্রস্তূয়মান ভারতবর্ষ মাসিকের সূচনা পত্রের জন্য তিনি লিখে গিয়েছিলেন, 'আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন তাহা হইলে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন এবং রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।' পাশ্চাত্যদেশে রবীন্দ্রনাথের সমাদর বা নোবেল পুরস্কারের সংবাদ তিনি জেনে যান নি। দ্বিজেন্দ্রলালের অনুরাগী বন্ধু দেবকুমার রায়চৌধুরীর দ্বিজেন্দ্রজীবনীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'আমি যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটেই আসল কথা এবং এইটেই মনে রাখিবার যোগ্য... সাময়িক পত্রে যে সকল সাময়িক আবর্জনা জমা হয় তাহা সাহিত্যের চিরসাময়িক উৎসবসভার সামগ্রী নহে।'[২]

পত্র ৫৫ । 'আমার হাটের বেসাতি শেষ হয়ে গেছে ...' ইত্যাদি।। আরও কিছুদিন পরে মীরা দেবীকে লিখেছেন[৩] :

---

১ জানুয়ারি ১৯২৭এর এক পত্রে দিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি। সে কথা জানিয়ে তাঁকে ইংলন্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিলেম, শুনেছি সে পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর লিখেছিলেন। সে উত্তর আমার হাতে পৌঁছয় নি।' দ্র. দিলীপকুমার রায় : 'তীর্থংকর' ১৯৮২ সং পৃ ২৭০।

২ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড ১৩৯৫ রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল অধ্যায় পৃ ৩৬৬-৩৮২। গায়ত্রী মজুমদার : 'রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল' ১৩৮৬।

৩ চিঠিপত্র ৪ পৃ ৫৮-৫৯।

এখানকার লোকসমাজের টানাটানিতে আমার মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত ক্লান্তি এসেছে। আমাদের দেশের জনশূন্য নিভৃত কোণটির মধ্যে কিছুদিন চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি তা হলে হাড়গুলো জিরয়। কিন্তু আবার ভাবি সেখানে গিয়ে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে— তা ছাড়া এবার ফিরে গেলে সেখানে মানুষের ধাক্কা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যাবে— তার থেকে নিজেকে বাঁচানো আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে— এর উপরে আবার আমার সমালোচক বন্ধুদের দল আছে— তাদের কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক উচ্চতর সপ্তকে চড়বে। মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলবার উপকরণ সেখানে যে কিছু কম আছে তা বলতে পারি নে। তা হোক তবু সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— নিজের বাসা ছেড়ে কোথায় বা ঘুরে বেড়াব। ...

গাণ্ডীব ॥ দ্র. মহাভারত, মৌষল পর্ব ৭-৮ অধ্যায়। তুলনীয় : অর্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই তখনই তিনি দস্যুর হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। ' "স্বদেশী সমাজ" গ্রন্থের পরিশিষ্ট'। আশ্বিন ১৩১১।[১]

গাণ্ডীব তুলতে না পারার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ আরো কখনও কখনও ব্যবহার করেছেন যেমন, প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির তিনটি অংশ উদ্‌ধৃত করি[২] :

আমারও সাহিত্যলীলা শেষ হয়ে এসেছে— এখন গাণ্ডীব তোলবার শক্তি নেই। ৮ অক্টোবর ১৯১৪

প্রমথ, অর্জ্জুনের একটা সময় এসেছিল যখন সে নিজের গাণ্ডীব নিজে আর তুলতে পারে নি। আমার কি গাণ্ডীবের কারবার ছেড়ে দেবার দিন আসবে না, মনে করচ? ১৩ এপ্রিল ১৯১৭

শেষ দশায় অর্জ্জুন গাণ্ডীব তুলতে পারেন নি আমার সেই অবস্থা। আমার

---

১ 'আত্মশক্তি'। রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড ১৩৭১ সং পৃ ৫৫২।

২ চিঠিপত্র ৫ পৃ ১৮৯. ২১৬, ১২৬।

চিরদিনের কলম আজ পরের ঘাড়েই চাপাতে হচ্ছে . . . । ১৩ মে ১৯৪১।

নিজের দৃষ্টান্ত ব'লে স্মরণ করবার আগে থেকেই মহাভারতোক্ত গাণ্ডীবধারী অর্জুনের কাহিনীর উপরে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সংসক্তি ছিল লক্ষ্য করা যায়। অর্জুনের বীরত্বগৌরবের পরিপূর্ণ দিনের একখানি নাটক লিখেছিলেন যখন 'অর্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী। / সমস্ত জগৎ হতে অক্ষয় সে নাম'খানি লুণ্ঠন করে কুমারীহৃদয় পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন মণিপুররাজকন্যা।[১] অর্জুনের নিয়তিকৃত অশক্যতার দিনের আরেকখানি নাটক লেখবার পরিকল্পনাও ছিল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ জানিয়েছেন :

লেখা হয় নি এমন একটা নাটকের কথা বলি। কবির কাছে শুনেছি, যে সময় 'কচ ও দেবযানী', 'গান্ধারীর আবেদন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতি মহাভারতের গল্প নিয়ে লিখছেন তখন আরেকটা গল্পের কথাও মাথায় এসেছিল। যদুবংশের মেয়েদের দস্যুরা হরণ করে নিয়ে গেল, অর্জুনও তাদের রক্ষা করতে পারলেন না। প্রথমে ভেবেছিলেন চৌদ্দ অক্ষরের পদ্যে লিখবেন, কিন্তু সেই সময় অনেকগুলি লেখা ঐভাবে হওয়ায় এটাতে আর হাত দেন নি। অনেক দিন পরে 'রাজা' আর 'অচলায়তন' যখন লেখা হয়, তখন ভেবেছিলেন এই নিয়ে একটা গদ্য নাটক লিখবেন। সেই সময় আমাকে বললেন কী ভাবে লেখবার ইচ্ছা। কৃষ্ণ, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই আর যদুবংশের সব বীরেরা বড়ো বড়ো কথা আর বড়ো বড়ো আদর্শ নিয়ে ব্যস্ত, মেয়েদের দিকে মন দেবার সময় নেই। মেয়েরা আছে শুধু ঘরকন্নার কাজ নিয়ে। কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। ওদিকে অনার্য দস্যুরা হল পৃথিবীর মানুষ, তারা এসে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, গান শোনায়। মেয়েদের মন তাদের দিকেই আকৃষ্ট হল। মেয়েরাই তখন লুকিয়ে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত নষ্ট করল— যাতে দস্যুরা তাদের সহজে হরণ করে নিয়ে যেতে পারে। দস্যুদের ঠেকাতে গিয়ে অর্জুন দেখেন তাঁর

১ 'চিত্রাঙ্গদা' (১২৯৯)

গাণ্ডীবের ছিলা কাটা। সমস্ত ব্যাপারটা তিনি বুঝলেন, কিন্তু তখন আর কিছু করবার সময় নেই। যে কারণেই হোক এ নাটকটা লেখা হয় নি।[১]

'এখান থেকে রওনা হতে...'॥ ফেরা : রবীন্দ্রনাথ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩য় লিভারপুল থেকে জাহাজে উঠে ৪ অক্টোবর বোম্বাইয়ে, ৬ অক্টোবর ১৯১৩য় কলকাতায় ফেরেন।

পত্র ৫৬। 'আমার সম্মানলাভে যাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে...' ইত্যাদি॥ অপর হস্তে লিখিত সাইক্লো করা পত্র।

১৪ই নভেম্বর ১৯১৩ কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ এসে পৌছয়। সীতা দেবী লিখছেন , '১৪ই নভেম্বর কলেজ হইতে ফিরিবামাত্র শুনলাম যে রবীন্দ্রনাথ Nobel Prize পাইয়াছেন। কলিকাতা শহরে মহা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। শুনিলাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম কবিকে এই খবর টেলিগ্রামে জানাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে টেলিগ্রাম লিখিতে জানিতেন না, অন্য কাহাকে দিয়া লিখাইতে গিয়া দেরি হইয়া গেল, তাঁহার আগেই আর একজন টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন।'[২]

---

১ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ : 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ' ১৩৯২ পৃ ১৫৮-১৫৯।

২ 'পুণ্যস্মৃতি' । ১৩৪৯ পৃ ১১৯-১২০ ।

নোবেল প্রাইজের সংবাদ পাওয়ার পর চারুচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া পুলিনবিহারী সেন তাঁর প্রবন্ধে চারুচন্দ্রের 'সত্যেন্দ্র পরিচয়' (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯ পৃ ৫৮৩-৫৯৫) রচনা থেকে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। 'রবিরশ্মি' বইয়ে 'গীতাঞ্জলি' আলোচনার সূত্রে চারুচন্দ্র প্রসঙ্গটি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন :

এই ['গীতাঞ্জলি'] পুস্তকের দ্বারা সমগ্র ইউরোপে কবির কবিত্বখ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৩২০ সালের ২৭এ কার্তিক ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর এ দেশে সংবাদ আসে যে কবি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। সত্যেন্দ্র দত্ত এই সংবাদ পাইয়া একখানি এম্পায়ার কাগজ কিনিয়া লইয়া আমার কাছে আসেন, এবং সত্যেন্দ্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি তিনজনে মিলিয়া কবিকে সংবর্ধনা করিয়া আমাদের সানন্দ প্রণাম জানাইয়া টেলিগ্রাম করি; কবির নিকটে তাঁহার জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেলিগ্রাম প্রথম পৌছিয়া এ সংবাদ দেয়, তাহার পরে আমাদের টেলিগ্রাম পৌছে। ইহাতে সত্যেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন— তিনি বলিয়াছিলেন, আমি টেলিগ্রাম করিতে জানিলে আমার টেলিগ্রাম সর্বাগ্রে পৌছিত।

২৩শে নভেম্বর কলকাতা থেকে পাঁচ শো গুণগ্রাহীর একটা দল স্পেশ্যাল ট্রেনে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করতে চললেন। এই দলে সর্বধর্মের এবং সর্বসমাজস্তরের ব্যক্তিরা ছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের সভাস্থলে জাস্টিস্ আশুতোষ চৌধুরীর প্রস্তাবে ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সমর্থনে জগদীশচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন, জগদীশচন্দ্র ও পূরণচাঁদ নাহার তাঁকে মালা পরান এবং 'অভিনন্দনাদি প্রদান করিবার পর কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবীন্দ্রের অসীম শক্তি ও গুণরাশি বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা পাঠ' করেন। অপিচ রবীন্দ্রনাথের 'সম্মানলাভে যাঁহারা আনন্দ প্রকাশ' করতে গিয়েছিলেন তাঁদের এই বর্ণাঢ্য অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কথায় প্রতিভাসণে সেই অভ্যাগতেরা বিস্মিত দুঃখিত ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এলেন।[১]

এই নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রবীন্দ্রসাহিত্যের ভক্ত স্পেশাল ট্রেনে শান্তিনিকেতনে যাইয়া ৭ই অগ্রহায়ণ ২৩এ নভেম্বর ১৯১৩ সালে কবিকে সংবর্ধনা করেন।

তিনজনে যে টেলিগ্রামখানি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন তার প্রতিলিপি নিম্নরূপ :

টেলিগ্রাফ Date 14 Hour 16=10

Received at 16=43

16 Words
Rabindranath Tagore
Santiniketan. Bolpur.
Nobel Prize conferred
on you our congratulations
Manilal Satyendra
Charu

প্রসঙ্গত, অভিনন্দন সভায় সত্যেন্দ্রনাথের পঠিত কবিতাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় : 'আভ্যুদয়িক'। প্রবাসী, পৌষ ১৩২০ পৃ ২৩০-২৩৭। '৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে বোলপুরে "রবীন্দ্র-সঙ্গমে" পঠিত' বলে উল্লেখ আছে।

১ পুলিনবিহারী সেন : 'কবি-সংবর্ধনা ১৩১৮-১৩২৮'। দেশ, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮ পৃ ৩৩-৫০ প্রবন্ধের 'নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে সংবর্ধনা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। পুলিনবিহারীর প্রবন্ধে প্রতিলিপি-সহ অভিনন্দন পত্রখানি এবং তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের বহু-আলোচিত প্রতিভাষণটি মুদ্রিত হয়েছে ।

শান্তা দেবী লিখেছেন, 'মিত্ররা অনেকেই মনে করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের ভালবাসা ও সম্মানের অঞ্জলিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই সব মানুষ তাঁহার কথায় আঘাত ত পাইয়াই ছিলেন, উপরন্তু অতিথিদের প্রতি কবির রূঢ়কথার জবাবদিহি করিতে না পারিয়া লজ্জায় সাধারণের কাছে এবং বিশেষ করিয়া শত্রুপক্ষের কাছে তাঁহাদের অনেকদিন মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

'অনুরাগের মর্যাদা যে দেন নাই ইহা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পরে অনেকখানি বুঝিয়াছিলেন। তিনি ২৫শেই রামানন্দের ক্ষুদ্র বাসায় আসিয়া হাজির। ছোট বড় সকলকে ডাকিয়া খবর লইলেন। সেদিন যে উত্তেজনার বশে তাহাদের দেখেন নাই, স্বীকার করেন নাই— ইহার জন্য দুঃখ প্রকারান্তরে জানাইয়া দিলেন। রামানন্দ তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'আমাদের চেয়ে আপনাকে বাহিরের কোনো লোক বা জাতি বেশী ভালবাসিতে পারে ইহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিব না।' রবীন্দ্রনাথ পরাজিত হইয়া বলিলেন, 'আপনার কিংবা জগদীশ প্রভৃতির কথা আমি বলি নি।' তিনি চারুচন্দ্রের ক্ষুদ্র অফিসঘরেও একবার ঢুকিলেন, চারুচন্দ্র অভিমান ও বেদনায় দুদিন আহার করেন নাই। কবি তাহার পর রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন। বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী গিয়া বোধহয় তাঁহাকে অভিমান ভাঙ্গাইতে হইয়াছিল। পরে মাঘ মাসে রামমোহন লাইব্রেরীর এক সভাতেও তিনি ঐ বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন।'[১]

পুলিনবিহারী সেন 'কবি সংবর্ধনা ১৩১৮-১৩২৮' প্রবন্ধের 'নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে সংবর্ধনা শান্তিনিকেতন ৭ অগ্রহায়ণ ১৩২০' অধ্যায়ে এই সম্মান ও সংবর্ধনার বিষয়ে অপূর্ব তথ্য নথিবদ্ধ করেছেন। সীতাদেবী প্রণীত 'পুণ্যস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সত্যেন্দ্র পরিচয়' (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯), ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বোলপুরে রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা'

১ 'রামানন্দ ও অর্ধ-শতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৬৫।

(মানসী, পৌষ, ১৩২৩) লেখার যাবতীয় উপকরণ ছাড়া এডোয়ার্ড টমসনের দুখানি বইয়ের (*Tagore, His Life and Work* 1921 p 44 ও *Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist* 1926 pp 232-233) তথাও তাঁর লেখায় গৃহীত হয়েছে, ওই সংবর্ধনার সময় টমসন শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিনবিহারীর সংকলন-বহির্ভূত সূত্র থেকে আরো দু-এক কথা উদধৃত করি। মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে লেখা হয়েছিল :

Men assembled from other places, too, so that the gathering numbered more than a thousand souls. Science and literature, law and medicine, art and journalism, religion and education all had their eminent representatives there. The aristocracy and the various religious communities, too, were represented. Dr. J. C. Bose was elected to preside on the occasion. That was a rare moment when India's greatest scientist presented the homage and congratulation to India's greatest poet.[১]

বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত এই কলম ২০. ১১. ১৯১৩র Indian Daily Newsএর স্তম্ভে প্রকাশিত হয়[২] :

Poet Tagore

The Bolpore Deputation

An Interesting Ceremony

The long arranged deputation to wait upon Mr.

---

১ *Honour to Rabindranath*. The Modern Review, December 1913 p 641.

২ বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত কর্তিকাসংগ্রহ।

Rabindranath Togore at Bolepore to felicitate him on the award of Nobel Prize came off on Sunday. November 23rd. As previously announced a special train conveying about 500 among whom were also a few Europeans and Mahomedans the majority being Beangali gentlemen left. Howrah for Bolepore on the Loop line at 10-30 a.m. Young Bengali volunteers, who were pressed into the service were early on duty at Howrah to receive the guests and see them to their seats in the train. the trqain could not for obvious reasons be elaborately decorated but a single festoon of flags along its whole length marked it out as a vehicle containig, as a member of the deputation aptly remarked, "ardent pilgrims to the shrine of letters at Bolepore." In any case the journey was delightful.

Among the prominent members of the deputation were : Mr. Justice Chaudhuri, Mr. Bhupendra nath Basu, Dr. J. C. Bose, Professor Mahalanobis, Princip. Satish Chundra Vidyabhusan, Rai Bahadur Dr. Chuni Lal Bose, Babu Krishna Kumar Miter, Dr. P. K. Acharya. Dr. Indu Madhub Mullick. the Rev. Mr. Melburn. Kumar Arun Chundra Sinha. Babu Hirendra Nath Dutt, Mr. S. M. Bose, Mr. D. C. Ghosh. Sr. N. Basu. Maulvie Abdul Kasem. Mr. Jogendra Nath Mitter. Mr. Jamini Mohan Mitter, Babu Ambuj Nath Chatterjee and almost all the

members of the Sahitya Sabha and the Sahitya Parishad and the allied literary institutions in and out of Calcutta. A carriage was reserve for ladies of whom there were about twelve.

The train arrived at Bolepore at about 2-30 p.m. and the deputation was received on the platform by the Rev. C. F. Andrews (who had put on "dhoti" and "chaddar") and a member of students of Mr. Tagore's school. Mr. Tagore's house is about a mile from the stationand the deputation passed through a well-kept road both sides of which were lined with one continuous string of mangoe leaves beneath the bamboo support of which were placed on lotus leaves at intervals cowries, garlands, paddy, copper coins etc., as symbols of good luck.

The deputation was then conducted to a garden in the midst of which two seats were reserved, one of marble meant for the resident and the other of earth temporarily raised and covered with lotus leaves, meant for the poet. The proceedings were heralded by the blowing of conch shells and the singing of a welcome song by a few girls. In the meantime by way of reception the foreheads of the guests were anointed with sandal paste.

When all had assembled, about six members of the deputation went inside the house to accompany the poet

to the place of meeting. This being done, on the motion of Mr. Justice Chaudhuri, seconded by Mr. Bhupendra Nath Basu, Dr. J. C. Bose was voted to the chair.

The poet was then garlanded amidst applause, after which Dr. Bose addresed a few words congratulating him on his own behalf and on behalf of the deputation. Next Babu Hirendra Nath Dutt read a short Bengali address which was printed on silk and presented it to Mr. Tagore.

Mr. Melburn

The Rev. Mr. Melburn recognised it as a great privilege to be allowed to say a few words on behalf of the European and Christian community and to offer a small handful of respect and congratulation to Mr. Tagore who had enriched not only the literature of his own country but the literature of England. In this connection the speaker mentioned that some of the passages of Mr. Tagore's book the "Gitanjali", were being used by Christian students in offering their prayers.

Dr. Satish Chundra Vidyachushan on behalf of the Bengal Sahitya Parishad and also on behalf of the Pandits of Bengal offered congratulations to Mr. Tagore in Sanskrit.

Rai Bahadur Dr. Chuni Lal Bose in congratulating. Mr. Tagore on behalf of the Sahitya Sabha said that Mr.

Tagore occupied the highest place among the people of India.

Maulvi Abdul Kasem offered congratulation on behalf of the Mahomedan Community of...

Mr. Holland

Mr. Holland said that in awarding the Nobel Prize to Mr. Tagore Europe had honoured herself. In this year's award the often quoted couplet ; "East is East, and West is West and that never the twain shall meet" had been repudiated. This year East and West had met in the temple of spirit and not in the temple of God made with hands.

Mr. S. Bhattacharjee then presented Mr. Tagore with a gift in the shape of a picture on behalf of the Bengal artists.

Babu Purnendu Nath Nahar on behalf of the Jaina Sampradaya presented Mr. Tagore with a garland and congratulated him on the honour that he had obtained.

Professor Monmotho Mohun Bose also congratulated Mr. Tagore on behalf of the students of the Sahitya Parishad.

Mr. Tagore's Reply

Mr. Robindra Nath Tagore in reply thanked them for the honour done to him. Although he did not consider

himself worthy of the honour they were bestowing on him. yet he accepted it with great diffidence.

The deputation then broke up and made their way to the station where Mr. Tagore followed them. Then the train left after the usual exchange of cheers and reached Howrah at 10-15 p.m.

Indian Daily News 20. 11. 1913

পত্র ৫৭। 'সুর না থাকলে এ যেন নেবানো প্রদীপের মতো . . . ॥ তু প্রায় এক যুগ পরে বঙ্গবাসী পত্রিকায় গান পাঠিয়ে তার সম্পাদককে লিখছেন : সুর থেকে বিচ্ছিন্ন গান আলোকহীন প্রদীপের মতো— আমার নিজের মতে প্রকাশযোগ্য নয়— শ্রাব্য পদার্থকে পাঠ্য বলে চালিয়ে দেওয়া উচিত হয় না . . . ইতি ১৫ বৈশাখ ১৩৩০

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯০ পৃ ৭।

'দোল' (বসন্তে আজ ধরার চিত্ত) রচনা শান্তিনিকেতন, মাঘী পূর্ণিমা ২৮ মাঘ ১৩২০, প্রবাসী, চৈত্র ১৩২০ পৃ ৬৮২।

'গান' (রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি) রচনা শিলাইদহে ১৫ ফাল্গুন ১৩২০, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১ পৃ ২৫ । 'গীতিমাল্যে'র ৫৫ ও ৬৬ সংখ্যক গান।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ॥ 'একটি মন্ত্র' (১৫ই মাঘে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজগৃহে পঠিত)। প্রকাশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৩৫ শক পৃ ২৫১-২৫৬। রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লিখেছেন, 'ছাপবার কি সময় আছে?' রচনাটি প্রবাসী, চৈত্র ১৩২০ পৃ ৫৭৯-৫৮৩তে পুনর্মুদ্রিত হয়।

'শান্তিনিকেতন' ষোড়শ খণ্ডের (১৯১৬) শেষ প্রবন্ধ ।

পত্র ৫৮। 'সবুজপত্র থেকে তোমরা যত খুসি তোলো আমার আপত্তি নেই ...' ইত্যাদি।। 'সবুজপত্র' সূচনা বৈশাখ ১৩২১। সবুজপত্র থেকে আহৃতি :

শান্তা দেবী লিখেছেন, 'সবুজপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের লেখা একরকম বন্ধ হইয়া গেল। প্রথম বৎসর (১৩২১) তিনি প্রবাসীতে কোনো লেখাই দেন নাই। তবে প্রবাসীর "কষ্টিপাথরে" তাঁহার বিখ্যাত গল্প "স্ত্রীর পত্র" এবং কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা তোলা হইয়াছিল। মনে হইতেছে গল্প তোলাতে সবুজপত্রের দল আপত্তি করেন।'[১]

সবুজপত্রের সূত্রে 'মণিলালের মনের ভাবে'র উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সবুজপত্রের প্রস্তুতিপর্বে ও নানা সময়ে সবুজপত্র উপলক্ষ্যে মণিলালের সঙ্গে সংযোগও করেছেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, সবুজপত্রের প্রথম দু বছর সহকারী রূপে দেখাশুনা করেছিলেন মণিলাল।[২]

সবুজপত্র প্রকাশিত হবার পর প্রবাসীতে লিখতে না পারার এই কারণ জানিয়ে রামানন্দকে ৫ আষাঢ় ১৩২১এর পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

প্রবাসীর প্রতি আমার মমতা কিছুই কমে নাই। আমার মুস্কিল এই যে সবুজপত্রে ঢাকা পড়িয়াছি। ওটা আত্মীয়ের কাগজ বলিয়াই যে কেবল উহাতে আটকা পড়িয়াছি তাহা নহে ঐ কাগজটা আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। অন্য পত্রিকাগুলি বিচিত্রবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে— তাহাতে পাঠকদের মনকে বিশেসভাবে আঘাত করে না, নানা দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। সবুজপত্রের একটা বিশেষ ভাবের আকৃতি ও প্রকৃতি যাহাতে ক্রমে দেশে

---

১ 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৬৬।

২ 'চলমান জীবন' প্রথম পর্ব ১৩৬৩ সং পৃ ১০৮। প্রসঙ্গত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন ভারতীর দলের তরুণ সাহিত্যব্রতীগণই তাঁদের কাগজের জন্য সম্পাদক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীকে বৃত করেন। দ্র 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' ১৩৬৪ পৃ ১৪৬-১৪৮।

সবুজপত্রের সঙ্গে মণিলালের যোগসূত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি উদ্‌ধৃত করেছেন পুলিনবিহারী সেন। দ্র 'পত্রাবলী' শারদীয় দেশ ১৩৭৩ পৃ ১৬।

এইসূত্রে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এই পত্রগুলির সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে : চিঠিপত্র ৫ পৌষ ১৩৫২ পত্র ২৩, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৯।

পাঠকদের মনকে ধাক্কা দিয়া বিচলিত করে সম্পাদকের সেইরূপ উদ্যম দেখিয়া আমি নিতান্তই কর্তব্যবোধে এই কাগজটিকে প্রথম হইতে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।[১]

কেবল সবুজপত্রেই কেন তাঁকে নিবদ্ধ থাকতে হবে প্রমথ চৌধুরীকে সে বিষয় লিখেছিলেন ১৬ এপ্রিল ১৯১৪য় :

আমি নানা কাগজে আমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতে পারি নে— আমার শক্তির প্রাচুর্য আর নেই।[২]

অন্য পত্রিকাদি থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রবাসীতে পুনর্মুদ্রণের সূত্রে শান্তা দেবী লিখেছেন, 'কোনো এক সময় রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও প্রবন্ধাদি 'কষ্টিপাথরে' উদ্‌ধৃত করিবার অধিকার প্রবাসী-সম্পাদককে স্বয়ং দেন। সেইজন্য প্রবন্ধ ও কবিতা 'কষ্টিপাথরে' অনেক সময় উদ্‌ধৃত হইত।'[৩]

ভাদ্র ১৩২১ সংখ্যা পর্যন্ত সবুজপত্র থেকে রবীন্দ্রনাথের এই লেখাগুলি প্রবাসীতে 'কষ্টিপাথর' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২১ পৃ ৪৭৫-৪৭৮

সবুজের অভিযান (সবুজপত্র, বৈশাখ ১৩২১ পৃ ১৭-১৯)

বিবেচনা ও অবিবেচনা (সবুজপত্র, বৈশাখ ১৩২১ পৃ ২০-৩২)

বাংলা ছন্দ (সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ পৃ ৮৮-৯৫)

আমরা চলি সমুখ পানে (সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ পৃ ৯৬-৯৭)

শঙ্খ (সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩২১ পৃ ১৪১-১৪৪)

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২১ পৃ ৫৮২-৫৯০

স্ত্রীর পত্র (সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২১ পৃ ২৩৯-২৬২)

---

১ চিঠিপত্র ১২ পৃ ৪৯-৫০।

২ চিঠিপত্র ৫ পৃ ১৭৬ ।

৩ 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৬৬ ।

সর্বনেশে (সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২১ পৃ ২০৯-২১১)

রাস্তব (সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২১ পৃ ২১২-২২৪)

বাংলা ছন্দ (সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২১ পৃ ২২৫-২৩৮)

অর্থাৎ প্রবাসীর দু মাসের 'কষ্টিপাথরে' ছোটো হরফে মোট ১৩ পৃষ্ঠা ২৪ লমে চার মাসের সবুজপত্রের রচনা সংকলন করা হয়েছিল। তালিকায় মূল রচনার আকরস্থল নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে।

'ইতিমধ্যে যায় গোটা কুড়িক গান লিখেছি . . .' ॥ একই কালে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন, 'প্রবাসীর জন্য আমার খাতায় অনেকগুলি গান জমিয়া উঠিয়াছে— কুঁড়েমি করিয়া কপি আর হইয়া উঠে না। শুনিয়াছি চারু পূজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে আসিবেন তিনি পছন্দ করিয়া বাছিয়া লইতে পারিবেন।'[১]

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এই গান সংগ্রহের স্মৃতি রক্ষা করেছেন। লিখেছেন 'গীতালি'র গানগুলি রচনার সময় আমি কবির কাছে ছিলাম। অনেকগুলি গান রচিত হলে তিনি আমাকে বললেন, ''চারু, তুমি আমার এই গানগুলি নকল করে দিতে পারো। তা হলে ছাপতে দিতে পারি। যে খাতায় গান লিখেছি সেটা প্রেসে দেওয়া চলবে না, খাতাখানা রথী চেয়েছে।''

আমি গানগুলি নকল করে দিলাম।'[২]

এই গানের অনেকগুলি প্রবাসীর জন্য চারুচন্দ্র নকল করেও আনেন। পরবর্তী কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের যথাক্রমে এগারো ও চব্বিশ মোট পঁয়ত্রিশটি গান নীচের ক্রমানুসারে মুদ্রিত হয়, ওই-সব গানের 'গীতালি' কাব্যে ধৃত গীত-সংখ্যাও পাশে উল্লেখ করা হল।

---

১ চিঠিপত্র ১২ পৃ ৫০-৫১।

২ 'রবিরশ্মি— পশ্চিমভাগ'-এর পরিশিষ্ট।

পত্রিকা থেকে গ্রন্থে নেওয়ার কালে অবশ্য অধিকাংশ গানেরই বহুল পাঠপরিবর্তন ঘটে।

'শরতের গান'। প্রবাসী, কার্তিক ১৩২১ পৃ ১-৩ ।

১ আলো যে / যায় রে দেখা॥ রচনা কলিকাতা ৬ ভাদ্র ১৩২১ গীতালি ৫। পরের সব কয়টি গানেরই রচনা সাল ১৩২১ ।

২ এই শরৎ আলোর কমল-বনে॥ র সুরুল ১১ ভাদ্র গী ১৫

৩ তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে॥ র সুরুল ভাদ্র গী ১৬

৪ আমার গোপন হৃদয় প্রকাশ হল॥ র সুরুল ১৩ ভাদ্র গী ১৯

৫ শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি॥ র সুরুল ভাদ্র গী ২৬

৬ কোন বারতা পাঠালে মোর পরানে॥ র সুরুল ২৮ ভাদ্র গী ৩৫

৭ তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে॥ র সুরুল ১ আশ্বিন সন্ধ্যা গী ৪৫

৮ আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে॥ র শান্তিনিকেতন ১৪ আশ্বিন গী ৫৬

'চরম নমস্কার' নামে। প্রবাসী, কার্তিক ১৩২১ পৃ ৩

৯ ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার। শান্তিনিকেতন ১৬ আশ্বিন, সন্ধ্যা গী ৬১

'শেষের দান' নামে। প্রবাসী, কার্তিক ১৩২১ পৃ ৩

১০ ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেছে। শান্তিনিকেতন ১৭ আশ্বিন গী ৬৭ 'গান' শিরোনামে। প্রবাসী, কার্তিক ১৩২১ পৃ ১৭

১১ শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে। সুরুল ১০ ভাদ্র গী ১৩

'গীতিগুচ্ছ'। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২১ পৃ ১০৩-১০৯

১ দুঃখের বরষায় / চক্ষের জল যেই / নামল। শান্তিনিকেতন শ্রাবণ ১৩২১ গী ১

২ আমি হৃদয়ে যে পথ কেটেছি। কলিকাতা ৬ ভাদ্র গী ৪

৩ পথ চেয়ে যে কেটে গেল। সুরুল ৯ ভাদ্র গী ১২

৪ আমি যে আর সইতে পারি নে। ৯ ভাদ্র সুরুল গী ১১

৫ যখন তুমি বেঁধেছিলে তার। সুরুল ১২ ভাদ্র গী ১৭

৬ আগুনের পরশমণি/ছোঁয়াও প্রাণে। সুরুল ১২ ভাদ্র গী ১৮

৭ এক হাতে ওর কৃপাণ আছে। সুরুল ১৪ ভাদ্র গী ২০

৮ ঐ যে কালো মাটির বাসা। সুরুল ১৬ ভাদ্র, সন্ধ্যা গী ২২

৯ যে থাকে থাক না দ্বারে। সুরুল ১৭ ভাদ্র, সকাল গী ২৩

১০ শুধু তোমার বাণী নয় গো। শান্তিনিকেতন ১৮ ভাদ্র গী ২৫

১১ মোর মরণে তোমার হবে জয়। সুরুল ২২ ভাদ্র গী ২৮

১২ না বাঁচাবে আমায় যদি। সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে ২৬ ভাদ্র গী ৩২

১৩ মালা-হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল। সুরুল ২৭ ভাদ্র গী ৩৪

১৪ সামনে এরা চায় না যেতে। শান্তিনিকেতন ২৮ ভাদ্র গী ৩৬

১৫ শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে? সুরুল ২৮ ভাদ্র, অপরাহ্ন গী ৩৮

১৬ এই কাঁচা ধানের ক্ষেতে যেমন / শ্যামল সুধা ঢেলেছ গো। সুরুল ৩১ ভাদ্র গী ৪২

১৭ তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে। সুরুল ১লা আশ্বিন সন্ধ্যা গী ৪৫

১৮ তোমার অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে'। শান্তিনিকেতন ১৩ আশ্বিন রাত্রি গী ৫৫

১৯ কাণ্ডারী গো, এবার যদি এসে থাক কূলে। শান্তিনিকেতন ১৪ আশ্বিন প্রভাত গী ৬৬

২০ মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই। শান্তিনিকেতন ১৭ আশ্বিন প্রভাত গী ৬৫

২১ আমার সুরের সাধন/রইল পড়ে'। শান্তিনিকেতন ১৮ আশ্বিন গী ৭৪

২২ পুষ্প দিয়ে মারা যাকে/চিনল না সে সময়কে । শান্তিনিকেতন ১৯ আশ্বিন গী ৭৩

২৩ এবার কূল থেকে মোর গানের তরী/দিলেম খুলে। শান্তিনিকেতন ১৯ আশ্বিন গী ৭৩

২৪ তোমার কাছে এ বর মাগি। শান্তিনিকেতন গী ৬৯

পত্র ৫৯। 'এখনো প্রয়াগে। কাল দিল্লি যাব . . .'॥ ১৩২১এর পূজার ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ সদলে বুদ্ধগয়া যান।[১] ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, '২৩শে আশ্বিন যাত্রা করিয়া গয়াতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক দলবদলসহ উপস্থিত হইলেন।'[২] 'বুধগয়া' থেকে ২৪শে আশ্বিন রামানন্দকে লেখেন, 'চারুর ছুটি শেষ হইয়াছে কিন্তু এখনো তাহাকে আমি ছুটি দিতে পারিতেছি না। সোমবারে এলাহাবাদে যাইব মঙ্গলবারে পৌঁছিব চারুকে আশ্রয় করিয়া ইণ্ডিয়ান প্রেসের কিছু কাজ সারিবার ইচ্ছা আছে।' অতঃপর ক্ষিতিমোহন সেনের জবানিতে পাই, 'গয়া হইতে রবীন্দ্রনাথ আর সকলকে বিদায় দিয়া চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। চারুবাবু পূর্বে বহুদিন এলাহাবাদেই ছিলেন, তাই তাঁহাকে কবি ছাড়িলেন না।'[৩]

চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'গয়া থেকে রবিবাবু এলাহাবাদ গেলেন। আমাকেও সঙ্গে যেতে হল। আর সবাই শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন।'[৪]

---

১ তু. প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠি : 'কিছুদিন থেকে মনে মনে ভাবছিলুম বুদ্ধগয়ায় যাব এমন সময় হঠাৎ দেখি নগেন মীরারাও সেখানে যাওয়ার আয়োজন করচে তাই একসঙ্গে যাওয়াই ঠিক করেচি...'। চিঠিপত্র ৩ সং ১৩৪৯ পৃ ২০।

২ 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' ১৩৫৯ পৃ ২২-৩০।

৩ চিঠিপত্র ১২ পৃ ৫১।

৪ 'রবিরশ্মি—পশ্চিমভাগে' পৃ ৩৫৭।

প্রয়াগে রবীন্দ্রনাথ উঠেছিলেন জর্জটাউনে এলাহাবাদ হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

চারুচন্দ্রকে লেখা এই পত্রে দেখা যায় ২৩ অক্টোবর ৬ কার্তিক ১৩২১ তারিখে তিনি দিল্লী যান।

'গীতালির প্রুফ ...'॥ '৩ কার্তিক প্রভাতে ' এলাহাবাদে 'গীতালি'র শেষ লেখাটি (এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে) লেখা হয়। ৫ কার্তিকের মধ্যে 'গীতালি'র প্রুফ দেখা শেষ হয়। ৬ কার্তিকে তিনি দিল্লী যাত্রা করেন। এলাহাবাদে ছিলেন ৪১ জর্জটাউনের বাড়িতে। সেখান থেকে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন, কোথায় কখন আছি তার কিছুই স্থিরতা নেই তবু যদি কিছু বলার থাকে এলাহাবাদে সত্যর কেয়ারে চিঠি পাঠালে আমার কাছে কোনোরকমে পৌঁছবে।'[১] 'গীতালি' রচনা সমাপ্তির প্রায় পরে-পরেই প্রকাশ লাভ করে। প্রভাতকুমার নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একখানি বইয়ের তথ্য উদ্‌ধৃত করেছেন, 'কবির অনুরোধমতো প্রেস সাতদিনের মধ্যে বই ছেপে বই প্রকাশ করলে কবি বিস্মিত হয়েছিলেন।'[২]

নয়নচন্দ্র এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের আর্টিস্ট এবং প্রুফশোধক, পণ্ডিতমশাই বলেও পরিচিত। তাঁর বিবরণ মতে 'আন্দাজ দুশো পৃষ্ঠা কবিতার' পুরো বই। কম্পোজ ও কারেক্‌শন সেরে চূড়ান্ত প্রুফ, মায় সূচীপত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল তিনদিনে— তৃতীয় দিনে বেলা ৫টার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ রাতে দেখে পরদিন সকাল ৮টার মধ্যে অর্ডার প্রুফ পাঠিয়ে দেন, বিকেল ৩টেয় বই ছাপা সারা হয়ে কভার ছেপে পাঁচ রকমের পাঁচখানা মলাটে বাঁধাই করে নমুনা বই রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুমোদনার্থ পাঠানো হয়— বারবেলা থাকায় সন্ধ্যা ৭টার পর। সোমবার বেলা ১টার পরে কম্পোজ শুরু হয়েছিল, চার দিনের দিন সন্ধ্যায় বই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়।

---

১ চিঠিপত্র ৫ পৃ ১৯১

২ 'রবীন্দ্রজীবনী' ২, ১৩৯৫ সং পৃ ৪৭৯।

নয়নচন্দ্র স্বয়ং বই নিয়ে গিয়েছিলেন, লিখেছেন, 'বই দেখে— বাঁধাই দেখে চিন্তামণিবাবুর ও ইণ্ডিয়ান প্রেসের সুখ্যাতি শুধু কবির কেন, সেখানকার সকলের মুখে আর ধরে না।' দ্র. 'ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কবি রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়। 'তরুণ রবি' ১৯৬১ পৃ ১৩৩-১৪৬ ।

গীতালি । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১৯১৪ পৃ রয়্যাল ৪+৪+১১৭।

নভেম্বর ১৯১৪য় রামানন্দকে লেখেন, 'গীতালি' পাইয়াছেন?'[১] ২০ জানুয়ারি ১৯১৫র পত্রে জে ডি অ্যাণ্ডার্সন লেখেন, 'Have I written to thank you for your beautifully printed গীতালি ?'[২]

'ইংরিজি তর্জ্জমাগুলো...'॥ মডার্ন রিভিউ ডিসেম্বর ১৯১৪ সংখ্যার পৃ ৫৪৩এ রবীন্দ্রনাথের তিনটি গানের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রথম লেখার গোড়ার দুই ছত্র পৃ ৫৪৩-এর বাঁ পৃষ্ঠায় মুখপাতের ছবির নীচে এইভাবে ছাপা হয়েছিল[৩] :

Thou hast come again to me in the
burst of a sudden storm,
Filling my sky with the shudder of
thy shadowy clouds.

—Rabindranath.

ছবি Babu Asitkumar Haldar-এর আঁকা বহুবর্ণ ছবি, U. Ray & Sons, Calcutta কর্তৃক মুদ্রিত।

১ চিঠিপত্র ১২ পৃ ৫২

২ রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।

৩ তিনটি গানের অপর দুটি গান : ১. I know that the flower one day shall blossom crowning my thorns (*Poems* ৫৩ সংখ্যক পৃ ৭৮) ও ২. I know that at the dim end of some day the sun will send its last look upon me to.

এর আগে ছবির সঙ্গে ছাপবার যোগ্য তর্জমার সূত্রে রামানন্দকে নভেম্বর ১৯১৪য় এই চিঠি লিখেছিলেন

"শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে" গানটি তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু মূলটা নির্মূল হইয়াছে বলিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু বাংলা এবং ইংরেজি উভয়েরই মালিক যখন আমি তখন কোনোপক্ষে নালিশ করিবার কোনো পথ নাই। অসিতের ছবির সঙ্গে এ লেখাটার কোনো বিরোধ হইবে না অতবে সে পক্ষেও ক্ষোভের কারণ দেখি না।[১]

'Thou hast come again ...' রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত Poems (Visva-Bharati 1942)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে, দ্র ১৯৮৬ সং ৫৫ সংখ্যক কবিতা পৃ ৮০ ।

'সবুজপত্রের জন্যে গল্প...'॥ সম্ভবত 'অপরিচিতা' গল্প : সবুজপত্র, কার্তিক ১৩২১ পৃ ৪২১-৪৪৩। পত্র ৫ই কার্তিকে লেখা হলেও, সবুজপত্র কার্তিক সংখ্যা সম্ভবত দেরিতে বেরিয়েছিল, ৩ কার্তিকে লেখা 'গীতালি'র শেষ রচনাটিও ('এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে') 'শেষ প্রণাম' নামে ওই সংখ্যায় গল্পের পরে পৃ ৪৪৫এ মুদ্রিত হয়।

পত্র ৬০। 'নৌকাডবি'॥ 'নৌকাডুবি' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ : মজুমদার লাইব্রেরি, ভাদ্র ১৩১৩। বসুমতী ২ সেপ্টেম্বর ১৯১৬।

'নৌকাডবি' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

'নৌকাডুবি' । প্রকাশক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮ জুন ১৯১০ পৃ ক্রাউন১/১৬, ২+৩৬৮ মূল্য এক টাকা চার আনা।

এর পর তৃতীয় সংস্করণ বেরোয় বসুমতী থেকে :

---

১ চিঠিপত্র ১২ পৃ ৫২

'নৌকাডুবি'। প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বসুমতী অফিস ১৩২০ পৃ ২+৪০৪+২ মূল্য দুই টাকা।

এই পত্রে তৃতীয় সংস্করণের বইখানিই হয়তো রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন, মনে করা যায়।

পত্র ৬১। 'স্রোতের ফুল'।। চারুচন্দ্র স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া একটি প্লট তাঁর "স্রোতের ফুল" উপন্যাসের ভিত্তি। দ্র এই বই পৃ ২২২।

'স্রোতের ফুল' ভারতী বৈশাখ ১৩২১ থেকে পৌষ ১৩২২ পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ভারতী, চৈত্র ১৩২২ পৃ ১২১১-১২১৪য় সমালোচিত।

গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩২২। আমরা বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণটি লক্ষ্য করতে পেরেছি :

'স্রোতের ফুল'। প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকার। রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা ১৩২৬ পৃ ৪+৩৮১

উৎসর্গ : 'যাঁহার নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার তুলনা / বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে নাই, / যাঁহার স্নেহ লাভ করা / আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য, / সেই জগন্মান্য কবিবর / শ্রীযক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের / শ্রীচরণকমলে / ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য / স্রোতের ফুল / উৎসর্গ করিলাম।'

গ্রন্থপ্রারম্ভে উল্লিখিত হয়েছে : 'এই উপন্যাস রচনায় পূজনীয় কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকর মহাশয়ের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলাম। চারু।'[১]

'ভূপেনবাবু বা বিধুশেখর শাস্ত্রী...'॥ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক।

---

১ 'বহতা হুয়া ফুল' নামে লখনউ থেকে 'স্রোতের ফুলে'র হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক মাধুরী সম্পাদক রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় কবিরত্ন।

পত্র ৬২। 'শান্তিনিকেতন' গান॥ 'আমাদের শান্তিনিকেতন সে যে সব হতে আপন...' ইত্যাদি, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে 'শারদোৎসব' নাটকাভিনয়ের অনুষ্ঠানপত্রীতে প্রথম প্রকাশ ৬ আশ্বিন ১৩১৮।[১] আগের 'মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ' গানের পরিবর্তে অতঃপর এই 'শান্তিনিকেতন' গানটি আশ্রমসংগীতরূপে প্রচলিত হয়। 'শান্তিনিকেতন' গানের তর্জমা Santiniketan তিন স্তবক দশ ছত্রে 'Oh, The Santiniketan, the darling of our hearts...' ইত্যাদি, প্রকাশ The Modern Review, February 1915 p 137. গানের নীচে এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা হয় :

Note. This song is sung in chorus in Bengali by the boys of the Santiniketan school.

ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন প্রকাশিত Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore (১৯৩৬) সংস্করণের অন্তর্গত The Fugitive and Other Poemsএর শেষ কবিতা রূপে গৃহীত পৃ ৪৫৭-৪৫৮।

পত্র ৬৩। 'দুটো নতুন কবিতা'॥ 'মুক্তি' (যখন আমায় হাতে ধরে) রচনা শিলাইদহ ১৯ মাঘ ১৩২১, প্রকাশ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২১ পৃ ৫৮৫। 'প্রেমের বিকাশ' (জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও) রচনা

---

১ সীতা দেবী : 'পুণ্যস্মৃতি', ১৩৪৯ পৃ ৬৭। যেভাবে সমস্বরে এই গান গেয়ে ছেলেরা অভ্যাগতদের ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলেন তাতে গানটির রচনা ও প্রচলন আরো কিছুদিন আগের বলে মনে হয়।

কালীপদ রায় লিখেছেন, 'মোরা সত্যের পরে মন এই গানটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যেই লিখে তাতে সুর দিয়ে আশ্রমবাসী সকলকে শিখিয়েছিলেন। এই গানটি ১৯১১ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আশ্রমসঙ্গীত হিসেবে উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিতে গাওয়া হত। ১৯১১ সালে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি লেখা হয়। তখন থেকেই এই গান আশ্রমবিদ্যালয়ের আশ্রমসঙ্গীত রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।'— 'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ', ১৩৮৮, পৃ ১২

পদ্মাতীর ২৭ মাঘ ১৩২১, প্রকাশ প্রবাসী, চৈত্র ১৩২১ পৃ ৬০১ ।

যথাক্রমে 'বলাকা' (১৩২৩) কাব্যের ২২ ও ৩৩ সংখ্যক কবিতা।

ভবসিন্ধুবাবুর লেখা দেবেন্দ্রজীবনী ।। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত'। শ্রীভবসিন্ধু দত্ত প্রণীত। ২১১ নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মাঘ ১৩২১ পৃ ৪+৪+৩+৪১২ মূল্য ১৸০। ভূমিকা শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

ভবসিন্ধু দত্ত সিটি কলেজের শিক্ষক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সিটি কলেজের পুরাতন ছাত্র ও বন্ধু। শান্তা দেবী জানিয়েছেন; সমাজপাড়ার বলিতে প্রবাসী অফিসের ২১০।৩।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িটি তিনিই রামানন্দকে ঠিক করে দিয়েছিলেন।[১]

'গ্রন্থকারে নিবেদন' স্থলে ভবসিন্ধু দত্ত লেখেন, 'এই পুস্তক প্রণয়নে পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এ প্রকার সাহায্য না পাইলে আমি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিতে পারিতাম না । তৎপরে পরলোকগত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, নবতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী এবং Modern Review পত্রিকাদ্বয়ের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং স্নেহাস্পদ শ্রীমান চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুদিগের নিকট হইতে অনেক প্রকারে সহায়তা লাভ করিয়াছি ।'

বইয়ের ৪৮তম অধ্যায়ে (পৃ ৩৯৩-৪০৩) লেখক আপন পরিবারে দেবেন্দ্রনাথের কতখানি প্রভাব ছিল তার বর্ণনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই পুত্রকন্যাদের উপর পিতার প্রভাব বর্ণনা করবার পর লেখক লিখেছেন, 'পরিবারে তাঁহার কি প্রকার প্রভাব ছিল, তাহা চিন্তা করিলে অতি আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি যতদিন

পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কেহ কোন কাজ করিতে পারিত না। সকল বিষয়ে তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া সকলকে কাজ করিতে হইত। যখন রবীন্দ্রনাথের উপর বিষয়সম্পত্তি পরিদর্শন করিবার ভার অর্পিত হয়, তখন একদিন রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন বাটীর বহির্দ্দেশে একটি জীর্ণ প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহা সংস্কার করিয়া নিজের ঘর করিয়া লয়েন। এইজন্য তিনি তাহা রীতিমত সংস্কার করিয়া সুন্দরভাবে ঘরটি প্রস্তুত করাইয়া লইলেন এবং সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। তখন মহর্ষি কলিকাতায় ছিলেন না। তিনি আসিয়া দেখিলেন পুরাতন ঘর আর নাই, তাহার স্থানে এক নূতন ঘর দণ্ডায়মান। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকিলেন। বঙ্গের ভবিষ্যৎ কবিসম্রাট বলির ছাগের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বলিলেন, "এই ঘরে আমার পিতা বসিতেন এবং তাঁহার ঘর তুমি কাহার আদেশে ভগ্ন করিয়া এইরূপ নূতন করিলে? আমার পিতার ঘরের উপর তোমার কোন অধিকার নাই। যে সমস্ত পুরাতন জানালা বা কপাট চৌকাট ছিল, তাহা তুমি এখনি লইয়া যথাস্থানে বসাও, এবং ঘরটি ঠিক্ যেমন ছিল তেমনি করিয়া দাও। তোমার একটি বসিবার ঘরের প্রয়োজন ছিল আমাকে পূর্বে বলিলে আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতাম। তোমার এখন বেশী লোকজনের সহিত পরিচয় হইয়াছে, অনেক লোক তোমার নিকটে আসেন, সুতরাং তোমার একটি ঘরের প্রয়োজন হইয়াছে। একথা আমি বুঝিতে পারি নাই। এই ত্রিশহাজার টাকা লও এবং নিজের মনোমত ঘর প্রস্তুত করাইয়া লও, কিন্তু আমার পিতার ঘরটি ঠিক্ যেরূপ ছিল, সেইরূপই করিয়া দাও।" বলা বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বিলম্ব করিলেন না।'

অতঃপর ভবসিন্ধু পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হিমালয়ভ্রমণের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, 'প্রাতঃকালে ভ্রমণের সময়ে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেন। তাঁহার নিকট কিছু টাকা গচ্ছিত রাখিয়া পথে দরিদ্রদিগকে দান করিতে আদেশ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাহার বিশেষ কিছু হিসাব

রাখিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ ভ্রমণের সময়ে সামান্য দানের হিসাব কে বা রাখিতে পারে! কিন্তু মহর্ষি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না! বাড়ী ফিরিয়া প্রত্যেক পয়সার হিসাব দিতে হইত। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের যে কি-প্রকার আনন্দ হইত পাঠক তাহা বুঝিতে পারিতেছেন! দেবেন্দ্রনাথ যে পয়সার মমতা করিয়া তাঁহার নিকট এইরূপ হিসাব লইতেন তাহা নয়, কিন্তু অল্পবয়স হইতে যাহাতে তাঁহার পুত্র শৃঙ্খলা ও নিয়মের বাধ্য হইয়া কাজ করিতে শিক্ষা করেন ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।'

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২১ সংখ্যায় অমৃতলাল গুপ্ত ভবসিন্ধু দত্তের বইখানির সপ্রশংস আলোচনা করে লিখেছিলেন, 'গ্রন্থকার বর্তমান যুগের এই ঋষির জীবনচরিত প্রকাশিত করিয়া নিজেও ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদিগকেও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।... সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই এই পুস্তকের সমাদর হওয়া উচিত।' দ্র 'পুস্তক পরিচয়' পৃ ৫৯২-৫৯৩। আলোচনাটির শেষে এই 'সম্পাদকীয় মন্তব্য' ছাপা হয়: 'ভবসিন্ধুবাবু মহর্ষিদেবের যে জীবনী লিখিয়াছেন, তার মধ্যে একটি গল্প আছে যে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো ঘর ভাঙচুর করাতে মহর্ষিদেব প্রথমে রবিবাবুকে ভর্ৎসনা করেন এবং পরে তাঁহার কৃতকর্ম পুনরায় পূর্ববৎ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বাস করিবার জন্য একটি নূতন বাড়ি দেন। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে রবিবাবুর নূতন বাড়ীর ভিত্তি এই ঘটনার ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তাহার প্রধান কারণ রবিবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো কিছুই ভাঙেন নাই; যা-কিছু ক্ষণ-ভঙ্গুর তা তিনি নিজেই একরকম ভাঙিয়া শেষ করিয়া গিয়াছিলেন, উত্তরবংশীয়ের জন্য অপেক্ষা করেন নাই। অতএব গল্পটির মধ্যে এইটুকুই সত্য যে মহর্ষিদেব রবিবাবুকে বাসের জন্য একটা নূতন বাড়ী দিয়াছিলেন।' প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২১ পৃ ৫৯৩।

প্রসঙ্গত ভবসিন্ধু দত্তের বইখানি অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৩২৩) গ্রন্থের পূর্ববর্তী। এরও আগে 'শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের "ভারতগৌরব গ্রন্থাবলী" পর্যায়ের জন্য... বালক বালিকাদিগের উপযোগী করিয়া [দেবেন্দ্রনাথের] একখানি ছোট জীবনী' তিনি রচনা করে দিয়েছিলেন।

পত্র ৬৪। 'চারটি গান পাঠাই ...' ।। চারটি গানের দুটি ১৩২২এর প্রবাসী, কার্তিক সংখ্যায়, বাকি দুটি অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শিরোনাম সহ প্রকাশিত হয়

'পথভোলা' (কোন ক্ষাপা শ্রাবণ ছুটে এল/ আশ্বিনেরি আঙিনায়) প্রবাসী, কার্তিক ১৩২২ পৃ ১

'ডাক' (তোমার নয়ন আমায় বারে বারে) প্রবাসী, কার্তিক ১৩২২ পৃ ১

'নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা' (আমার নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা) প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২২ পৃ ১২৯

'রাতে ও সকালে' (কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে) প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২২ পৃ ১২৯

প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ গান স্বরলিপি সহ 'গীতপঞ্চাশিকা'য় (আশ্বিন ১৩২৫) নিম্নক্রমে সংকলিত :

'কোন ক্ষ্যাপা শ্রাবণ' ১২ সংখ্যক গান পৃ ৮, স্বরলিপি পৃ ৫৪-৫৭

'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা' ৬ সংখ্যক গান পৃ ৪, স্বরলিপি পৃ ৩৮-৪০

'কাল রাতের বেলায় . . .' ৩ সংখ্যক গান পৃ ২, স্বরলিপি পৃ ৫৪-৫৭

সত্যেন্দ্র দত্তের তর্জমা।। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ফুলের ফসল' (১৩১৮) কাব্যের 'তোড়া' ও 'চম্পা' এই কবিতাদুটির তর্জমা মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত হয়, অনুবাদকের নাম ছিল না।

A posy, translated by a Poet from The original Bengali of Satyendranath Dutt in ফুলের ফসল or Harvest of

Flowers. *The Modern Review*. Nov. 1915 p 560. Champa, translated by a Poet from the original Bengali of Satyendranath Dutt in ফুলের ফসল or Harvest of Flowers. *The Modern Review*. November 1915 p 561.

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই তর্জমাদুটির সূত্রে ৭ অক্টোবর ১৯১৫র পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'ঠিক ঠাওরাইয়াছেন, অনুবাদক আমি ; কিন্তু ঢাক-বাদকের হাতে সে কথাটা সমর্পণ করিবেন না। আর কিছুই নয় এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারে শান লাগিয়া ঈর্ষ্যার মুখ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে সত্যেন্দ্রের পক্ষেও ভালো হইবে না, আমার পথও কণ্টকিত হইবে । তা ছাড়া কর্ম্মবন্ধনের আর একটা পাক বাড়িবে— অনেক বন্ধু এবং অবন্ধু আমার কাছ হইতে অনুবাদ সরবে ও নীরবে দাবী করিবেন— সে দাবী পূর্ণ না হইলেই বন্ধুর তটে শিকস্তি হইয়া অবন্ধুর তটে পয়স্তি হইতে থাকিবে। এমনি করিয়া জীবনের ভার কেবল বৃথা বাড়িয়া চলে। শরশয্যায় ত এতদিন কাটিল, একটুখানি অবসরশয্যার সন্ধানে আছি— জুটিবে কিনা জানি না কিন্তু শরসংখ্যা আর বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না।'— চিঠিপত্র ১২, পত্র ৪৬

প্রসঙ্গত দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ মডার্ন রিভিউ পত্রে প্রকাশ করেছিলেন ।

A Posy ও Champa দুটি কবিতাই বহুল পরিবর্তিত রূপে রবীন্দ্রনাথের *Lover's Gift and Crossing* কাব্যে যথাক্রমে ৩১ ও ৫৩ সংখ্যক কবিতারূপে গৃহীত হয় ।

পত্র ৬৫। 'শিক্ষার বাহন'।। ১০ ডিসেম্বর ১৯১৫ রামমোহন লাইব্রেরি হলে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করার' বাহন হিসেবে এই প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার জন্য সওয়াল করেছিলেন : 'মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতে হইবে?... তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না?'

'শিক্ষার বাহন' প্রকাশ : সবুজপত্র, পৌষ ১৩২২ পৃ. ৫২৯-৫৫৫। 'পরিচয়' (১৯১৬) গ্রন্থে সংকলিত পৃ ১০৬-১২৮।[১] পরে 'শিক্ষা' গ্রন্থে সংকলিত।

'দেবেন্দ্র সেনের তর্জ্জমা...'।। দেবেন্দ্রনাথ সেনের তিনটি কবিতার তর্জমা রবীন্দ্রনাথ মডার্ন রিভিউ পত্রে প্রকাশ করেন

The Maiden's Smile

My Offence (Translated from The Bengali poem of Devendranath Sen by Rabindranath Tagore.)

—*The Modern Review*, March 1916 p 345.

The Unnamed Child (translated from the Bengali of Devandranath Sen) by Sir Rabindranath Tagore

—*The Modern Review*. May 1916 p 498.

এর প্রথম কবিতাটি (প্রথম ছত্র : Methinks. my love, before the daybreak...) *Lover's Gift and Crossing* (1918) কাব্যে বহু পরিবর্তিত হয়ে ২১ সংখ্যক কবিতারূপে সংকলিত হয়।

পত্র ৬৬। 'Sister Nivedita-র 'কাবুলিওয়ালা' এবং ...' যদুবাবুর 'ঘাটের কথা'।। গল্পদুটি নিম্নক্রমে ১৯১২র মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত হয়েছিল :

The Cabuliwallah. translated by Sister Nivedita. January 1912 pp 50-56 The River Stairs. translated by Jadunath Sarkar. October 1912 pp 340-345. 'কাবুলিওয়ালা' *Hungry Stones and Other Stories* এবং 'ঘাটের কথা' *Mashi and Other Stories* বইয়ে সংকলিত হয়। মডার্ন রিভিউয়ে

---

১ দ্র. দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠি ৭ ও ৪৩। অগ্রহায়ণ, ১৩২৫, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫, চিঠিপত্র ১০। 'Vernaculary for the M.A. Degree', *The Modern Review*, November 1918 pp 462-463.

'কাবুলিওয়ালা'র অনুবাদের সঙ্গে নন্দলাল বসুর আঁকা কাবুলিওয়ালার ছবি মুদ্রিত হয়েছিল।

'অহল্যা'।। নেশন কাগজে 'অহল্যা'-র অনুবাদ আমরা সন্ধান করতে পারি নি। তবে ১৫ ডিসেম্বর ১৯১২-র পত্রের সঙ্গে অনুবাদটি তিনি রোটেনস্টাইনকে পাঠিয়েছিলেন এবং The Nation-এর সম্পাদক ম্যাসিংহাম রোটেনস্টাইনকে বলেছিলেন : 'I propose that every fortnight Mr. Tagore, if he is willing, should write us a poem...' দ্র Lago, Imperfect Encounter ২৭৫, ১১২-১১৩। মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশ : Ahalya, translated by Rabindra Nath Tagore. The Modern Review, February 1916 p 175. পরে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত Poems (১৯৪২)-এ অন্তর্ভুক্ত, ১৯৮৬ সং ৭ সংখ্যক কবিতা ('Struck with the curse in midwave of your tumultuous passion ...') ইত্যাদি। পত্রিকায় কবিতার আগে এই ভূমিকা ছিল, গ্রন্থে বর্জিত :

(Ahalya, sinning against the married love, incurred her husband's curse, turning into a store to be restored to her humanity by the touch of Ramchandra.)

অনুবাদের প্রশংসা করে এডোয়ার্ড টমসনের পত্র আমরা দেখি নি, সাক্ষাতে মৌখিক প্রশংসা করা সম্ভব। তবে টমসন কবিতাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং অনুবাদ কবিতার পক্ষে হানিকর হয়েছে, বইয়ে এমন মন্তব্য করেছেন। টমসন লিখেছেন, 'The greatest poem in Mānasī is Ahalyā: I do not think he ever wrote a greater, at this or at any time.' অতঃপর লিখেছেন :

He has published a mutilated paraphrase in English (n. in a magazine only), on which it can never take its place

among the world's masterpieces.

Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist. Oxford 1926 pp 75-76.

পরবর্তী সংস্করণে, ঈষৎ সংস্কারের পর পূর্ণ বয়ানটি এইরকম :

He published a mutilated paraphrase in English. The poem is extraordinarily subtle— profound philosophical thought burns like a slow fire in the steady, brooding lines. It is full of guesses, some of which science has already proved true, and others of which it may prove true hereafter : Rabindranath's 'interpenetrative power' attains its greatest triumph.

Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist. Oxford 1926 pp 67-68.

'interpenetrative power' শব্দবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ব্যবহার, দ্র. New Essays in Criticism 1903.

'বাঁকুড়ার Thompson...' ॥ এডোয়ার্ড টমসন ১৮৮৬-১৯৪৬। টমসন বাঁকুড়া ওয়েস্‌লিয়ান কলেজের (বর্তমান বাঁকড়া ক্রিশ্চান কলেজ) ইংরেজির অধ্যাপক (১৯১০-১৯২২) রূপে কাজ করবার পর অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলো ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন।

টমসনের Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph.D. ডিগ্রি পাওয়া বই। এর পূর্বে Rabindranath Tagore : His Life and Work নামে দি হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া সিরিজে একখানি বই তিনি লিখেছিলেন, ১৯২১ পৃ ১৬+৯৬ Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist লেখার পর টমসন বইয়ের জন্য ইয়েট্‌সের একটি ভূমিকা প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছিলেন, নানা

কারণে চিঠিখানি উল্লেখযোগ্য বলে তার প্রাসঙ্গিক দু-এক অংশ উদ্ধৃত করছি :

পত্র ৬৭। 'জীবনস্মৃতির তর্জমাওয়ালা Modern Review'॥ একই প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'চারুকে ইতিপূর্বে লিখিয়া দিয়াছি যতদিন Modern Reviewতে জীবনস্মৃতির অনুবাদ বাহির হইবে Yeatsকে একখণ্ড ও Rhysকে একখণ্ড করিয়া পাঠাইতে। আপনিও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। ইতি ১৫ চৈত্র ১৩২২'।

'জীবনস্মৃতি'র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত অনুবাদ My Reminisences মডার্ন রিভিউয়ের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ১৯১৬ বারো সংখ্যায় অনুবাদকের বিবিধ টীকা এবং গগনেন্দ্রনাথের চিত্রসমূহসহ প্রকাশিত হয়। My Reminiscences by Rabindranath Tagore, translated by Surendranath Tagore. The Modern Review, January 1916 1-8, February 1916 pp 137-142, March 1916 pp 285-290, April 1916 pp 361-367, May 1916 pp 475-480, June 1916 pp 583-589, July 1916 pp. August 1916 pp, September 1916 pp. Obtober 1916 pp, November 1916 pp. December 1916 pp. My Reminiscences ১৯১৭য় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থবিবরণ : My Reminiscences By Sir Rabindranath Tagore, with illustrations, Macmillan and Co., Limited. St. Martin's Street, London. 1917. pp. 11+272

বইয়ের তেরোটি চিত্রের প্রথমটি শশিকুমার হেশের আঁকা রবীন্দ্রনাথের রঙিন পোর্ট্রেট, অপরগুলি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি।

অনুবাদকের ভূমিকায় লেখা হয়েছে

The lightness of manner and importance of matter form a combination, the translation of which into a different

language is naturally a matter of considerable difficulty. It was, in any case, a task which the present translator not being an original writer in the English language, would hardly have ventured to undertake, had there not been other considerations.

The translator, moreover, had the author's permission and advice to make a free translation, a portion of which was completed and approved by the latter before he left India on his recent tour to Japan and America...
প্রসঙ্গত ৩ মে ১৯১৬য় রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে জাপানের পথে আমেরিকা যাত্রা করেন। বইয়ের বিবিধ টীকা, অনুবাদকের সংযোজন, সেই সূত্রে অনুবাদক ভূমিকায় আরো লেখেন
All the footnotes here given have been added by the translator in the hope that they may be of further assistance to the foreign reader.

পত্র ৬৮ । 'সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ'॥ 'ফাল্গুনী (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)'। 'ফাল্গুনী' প্রথম প্রকাশ : সবুজপত্র, চৈত্র ১৩২১, পৃ অ- ই +৮০৭ -৮৬৩। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রবন্ধটি ... চৈত্রেই যেন বাহির হয়।' বেরিয়েছিল, দ্র প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২ পৃ ৫৯১-৫৯৭। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'রবি-দীপিতা'র দ্বিতীয় প্রবন্ধরূপে সংকলিত। পৃ ২১-৩৯। পূর্ব মাসেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত -কৃত 'ফাল্গুনী' আলোচনা বেরিয়েছিল ভারতীতে, দ্র ভারতী ফাল্গুন ১৩২২।

৫ই মাঘ ১৩২২এর পত্রে সুরেন্দ্রনাথকে 'ফাল্গুনী'র মর্মকথা ব্যাখ্যা চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এই :

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি অতি সরল । সে হচ্ছে এই যে— জীবনটা অমর বলেই তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারে বারে নবীন করে নিতে হয়।

পৃথিবীতে জরাটা হচ্ছে পিছনের দিক। ওর সামনের দিকটা যৌবন। এই জন্যে জগতে চারি দিকে যৌবনটাকেই দেখচি, জরাটা চলে চলে যাচ্চে। তাকে এই দেখচি, তার পরক্ষণেই দেখচি নে। যেই শীতে সমস্ত ঝরে পড়ল অমনি দেখলুম শীত নেই ; বসন্ত এসে সমস্ত পূর্ণ করে বসেচে। তার থেকেই বুঝতে পারি আমাদের জরা নবতর যৌবনের বাহন। পুরাতন আপনাকেই পুনঃ পুনঃ করে পেতে চায়। এই জন্যে সে নিজেকে পুনঃ পুনঃ হারায়— হারিয়ে পাওয়ার মধ্য দিয়ে সে যদি না চলে তাহলে পুরাতন আর নূতন হয় না— আমাদের নূতনটাকে উপলব্ধি করতে হবে বলেই আমরা মরি। ফাল্গুনীতে গীতিনাট্যাংশটুকু হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে নানা ঋতুর তোরণদ্বার দিয়ে একই পুরাতনের নবীন হওয়ার লীলা। আর তারই সঙ্গে যে নাট্যটুকু আছে তার মধ্যে মানুষের যৌবন জরার অনুসরণ করতে গিয়ে কেমন করে মৃত্যুগুহার ভিতর দিয়ে নবজীবনে উত্তীর্ণ হয় সে বর্ণনা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে লীলা শীত বসন্তে, মানব প্রকৃতিতে সেই লীলা জরা-যৌবনে, জন্ম-মৃত্যুতে । এই কথাটাকেই গীতে এবং নাট্যে ফাল্গুনীতে প্রকাশ হয়েছে ।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা সংকলিত পত্র পাওয়ার পরেই সুরেন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' সম্বন্ধে তাঁর লেখাটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। চারুচন্দ্রের চিঠিতে উদ্‌ধৃত করে দেওয়া সুরেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রখানিও ৬ই ফাল্গুন ১৩২২ তারিখে লেখা উদ্‌ধৃতাংশের আগে এই পত্রসূচনা ছিল :

শিলাইদহ
নদীয়া

প্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন,

ফাল্গুনীর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেচেন সেটি আমার তো ভালো লেগেচে। আমি ফাল্গুনীর রচয়িতা বলেই যে এমনটি ঘটল তা বোধ হয়

না— কারও এতদিন ধরে লিখে আসচি যে, আমি যে লেখক এ কথাটা ভোলবার সময় হয়েচে।

প্রবাসীতে যাতে লেখাটি বেরয় সেজন্য আমি এবার বিশেষভাবে তাগিদ করব। সম্পাদকের উপর মোড়লি করতে আমি কখনো সাহস করিনে— বিশেষত যে লেখা আমার নিজের সম্বন্ধে তা নিয়ে। কিন্তু এবার আমি বিনা সঙ্কোচে একটু জোরের সঙ্গেই হাঁক ডাক করে দেখব। . . .

আগের ৫ইমাঘ ১৩২২এর পত্রখানি এবং ৬ই ফাল্গুনের এই পূর্ণ পত্রখানি মৈত্রেয়ী দেবীর 'স্বর্গের কাছাকাছি' বইয়ে মুদ্রিত হয়েছে।[১]

'ফাল্গুনী'র আলোচনায় সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নাটকখানিকে পুরাতন 'ছলিক নাটক' নামে একরকম গীতাভিনয়ের সগোত্র বলে নির্ণয় করেছেন যেখানে 'অভিনেতা আপন মনের কোনো গূঢ় অভিপ্রায়' নাচে গানে অভিনয়ে প্রকাশ করত, যে নাটকে 'পাত্রপাত্রীর চরিত্রসমাবেশের বাহুল্য স্থান পেত না।' এই নাটকের গূঢ় মর্ম কী ? সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

সমস্ত ফাল্গুনীটার হাওয়া থেকে এই সুরটা বেজেছে যে, জগতের ভিতরকার কথাটি যদি কেউ জানতে চায় তো সে কেবলমাত্র খেলার সঙ্গে যোগ দিয়েই জানতে পারে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কোনও তত্ত্বচিন্তার কূটজালে প্রবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই, কোনও দার্শনিক কল্পনার মাপকাঠি ব্যবহার করতে চেষ্টা কোরো না, শুধু জগতের মধ্যে নানাপরিবর্তনের ভিতর যে একটি আনন্দলীলা চলেছে, বাউলের মতন সর্বাঙ্গ দিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে স্পর্শ কর; পুঁথির চোখটাকে, তর্কের চোখটাকে একেবারে কাণা করে দাও; সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বকে আলিঙ্গন কর, তাহলেই দেখতে পাবে যে

---

১ 'স্বর্গের কাছাকাছি' ১৩৮৮ পৃ ২৬ ও পৃ ২৮-২৯ ।

প্রসঙ্গত সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত ১৩১৫ সাল থেকে । সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'নিবেদন' (১৩১৮) কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ লিপি : 'হে রবি হে কবিবর ! লহ নমস্কার।'

অন্তরে বাহিরে দুই যন্ত্রে একই সংগীত উঠছে ; সেই সংগীত যতই তোমার মনকে স্পর্শ করবে ততই তোমার বিশ্বখেলায় যোগদান করা সার্থক হবে। ইতিপূর্বে কোনও কবি জগতের রহস্যটিকে ধরবার এমন সুন্দর উপায় এত পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করেছেন বলে আমি জানি না।

'গোটা দুয়েক কবিতা . . .' ।। 'খোলা জানলায়' (আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে)। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২ পৃ ৫৩৩। 'মাধবী' (কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে)। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২ পৃ ৬১৪। যথাক্রমে 'বলাকা'র ৩৪ ও ১৪ সংখ্যক কবিতা।

পত্র ৭০। 'আমেরিকায় Lynching...'॥ অব্যবহিত পূর্বাহ্নের পেনসিলভেনিয়া কোট্‌সভিলের এক নিগ্রোনিধন এবং তার বর্ষকাল পরে জন জে চ্যাপম্যান -কর্তৃক তার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের কথা ১৯১২য় রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা-বাসকালে জানিয়েছিলেন রোটেনস্টাইন। নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

'চির-আমি'। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৪।

পত্র ৭১। 'পোলিটিক্যাল প্রবন্ধ ...'॥ At the Cross Roads. by Sir Rabindranath Tagore. মডার্ন রিভিউ। জুলাই ১৯১৮ পৃ ১-৪।

আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪), নোবেল পুরস্কার ১৯২১। The White Store : Sur La pierre blanche (১৯০৫)-এর অনুবাদ। মডার্ন রিভিউ, জুলাই ১৯১৮য় Gleanings স্তম্ভে আনাতোল ফ্রাঁসের এই বই থেকে উদ্‌ধৃতি ছাপা হয়, পৃ ৪০- ৪২, প্রাসঙ্গিক অংশ :

The discovery of the West Indies, the Exploration of Africa, the nevigation of the Pacific Ocean, opened up vast territories to European avidity. The white kingdoms joined issue over the extermination of the red, yellow

and black races. and for the space of four centuries gave themselves up madly to the pillaging of three divisions of the world. That is what is styled modern civilisation.– The White Store. by Anatole France p 152.

পত্র ৭২। 'আমার সেই বালিকা-বন্ধুটি . . .'॥ কাশীর অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর তৃতীয়া কন্যা রাণু অধিকারী (পরে মুখোপাধ্যায়)। ২রা বৈশাখ ১৩২৫-এর চিঠিতে দেখা যায় তাঁর 'কাশীর নিমন্ত্রণ' ভানুদাদা গ্রহণ করতে পারেন নি 'বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার স্থির থাকায়।'[১] তার বদলে ২রা জ্যৈষ্ঠ বড়ো মেয়ে মাধুরীলতার মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে ফিরে তিনি 'শান্তিনিকেতনে চারি মাস একযোগে কাটাইয়া দিলেন' বলে প্রভাতকুমার উল্লেখ করেছেন।[২]

ছাপাখানা॥ বৃহস্পতিবার ২০ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ (৬.১২.১৯৯৭)এর চিঠিতে শান্তিনিকেতন থেকে যদুনাথ সরকারকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : আমেরিকার Lincoln সহর আমাদের বিদ্যালয়কে একটি ভাল ছাপাখানা উপহার দিয়াছেন। চালাই কি করিয়া? আর কিছু নয় ছেলেদের শিক্ষা ও আমোদ হয় অথচ আমাদের খরচ উঠিয়া যায় এমন উপায় কিছু বলিতে পারেন? চিন্তামণিবাবুকে বলিয়াছিলাম এই প্রেসকে তিনি তাঁর ব্যবসায়ের অন্তর্গত করিয়া লন তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই। তিনি পারিয়া উঠিবেন না লিখিয়াছেন। এখানে এমন তৈরি ছাপাখানা এবং বিনা ভাড়ায় ঘর লইয়া কি কোনো ব্যবসায়ী ইহার ভার লইতে পারেন না? আপনি কাহাকেও জানেন? হরিদাসবাবু কি এ প্রস্তাবে রাজি হইবেন? ইস্কুল মাষ্টারের হাতে এ-সব জিনিষ দিতে ভয় হয়— দুদিন বাদে ইহার অক্ষরে এবং ভগ্নাংশে বোলপুরের প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া যাইবে— অবশেষে ভাবী যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক দল ইহার

১ 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', ৫ সংখ্যক পত্র ১৩৬৯ সং পৃ ১৫-১৬ ।

২ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৯৫ সং পৃ ৬১৬ ।

ইতিহাস লইয়া ভয়ঙ্কর দলাদলি বাধাইয়া দিবে। অতএব একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

পুনশ্চ।

এই ছাপাখানায় বিশ্বগ্রন্থপ্রকাশ ছাপাইবার ব্যবস্থা করা যায় না কি ?[১]

ছাপাখানাটি নিয়ে সরকারি বিধিনিষেধের মুখে পড়তে হয়েছিল। কলকাতা থেকে ৬ মার্চ ১৯১৮র পত্রে পিয়ার্সনকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

... The printing press is still rusting in Shantiniketan. I have not yet received permission to use it. I shall wait a few more weeks and then I shall ask the good citizens of Lincoln, who made a present of it to my school, to take it back. Each one of us in this unfortunate country is looked upon with suspicion— and our authorities cannot see us clearly through the dust which they themselves raise ...

আলোচ্য চিঠিতে লক্ষ্য করা যায় আর তিন মাসের মধ্যেই সরকারি বাধা অতিক্রম করা গিয়েছিল।

সুকমারের ভাই, উপেন্দ্রকিশোরের মেজো ছেলে সুবিনয় রায়, কলকাতার প্রসিদ্ধ ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স ছাপাখানার মুখ্য দায়িত্ব ছিল যাঁর উপরে।

বৈশাখ ১৩২৬এ এই প্রেস থেকে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের জন্য মাসিক পত্র 'শান্তিনিকেতন'-এর প্রথম সংখ্যা ছেপে

---

১ যদুনাথ সরকার এই টীকা করেছেন : 'গুরুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সন্সএর স্বত্বাধিকারী হরিদাসবাবুকে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে"র সিরিজ তাঁহাদের আট আনা সংস্করণের মতন প্রকাশ করিতে সম্মত করি, এবং আমার আলোচনার ফল কবিকে জানাই ... চিন্তামণিবাবু এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা।' দ্র. প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২ পৃ ৩৯৬।

বেরোয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যার 'আশ্রম সংবাদ' স্তম্ভে এই বিজ্ঞপ্তি ছিল :

গুরুদেবের আমেরিকাবাসকালে Lincoln সহরের অধিবাসীগণ আশ্রমের বালকদিগের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। ইহাতে আশ্রমের যাবতীয় ছাপার কাজ ও গুরুদেবের সংগীতপুস্তকাদি ছাপা হইতেছে।

—'সংবাদ'। শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নূতন গানের বহি শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথের স্বরলিপিসহ আমাদের ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত হইয়াছে— গীতপঞ্চাশিকা, গীতবীথিকা ও বৈতালিক। বৈতালিক কতকগুলি পুরানো বাছা বাছা গানের সংগ্রহ, ইহাও স্বরলিপি সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে 'জাপানযাত্রী' বলিয়া একখানি বই ছাপা হইতেছে।

—'সংবাদ'। শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩২৬

অগ্রহায়ণের 'সংবাদে' দেখা যায় ছাপাখানায় আরো একটি মেশিন প্রেসের সংযোজন ঘটেছে, 'তাহাতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী ছাপানো আরম্ভ হইবে।'

প্রসঙ্গত , এই সময়ে ছাপাখানার মুদ্রাকররূপে ছিলেন জগদানন্দ রায়। 'গীতপঞ্চাশিকা', 'বৈতালিক', 'গীতবীথিকা' ও 'জাপানযাত্রী'র প্রকাশ তারিখ যথাক্রমে আশ্বিন ১৩২৫, চৈত্র ১৩২৫, বৈশাখ ১৩২৬ ও শ্রাবণ ১৩২৬।

পত্র ৭৩। "কালো মেয়ে"॥ সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩২৫ পৃ ১৬২-১৬৫।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৫ পৃ ৪১৬-৪১৭য় কষ্টিপাথর বিভাগে সংশোধিত রূপে উদ্‌ধৃত। 'পলাতকা' (অক্টোবর ১৯১৮) কাব্যে সংকলিত।

'ইস্কুলমাষ্টারি কাজে ব্যস্ত আছি'॥ দ্র. পত্র ৭৪এর টীকা ।

পত্র ৭৪। *Lover's Gift*॥ *Lover's Gift and Crossing*. The

Macmillan Company 64-66 Fifth Avenue. New York 1918 pp 158+8 (ads).

১৯১৮ মে মাসেই বইয়ের কপি এসে পৌঁছেছিল লেখকের কাছে। দ্র. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা পত্র, পোস্ট মার্ক শান্তিনিকেতন ২৮ মে ১৯১৮ :

Lovers Gift কয়েক কপি এসেছে। তোরা তিনধরিয়া যাচ্ছিস কি না ঠিক জানিনে বলে পাঠালুম না। ম্যাকমিলানরা একটা .৫০০ টাকার চেক পাঠিয়েচে ...[১]

'ইস্কুলমাষ্টারিতে...'॥ এই সূত্রে প্রমথ চৌধুরীকে পিয়ার্সনকে অজিতকুমার চক্রবর্তী, বা আরো কাউকে কাউকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষকতার যে যে সব কথা সেই সময়ে লিখেছিলেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯ জুলাই ১৯১৮র চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন :

বিদ্যালয়ে আজকাল মাষ্টারি করে থাকি। তাতে আমায় প্রায় সমস্ত দিন কেটে যায়। এতে আর কিছু উপকার যদি নাও হয় তবু আমার মনটা সুস্থ থাকে। নানা কারণে উদ্‌বৃত্ত শক্তিকে যখন কাজে লাগাতে না পারি তখনি মন বিগড়ে যায়। লেখার প্রেরণা সব সময়ে থাকে না অথচ মনের কলে দম দেওয়া থাকে বলে সে সব সময়েই চল্‌তে থাকে— এই চলার জাঁতাটা যদি কিছু পেষবার না পায় তাহলে নিজেকে নিজে ক্ষয় করে।... এইজন্যে পঞ্চাশোর্দ্ধে ঐ অনিশ্চিত অসাময়িক কাজটা ছেড়ে দিয়ে গুরুমশায়গিরি ধরেচি। তাতে বেশ ভালই থাকি।

একই দিনে ২৯ জুলাই ১৯১৮য় অজিতকুমার চক্রবর্তীকে :

আমি আজকাল বিদ্যালয়ে মাস্টারী কাজে খুব উঠে পড়ে লেগে গেচি তিনটে ইংরেজি ক্লাস নিয়েচি— তারপর তিনটে ক্লাসের জন্যে পাঠ্য তৈরি করতে— আমার বিস্তর সময় যায়। ভালই লাগচে— যদিচ খাটুনি কম নয়।

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫ পৃ ৩।

বোধ হয় এখানে যত অধ্যাপক আছেন সকলের চেয়ে বেশি।

পুনরপি ২১ জুলাই ১৯১৮য় :

ছেলে পড়ানোর কাজে উঠে পড়ে লেগেছি . . . তার উপর আমাকে ইংরেজি পড়াবার Text Book লিখতে হচ্চে . . .

২৮ জুলাই ১৯১৮য় ভানুসিংহের চিঠি : 'সকালে তুমি তো জান সেই আমার তিন ক্লাসের পড়ানো আছে . . .'। তারপর ৬ অক্টোবর ১৯১৮য় রবীন্দ্রনাথ পিয়ার্সনকে লেখেন :

All through this last session I have been taking classes in the morning, spending the rest of the day writing text books. it is a kind of work apparently unsuitable for a man of my temperament. Aut I found it not only interesting, but restful ... Lately I came to that state of mind when I could not afford to wait for the inspiration of ideas, so I surrendered myself to some work which was not capricious, but had its daily supply of coal to keep it running. However, this teaching work was not a monotonous piece of drudgery for me ; for, contrary to the usual practice, I treated my students as living organism-- and dealing with life can never be dull ...'

বেশ কয়েকদিন পরের ১৮ আগস্ট ১৯১১এর কুচবিহারের মহারানী

---

১ 'চিঠিপত্র' ৫

২ *Letters to W. W. Pearson* The Visva-Bharati Quarterly May-July 1943 pp 82-83.

৩ 'পত্রাবলী'। দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭১ পৃ ১৯-২০।

৪ 'অনুবাদ-চর্চা-বাংলা হইতে ইংরাজি' রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৫০৮-৬০৭ মধ্যে সংকলিত।

সুনীতি দেবীকে লেখা চিঠিতেও পাই ইস্কুলমাস্টারিতে অত্যন্ত রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

. . . ছেলেবেলায় যখন ছাত্র ছিলুম, তখন মাষ্টারকে এড়িয়ে চলাই আমার একমাত্র কাজ ছিল— আজকাল তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে ইস্কুল মাষ্টারি করতে বসে গেছি। ছেলেদের নিয়ে বেশ আছিও ভালো। ওদের সংসর্গে খানিকটা পরিমাণে যৌবন ফিরে পাওয়া যায়, মন তাজা হয়ে ওঠে।

পিয়ার্সনের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যে পাঠ্যপুস্তকের উল্লেখ করেছেন তা সম্ভবত 'অনুবাদ চর্চা' [বাংলা থেকে ইংরাজি] ১৯১৭ পৃ ১৪০। *Selected Passages for Bengali Translation* (1917) এই দুখানি বই। দ্বিতীয় বই প্রথমটির পরিপূরক বই। প্রথম বইয়ে অনুবাদের জন্য নির্ধারিত বাংলা প্যারাগ্রাফগুলির প্রার্থিত রূপান্তর এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে।

পত্র ৭৫ । 'চারু, তোমার বই ...'॥ 'হেরফের' (উপন্যাস)। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্বিন ১৩২৫ পৃ ৪ + ২২৫ ।

গ্রন্থারম্ভে লেখা :

এই গল্পের প্লটের মূল ধারাটি পরম পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্নেহের দান। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ১৫ আশ্বিন ১৩২৫ ।

চারু

'হেরফের' উৎসর্গ : 'সোদরপ্রতীম শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য সুহৃদ্‌বরেষু ।'

'এই ছুটির মধ্যে...'॥ পূজার ছুটিতে ২১ আশ্বিন ১৩২৫ ৮ অক্টোবর ১৯১৯ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন, ২৫ আশ্বিন ১২ অক্টোবর মাদ্রাজের পথে গাড়ির গোলযোগে পিঠাপুরমে যাত্রাভঙ্গ করে তারপর কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে ফেরেন ৩ কার্তিক ২০ অক্টোবর ১৯১৮। দ্র 'রবীন্দ্রজীবনী' দ্বিতীয় ১৯৯৫ সং পৃ ৬১৯-৬২০ ।

পত্র ৭৬। 'একটি শিক্ষকের আশু প্রয়োজন'॥ কালীপদ রায় লিখেছেন,

'রবীন্দ্রনাথ কখনও বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করেন নি, যথার্থ শিক্ষকদের তিনি খুঁজে বের করেছেন।'

'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ' ১৩৮৮ পৃ ৩৯ ।

পত্র ৭৮। '...আলাদা কপি'॥ Letters from an Onlooker. by Rabindranath Tagore. Translated by Surendranath Tagore. Translation revised by the Author. ৮ পেজী ক্রাউন পৃ ১৩। পিছন মলাটে ছাপা : Printed by A. C. Sarkar at the Brahmo Mission Press. 211 Cornwallis Street. Published by Ramananda Chatterji. 210 Cornwallis Street. Calcutta

'বাতায়নিকের পত্র' অনুবাদ মডার্ন রিভিউ জুলাই ১৯১৯ পৃ ১-১৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

' "ঘোড়ার পরীক্ষা" মডার্ন রিভিউয়ের জন্য ...'॥ 'ঘোড়া' : লিপিকা The trial of the Horse নামে অনূবাদিত। মডার্ন রিভিউ, অগস্ট ১৯১৯ পৃ ১৮৮-১৮৯। গ্রন্থাকারে THE TRIAL OF THE HORSE/ By/ Rabindranath Tagore ক্রাউন ৮ পেজী। pp 1-7 (Reprinted from the Modern Review from August, 1919.) মুদ্রক ও প্রকাশক পূর্ব গ্রন্থানুরূপ। অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

দুটি অনুবাদ রচনাই বিপাকের বন্ধুদের জন্য পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

Trial of the Horse পরে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত The Parrot's Training and Other Stories (অক্টোবর ১৯৪৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

পত্র ৭৯। তু. একই দিনে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠি :

কাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় কলকাতায় পৌঁছব। রবিবারে রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতিসভা বসবে সন্ধ্যা ছটার সময়... সোমবারেই আমাকে

ফিরতে হবে। ইতি— বুধবার (শান্তিনিকেতন ৩০ জুলাই ১৯১৯)।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যু হয় ৬ জুন ১৯১৯এ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তখন তিনি সভাপতি। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগের সংবাদ ও বসুমতী পত্রে ত্যাগপত্রের অনুবাদ পাঠ করে উত্থানশক্তিরহিত রামেন্দ্রসুন্দর কনিষ্ঠকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পদধূলি প্রার্থনা করে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ এলে তাঁর মুখে মূল পত্রখানি শোনেন। অতঃপর তাঁর সংজ্ঞা লোপ হয় এবং সেই তাঁর শেষ নিদ্রা।

৬ জুলাই ১৯১৯এ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে শোকপ্রকাশ ও স্মৃতি রক্ষা সমিতি গঠিত হয়, সমিতির সভাপতি হন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের নাম গৃহীত হয় তৃতীয় স্থানে। ৩ আগস্টের (১৮ শ্রাবণ ১৩২৬) স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তিতে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে পরিষৎ যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করেন তার আয়োজকদের মুখ্যস্থানে ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর এবং পরিষৎ-সম্পাদক রূপে তিনিই তাঁকে স্বরচিত অভিনন্দনপত্র প্রদান করেছিলেন। পরিষৎ-আয়োজিত রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশদ্বর্ষপূর্তি সংবর্ধনাসভায় রবীন্দ্রনাথও স্বরচিত স্বহস্তলিখিত একখানি অভিনন্দনপত্রে বোলপুর থেকে এসে পাঠ করে যান।

পত্র ৮০। 'আমাদের শান্তিনিকেতন পত্রের...'॥ বৈশাখ ১৩২৬ থেকে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের জন্য মাসিক পত্র' শান্তিনিকেতন পত্রিকার সূত্রপাত হয়। প্রথম বছরের সম্পাদক জগদানন্দ রায়। পত্র-সূচনায় লেখা হয়, 'এই কাগজে আমরা যাহা কিছু বলিব তাহা কেবল-মাত্র আমাদের আশ্রমের ছাত্র ও আত্মীয়দিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিব।' তৎসত্ত্বেও প্রথমাবধি প্রবাসীর কষ্টিপাথর বিভাগে শান্তিনিকেতন পত্রিকা থেকে বিস্তারিত রবীন্দ্ররচনা সংকলন করে দেওয়া হতে থাকে। কার্তিক ১৩২৬ সংখ্যা পর্যন্ত আহৃত রচনার একটি তালিকা এখানে প্রস্তুত

করে দেওয়া গেল :

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

'গান' (পাখী আমার নীড়ের পাখী) পৃ ১৭৫

'নববর্ষ' (নববর্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্যের উপদেশ) পৃ ১৭৫-১৭৬

'মৈসুরের কথা' পৃ ৭৬-১৭৭

'বিশ্বভারতী' পৃ ১৭৭

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৬

'অসন্তোষের কারণ' পৃ ২৪৪-২৪৫

'গান' (মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি) পল ২৪৫

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৬

'খাদ্য চাই' পৃ ৩৮১-৩৮২

'প্রতিশব্দ' পৃ ৩৮২

'বিদ্যার যাচাই' পৃ ৩৮২-৩৮৩

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৬

'১১ই আষাঢ়ের উপদেশের মর্ম পৃ ৪৩০-৪৩১

'বিশ্বভারতী' (১৮ই আষাঢ় বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভের দিনে আচার্যের বক্তৃতার সারসংকলন) পৃ ৪৩১-৪৩২

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৬

'কল্যাণ' পৃ ৫৬৩-৫৬৫

'অনুবাদ-চর্চা' পৃ ৫৬৫

'প্রতিশব্দ' পৃ ৫৬৫-৫৬৬

'গান' (আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি) পৃ ৫৬৬-৫৬৭

প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৬

'গান' (তীরে কি আর আসবে না তোর তরী) পৃ ৭৪

'গান' (দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন) পৃ ৭৪

'গান' (আমার বোঝা এতই করি ভারী) পৃ ৭৪

'গান' (আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে) পৃ ৭৪

'তোমাকে একটা গল্পের প্লট...'॥ 'দোরোখা' গল্পের প্লট ।

'সুরেনের আপিস...'॥ ১৪ নং হেয়ার স্ট্রীটে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স সোসাইটির অফিস।

' "গোরা।' তর্জমা'।। শিলং থেকে ফিরে এসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ২৯ কার্তিক ১৩২৬এর পত্র :

গোরার ইংরেজি তর্জমার জন্য আপনি অনুরোধ করিয়া সুরেনকে চিঠি লিখিলে হয়ত ফল হইতে পারে। তার কাজের ভীড় হয়ত কিছু কমিয়াছে ।

অতঃপর ২৬ ফাল্গুন ১৪২৬এ লেখেন :

সুরেন বোধ করি 'গোরা' তর্জমা করিতে সাহস পাইতেছি না। কেম্‌ব্রিজ হইতে এণ্ডার্সনের পত্র পাইয়াছি তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন আমার গল্পের মধ্যে গোরা তর্জমা করিতে তাঁহার সখ, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন বলিয়া দ্বিধা করিতেছেন। আমারও বোধ হয় কোনও নিছক ইংরেজের পক্ষে গোরা তর্জমা করা সহজ নহে। এণ্ডরুজ আসিলে তাহার সঙ্গে একত্রে মিলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। ইংরেজি ভাষায় আমার কলম যদি সহজে চলিত তবে Modern Reviewর জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম, নূতন অভ্যাসের আর সময় নাই ।

---

১ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিনের সংকলন শান্তিনিকেতন পত্রিকার যথাক্রমে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যার রচনা থেকে আহৃত। প্রবাসী, কার্তিক-সংখ্যায় গৃহীত গান কয়টি শান্তিনিকেতন, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬ যুগ্ম সংখ্যার পৃ ২৬, পৃ ৩০ ও পৃ ৩৩এ মুদ্রিত। শান্তিনিকেতন, আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার আরো অনেকগুলি রবীন্দ্ররচনা প্রবাসী, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সংকলিত হয়। প্রবাসীর 'কষ্টিপাথর' বিভাগে এ ছাড়াও পাশাপাশি সবুজপত্র থেকে রবীন্দ্ররচনা আহৃত হয়েছে।

এণ্ডরুজ এই সময় পূর্ব আফ্রিকায়।

পরে 'গোরা' অনুবাদ করেন উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়ারসন।

পত্র ৮১। ''কথিকা''॥ ৪ ভাদ্র ১৩৩৬এর চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ছোট ছোট গল্পকে ''কথান্‌'' না বলে ''কথিকা'' বলা যেতে পারে। ''গল্পস্বল্প'' বললে ক্ষতি কি? অতঃপর ২২ ফাল্গুন সে নিতান্তই গল্পস্বল্প ...'।

'পুনশ্চে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ইংরেজি গদ্যে অনুদিত 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হওয়ার পরেই তাঁর মনে প্রশ্ন হয়েছিল 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, ''লিপিকা''র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে।'

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ভীরুতাবশত ''লিপিকা'' লেখার কাব্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি।' কিন্তু এই 'কথিকা'তেই তাঁর গদ্যকবিতা রচনার সূত্রপাত।

মাঘ ১৩২৪ থেকে মাঘ ১৩২৬এর পূর্ব পর্যন্ত এইরকম বাইশটি লেখা পাওয়া যায়। দ্র গ্রন্থপরিচয় 'লিপিকা' ১৩৮৫ সং পৃ ১৮৯০ ১৯০। বিজয়চন্দ্র মজুমদার বঙ্গবাণী পত্রিকার সম্পাদক। বঙ্গবাণীতে 'লিপিকা'র একটিমাত্র কথিকা 'পরির পরিচয়' প্রকাশিত হয় : বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩২৯।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছেন, জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর নাইট পদবী প্রত্যাহার করবার পর বিচলিতচিত্তকে প্রশমিত করে 'কথিকা' পর্যায়ের লেখার শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ, দ্র. 'লিপিকার সূচনা', 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সংকলিত ১৯৮৫ পৃ ১৬৪-১৬৬।

'প্রবাসীর অগ্রহায়ণ [১৩২৬] সংখ্যায় উদ্ধৃত' রবীন্দ্ররচনা ।। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ পৃ ৯৯এ আরম্ভেই এক পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের দুটি কথিকা : 'একটি চাউনি' ও 'একটি দিন' প্রকাশিত হয়। অতঃপর শান্তিনিকেতন পত্রিকা থেকে ছোটো ও বড়ো হরফে সংকলন করে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের লেখা নীচের রচনাগুলি :

'বাংলা কথাভাষা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১১৩-১১৬।

'শারদোৎসব'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১১৯-১২১।

'প্রতিশব্দ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১২৯-১৩১।

'১০ই ভাদ্র শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্যের উপদেশ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১৪৬-১৪৭।

'অনুবাদচর্চা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১৪৭-১৪৯।

'তেল আর আলো'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১৪৯-১৫১।

'মনোবিকাশের ছন্দ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১৫১-১৫৩।

'আহারের অভ্যাস'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১৫৩-১৫৪।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি ও শেষ তিনটি প্রবন্ধ বড়ো হরফে মুদ্রিত, প্রথম তিনটি প্রবন্ধ 'কষ্টিপাথর' বিভাগের বহির্ভূত ।

'বাংলা কথ্যভাষা প্রবন্ধের ভাষাতত্ত্বজনিত ত্রুটি নিয়ে পরের মাসে বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'ভাষাতত্ত্ব আলোচনা' প্রকাশ করেন, প্রবাসী, পৌষ ১৩২৬ পৃ ২১১-২১২ । এই আলোচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ বিজয়চন্দ্রকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা উদ্‌ধৃত করে দেওয়া যেতে পারে :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন,

আমাদের 'শান্তিনিকেতন' নামক ছোট একটি পত্রে 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বাংলা শব্দ উচ্চারণ লইয়া দুই-একটা কথা বলিয়াছিলাম

এবং সেই সঙ্গে ব্যাকরণঘটিত মন্তব্যও কিছু ছিল। আপনি তাহা লইয়া প্রবাসীতে যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার প্রতিলিপি পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। বাংলা ভাষার সোদরা ভাষাগুলির সহিত পরিচয় না থাকাতে এ সকল বিষয়ে অনেক কথাই আন্দাজে বলিয়া থাকি। কিন্তু আন্দাজে বলার বলারও একটা গুণ এই যে তাহাতে আলোচনার ও সংশোধনের অবকাশ দেওয়া হয়। চাণক্যের উপদেশ (যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে) যদি শিরধার্য করিয়া লইতাম তবে তাহা শোভন হইত কিন্তু কল্যাণকর হইত না— আমার তরফে এইমাত্র কৈফিয়ৎ। দুই অক্ষরের বিশেষণ বাংলা ভাষায় স্বরান্ত হইয়া থাকে এই নিয়ম সম্বন্ধে তোমাদের কোনো পাঠকের নিকট হইতে প্রতিবাদ পাইয়াছি এবং এবারকার 'শান্তিনিকেতন' পত্রে এই নিয়মের কচিত অন্যথা সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই সম্ভাবনা আমার পূর্বেও জানা ছিল কিন্তু উক্ত নিয়মের উল্লেখ নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমে ঘটাতে ভাষাপ্রয়োগে সতর্ক হইতে ভুলিয়াছিলাম। যাহা হউক আমার মন্তব্য সম্বন্ধে আমার যাহা প্রশ্ন আছে তাহা পৌষের শান্তিনিকেতনে প্রকাশ করিব এবং আপনাকে পাঠাইয়া দিব। বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় কারণ ইহাতে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য আছে কিন্তু আমার সম্বল বেশি নাই. তাই আন্দাজ লইয়া আমার কারবার। আমার মত ইস্কুল পলাতক ছেলেই এই দুর্গতি।

অনেক দিন আপনাকে দেখি নাই। একবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসিয়া দুই-চার দিন কাটাইয়া যাইতে পারেন কি? তাহা হইলে আপনার সঙ্গে নানা কথা আলোচনার অবকাশ পাওয়া যায়। কলিকাতার ভিড় এত বেশি যে, মন খুলিয়া কথা কহিবার ফাঁক পাওয়া যায় না। ইতি ৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণক্রমে, সম্ভবত অগ্রহায়ণেই বিজয়চন্দ্র শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। পৌষ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রিকার 'আশ্রম সংবাদ' স্তম্ভে উল্লেখ আছে এ যাত্রায় কলাভবনে পুরাণ সম্বন্ধে তিনি একটি বক্তৃতা করেছিলেন।

অধ্যাপক এণ্ডার্সনের পত্র।। ১৩২৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসী পড়ে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক জে. ডি. অ্যাণ্ডার্সন রবীন্দ্রনাথকে ২০ ডিসেম্বর ১৯১৯ তারিখে প্রধানত তাঁর 'অনুবাদচর্চা' নিয়ে বিস্তারিত পত্র লেখেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ এইরকম :

... With what interest I read sundry of your articles in the Agrahayan number of the প্রবাসী— especially that on p. 147 on the difficulties of translation. I spend a good deal of my time in helping pupils to put Bengali into English and (not quite so much time) in helping them to put english into Bengali. The difficulty is to decide when to be free, when to be literal, in translation. Sometimes this difficulty is easily solved. For example, your own two delightful little prose poems একটি চাউনি and একটি দিন go into English very easily, and an almost literal translation is possible. In fact, the closer the translation, the better the result. On the other hand, your touching and admirable note on Pandit Sivanāth Sāstrī can hardly I think, be subjected to a literal translation throughout. It is not so much a matter of the choice of equivalent words as a style. Even in this, however, there are passages which go very easily and pleasantly into an

English guise which even you would not. I think. disapprove. Such for instance. is the Phrase :

মানুষের সঙ্গে যেখানে তাঁর বিলন হইয়াছে সেখানে আর তার নানা ছোটবড় কথা নানা ছোটবড় ঘটনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের জালে ধরা পড়িয়াছে এবং চিরদিনের মত তাঁর মনের মধ্যে তাজা থাকিয়া গেছে ।

But. again. is it certain that every Englishman— our friend Pearson. for example— would choose that as an easier sentence to render into English than others that precede and follow it? It depends on the Englishman's own style and taste. doesn't it? You. a born man of letters. can vary your style almost at will. whereas the average mortal. whether Bengali or English. is fortunate if he has a tolerable mastery of one fairly good and agreeable manner of expressing his own or author's thoughts and emotions. From which it follows that some writers are difficult— not to understand but to translate. For the translator has to transfer to his own language not merely his original's meaning but also something of his manner of expression that can only be done by some effort of imaginative sympathy on the part of someone who has a command of his own speech approximately equal to your own command of Bengali and that. you will observe is asking much! I was interested (and edified) by your discussion of the proper terms for the translation of technical and scientific phrases.

পত্র ৮২। 'গল্প লেখবার মেজাজও নেই ...'॥ 'পাত্র ও পাত্রী' শব্দের পর (সবুজপত্র, পৌষ ১৩২৪) রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন লিখেছেন গল্পের বদলে কথিকা বা 'লিপিকা'র 'গল্পস্বল্প' (১৩২৪-১৩২৯), তথাকথিত আদ্যোপান্ত গল্প পুনরায় বেরোয় প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩২এ, 'নামঞ্জুর গল্প'।

'ভেবেচিন্তে প্লট দিতে পারি...'॥ এই চিঠির আগে পরে অনেকগুলি গল্পের প্লট তিনি চারুচন্দ্রকে দিয়েছেন।

পত্র ৮৩। জুলাই ১৯২২। সত্যেন্দ্রের নামে কবিতা॥ মাত্র ৪১ বছর বয়সে ১০ আষাঢ় ১৩২৯ (২৫ জুন ১৯২২) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা শোককবিতা 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' (বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে, রচনা ১৮ আষাঢ় ১৩২৯) একই সঙ্গে প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯ ও ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৯ পৃ ৩০৭-৩০৮ প্রকাশিত হয়, পরে 'পূরবী' কাব্যে (শ্রাবণ ১৩৩২) পঞ্চম কবিতা রূপে গৃহীত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াণে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন গৃহে, সেন্ট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শোকসভা হয়। কলকাতা রামমোহন লাইব্রেরি হলে শোকসভা হয় ২৬শে আষাঢ় ১১ জুলাই তারিখে। পরদিন ১২ জুলাই ১৯২২এর আনন্দবাজার পত্রিকায় 'সত্যেন্দ্র-স্মৃতি পূজা' নামে সে সভার বিবরণ সাহিত্য সংসদ -প্রকাশিত 'সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছে'র ভূমিকায় সবিস্তারে উদ্ধৃত হয়েছে।[১] অমৃতবাজার পত্রিকার বিবরণটি এইরকম :

THE LATE POET SATYENDRA NATH DUTTA

— : o : —

CONDOLENCE MEETING

To mourn the death of the late Poet Satyendranath Dutt a meeting was convened by his friends and admirers at

১ ড. অলোক রায় -সম্পাদিত 'সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ' ১৯৮৪ পৃ ৩০।

the Rammohan Library on Tuesday evening. Dr. Rabindranath Tagore presided. Among those presen[t] were a number Indian ladies.

Mr. Charu Bandyopadh[y]aya. Assistant Editor of the "Modern Review" and "Probasi". in an extremely able and well-written paper recounted his reminiscences of the late poet and offered a critical estimate of his poetry.

Mr. P. N. Chaudhury in a neat little speech paid a glaring tribute to the sterling qualities which the illustrious deceased was endowed with by providence.

Kaji Nazrul Islam then read a poem as a tribute to the memory of the late poet.

DR. TAGORE'S SPEECH

Dr. Tagore in course of his speech said that the death of Satyendranath has left a gap on his heart and he considered it as his own personal loss. He was so closely related to the deceased in regard to his high literary attainments that he not only admired him but loved him. Dr. Tagore not only adored him for his poetic instincts but the one peculiar trait in his character attracted him most and that was the illustrious deceased wts [?] seeking after the truth in everything and in that direction he was singularly successful. Whenever he had occasion to write any verses he always thought of

Satyendra Nath and although the deceased was quite young Dr. Tagore at all time received his invaluable help in every matter concerning literature.

In conclusion Dr. Tagore read a poem specially composed for the occassion which was full of pathos. The meeting terminate path in the evening.

—The Amrita Bazar Patrika. Wednesday July 12. 1922. পৃ ৬ কলাম ৩।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় সে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর পিতার সঙ্গে, তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন :

সভায় যেরকম জনসমাবেশ হয়েছিল, তেমন সমাবেশ শোকসভায় সচরাচর দেখা যায় না। সভায় উপস্থিত ছিলেন অনেক কবি ও সাহিত্যিক। উপস্থিত ছিলেন সি. এফ. এণ্ড্রুজ সাহেব— খদ্দরের গেরুয়া একটি পাঞ্জাবী ও ধুতি পরিহিত বেশে। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ এলেন। সেদিন তাঁর যে ব্যথাকাতর শোকাহত মূর্তি দেখেছি, তা ভোলবার নয়। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে মনে হয়েছিল যেন আত্মীয়বিয়োগে কাতর। ব্যথিত মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুজ কবির উদ্দেশ্যে পড়লেন—

> বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে
> বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
> তোমার নবীন ছন্দে।

সমস্ত সভা নীরব হয়ে কবিতাটি শুনল। অতঃপর কোনো শোকপ্রস্তাব গৃহীত হল না, অন্য কেউ বক্তৃতা দিলেন না। সভা ভঙ্গ হল। সভার সকল লোক ব্যথিত শোকাহত হৃদয় নিয়ে ধীরে ধীরে সভা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। সুধীরচন্দ্র সরকারও ওই শোকসভার একটি বিবরণ রক্ষা করেছেন তাঁর 'আমার

কাল আমার দেশ' বইয়ে ১৩৭৫ পৃ ৬০-৬১। তিনি লিখেছেন :

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামমোহন লাইব্রেরি হলে তাঁর স্মৃতির জন্য আমরা একটি সভার অনুষ্ঠান করি। কথা ছিল, সভা শেষ হবার পর একটা রীতিমতো কমিটি গঠিত হবে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য। অন্যান্য সভায় যেমন হয়ে থাকে তেমনভাবে কোনো সভাপতির নাম প্রস্তাব আমরা করি নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যুবাসরে এসে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিত কবিতাটি সভাপতি পাঠ করলেন।

আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনে এমন অভিভূত হয়েছিলাম যে সেদিন সত্যেন দত্তের সেই স্মরণসভায় আর কোনও রেসোলিউশন্ নেওয়া বা কমিটি গঠন হল না। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী কবিগুরুর কবিতা শুনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি চলে গেল। এই রকম শোকপূর্ণ সভা আমি আর কখনও দেখি নি।[১]

রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রের কাছে কবিতার প্রুফ দেখতে চেয়েছিলেন। প্রবাসীতে পাঠানো প্রেসকপির সঙ্গে প্রবাসীতে পাঠের কোনো কোনো স্থানে পার্থক্য হয়েছে, তাতে বোঝা যায় প্রুফে তিনি কবিতাটির সংস্কার করেছিলেন। প্রথম ছত্রেই এই তারতম্য চোখে পড়ে :

পাণ্ডুলিপির পাঠ

আষাঢ়ের পুঞ্জমেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে

---

১ প্রসঙ্গত সেন্ট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে দর্জিপাড়া নিউ জুভেনাইল লাইব্রেরির শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় ৭ই জুলাই শুক্রবার। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী সে সভায় সভাপতিত্ব করেন. বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'পরলোকগত সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন' হয় ১১ জুলাই ২৭শে আষাঢ় তারিখে. প্রমথ চৌধুরী সে সভায় সভাপতিত্ব করেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ মিত্র লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে পরিষদ ১৪ই জুলাই বন্ধ থাকবে ঘোষণা করা হয়।

পত্রিকার পাঠে হয়েছে

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে

রচনাবলী সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত পাঠের পরেও পরবর্তী সংশোধনের হদিশ আছে, দ্র. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্দশ খণ্ড ১৩৭১ সং ৫২৫।

প্রসঙ্গত 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' কবিতার অনুষঙ্গ ও অন্তর্বিষয়ের দীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন জগদীশ ভট্টাচার্য, দ্র. 'রবীন্দ্রকবিতাশতক' প্রথম দশক ১৩৮১ পৃ ১১৭-১৪৮। কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্র মুদ্রিত হয়েছে বইয়ে। নানা পাঠভেদের প্রসঙ্গও তিনি অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, 'নতুন বৌঠানের তিরোধানে' ও 'পত্নীবিয়োগে' ছাড়া 'অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন-বিয়োগে তিনি যে-সব কবিতা রচনা করেছেন তার মধ্যে কাব্যোৎকর্ষে "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" সর্বাগ্রগণ্য।' কবিতাটি তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথেরও 'অন্তিম পর্যায়ের [একটি] অবিস্মরণীয় কবিতা।'

পত্র ৮৪। 'অয়মহং ভো'॥ ৯ জুলাইয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শোকসভায় যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেই চারুচন্দ্রকে স্মরণ করেছেন। সীতা দেবী লিখেছেন, 'চারুবাবুকে তিনি স্নেহ করিতেন, অনেক সময় তাঁহার কলিকাতা আগমনের সংবাদ চারুচন্দ্রই প্রথম পাইতেন। পোষ্ট কার্ডে "অয়মহং ভো" এই কয়টি মাত্র লিখিত থাকিত, কিন্তু হাতের লেখাই লেখককে ধরাইয়া দিত।'

শান্তা দেবী স্মরণ করেছেন, 'এই যুগে চারুবাবুর প্রিয়তম ও পূজ্যতম ব্যক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কলিকাতায় আসিবার পূর্বে তাঁহাকে "অয়মহং ভোঃ" বলিয়া স্বাক্ষরহীন একটি করিয়া কার্ড পাঠাইতেন।'[১]

'অয়মহং ভোঃ'। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ৪. ১১।

পত্র ৮৫। 'ছুটিতেও কি ...'॥ ১৯২৪এ পুজোর আগে বা পরে চারুচন্দ্র ঢাকা

১ 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ৫৩। 'রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৬২।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনকর্মে যোগ দেন. মনে হয় ঢাকাতেই ছিলেন একটানা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন গ্রীষ্মের মধ্যে লেখা 'চলৎশক্তিরহিত', সম্ভবত ২১. ৩. ১৯২৪ - ১৭. ২. ১৯২৫এর মধ্যে প্রায় বর্ষকাল চীন জাপান দক্ষিণ আমেরিকা ইয়োরোপ তিন মহাদেশ পর্যটন করে ফিরেছেন ব'লে। 'কিছুকাল পরেই আরেকবার': পরের বারে ইয়োরোপ পাড়ি দেন অবশ্য পরের বছর, ১২ মে ১৯২৬ বোম্বাই হয়ে ইতালির পথে ইয়োরোপে।

পত্র ৮৬ । 'বর্ষার ফাল্গুনের আবাহন ...' ।। 'ফাল্গুনী' অভিনয়। বাণীমন্দির, সদর ঘাটে স্থিত ঢাকা বিশ্বভারতী সম্মিলনী ৭ জুলাই ১৯২৫ (২৩ আষাঢ় ১৩৩২) তারিখে 'ফাল্গুনী'র এই অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই সম্মিলনীর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলে উল্লেখ আছে। কনক বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিঠিখানি সূত্রে যা লিখেছিলেন এখানে উল্লেখ করি :[১]

১৯২৫ সাল। ঢাকায় এই সময় কবিগুরুর 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় করেছিলাম আমরা। অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমার পিতা, অধ্যক্ষ অপূর্বকুমার চন্দ, কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতি । অভিনয়ের রিহার্সাল যখন পুরোদমে চলেছে তখন একদিন অধ্যক্ষ অপূর্বকুমার চন্দ বললেন, চারুবাবু! আমরা বর্ষাকালে 'ফাল্গুনী' অভিনয় করতে যাচ্ছি, অদ্ভুত নয় কি?' আমার পিতা বললেন, 'কবির কাছ থেকে একটা কৈফিয়ত আনিয়ে নেওয়া যাক না। সব দোষ কেটে যাবে।' কবিকে চিঠি লেখা হল। উত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন সেই হল বর্তমান এই চিঠিখানি ।

অভিনয়ের অনুষ্ঠানপত্রীতে চিঠিতে পাঠানো কবির এই কৈফিয়তটির পূর্বে ভূমিকাস্বরূপে সবুজপত্র থেকে 'ফাল্গুনী'র ভূমিকার অংশ : 'বসন্তে ঘরছাড়ার দল পাড়া ছাড়িয়াছে' থেকে 'আর অর্থ? অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্'

---

১ 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র ও অপ্রকাশিত রচনা'। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮ পৃ ১২৩।

পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয়েছে। কৈফিয়তের শেষে

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি
আছে অন্তরে।
পরানে বসন্ত এল
কার মন্তরে॥

অধিকন্তু এই চার ছত্র আছে। এর পর অনুষ্ঠানপত্রীতে 'ফাল্গুনী'র উনত্রিশটি গানের পাঠ পর পর মুদ্রিত করে দেওয়া হয়েছে ।

ভূমিকালিপিতে দেখা যায় রাজার পার্ট নিয়েছিলেন অপূর্বকুমার চন্দ, শ্রুতিভূষণ ও দাদার ভূমিকায় ছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় বর্মা, কাজী আবদুল ওদুদ, আর চন্দ্রহাসের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কনক বন্দ্যোপাধ্যায়।[১]

পত্র ৮৯। 'দোলের কবিতা...'॥ ঢাকায় অবস্থানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে তাঁদের মুখপাত্র বাসন্তিকার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বাসন্তিকা' ১৩৩২ তারিখ দেওয়া একটি গান লিখে দেন, অজ্ঞাত কারণে বাসন্তিকা পত্রিকায় সে গান ছাপা হয় নি।[২] ছাত্রদের ১৩৩৩এর বার্ষিক বাসন্তী পূর্ণিমা সম্মিলনী উপলক্ষ্যে বাংলার বরেণ্য কবিদের কাছে তাঁরা কবিতা প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁদের হয়ে চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে দোলের কবিতার জন্য আরজি করে পাঠান। আমন্ত্রিত কবিতাগুলি ১৩৩এর বাসন্তিকা পত্রিকার শেষ দিকে রঙিন কাগজে ছাপা হয়, রবীন্দ্রনাথের পাঠানো দোলের কবিতা তার মধ্যে ছিল না। 'মসীবন্ধনে বন্দী করবার অধিকার তোমাদের দিচ্ছি নে— আবৃত্তিসভায় এর অবগুণ্ঠন মোচন করতে

১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পুলিনবিহারী সেন -সংগ্রহ ।

২ দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার : 'জীবনের স্মৃতিদীপে' ১৯৭৮ পৃ ২০৬। গোপালচন্দ্র রায় : 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' ১৩৭৯ পৃ ৭৩-৭৫, ১৫৩-১৫৮। গোপালচন্দ্র 'বাসন্তিকা' কবিতা ছাত্রদের পত্রিকায় ছাপা না হবার কারণ অনুমান করতে চেষ্টা করেছেন।

পারে।'— এই অনুশাসন নিশ্চয় তার কারণ। রবীন্দ্রনাথের পাঠানো এই এই দোলের কবিতাটি 'বনবাণী' (১৩৩৮) কাব্যের অন্তর্গত নটরাজ ঋতুরঙ্গ শালা'র কবিতা 'আলোকরসে মাতাল রাতে বাজিল কার বেণু' ইত্যাদি, প্রেরিত কবিতার পাণ্ডুলিপি পৃথক ফাইলে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে ।

পত্র ৯০ । 'যে লাইনটা আমার...' ইত্যাদি॥ 'সংকলন' (১৩৩২, পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৪) গ্রন্থে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যা' প্রবন্ধের লাইন, সম্ভবত ক্লাস পড়ানোর সূত্রে ওই লাইনের অর্থগত অসঙ্গতি চারুচন্দ্রের চোখে পড়াতে তিনি বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যা' প্রবন্ধের লাইন, সম্ভবত ক্লাস-পড়ানোর সূত্রে ওই লাইনের অর্থগত অসঙ্গতি চারুচন্দ্রের চোখে পড়াতে তিনি বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের গোচরে আনেন।

'কাল যাচ্চি শিলঙ পর্বতে...'। অর্থাৎ এবারেও শিলঙ যাত্রার দিন ২৩ বৈশাখ ৬ মে ১৯২৭। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন, অম্বালাল সরাভাইয়ের ব্যবস্থায় 'কবি সপরিবারে চলিলেন শিলঙে...' 'এবার শান্তিনিকেতনের দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক জাহাঙ্গীর বকীল ও জীবনী লেখক সপরিবারে শিলঙ পাহাড়ে গিয়েছিলেন।'[১]

পত্র ৯১ । 'সমস্যা' । পূর্ব পত্রের জের। দ্র. নম্বর চিঠির টীকা।

'বেতস...'॥ চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'ক্ষণিকা'র 'আবির্ভাব' কবিতার সপ্তম কলিতে আছে 'বনবেতসের বাঁশিতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ!' বেতন মানে বেত, তাহা নিরেট, তাহাতে বাঁশি হইতে পারে না। 'বনের বেণুর বাঁশিতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ' বলিলে অনুপ্রাস ও অর্থ দুইই রক্ষিত হইত। এই কথা কবির গোচর করিলে তিনি আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন ...'

এই সে পত্রখানি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন কবিতা লেখার সময় তিনি ভেবেছিলেন খাগড়ার কথা এবং 'বেতস বলতে শর বোঝায় না এবং

১ 'রবীন্দ্রজীবনী' তৃতীয় খণ্ড ১৩৯৭ সং পৃ ৩১১।

অর্থমালার সর্বপ্রান্তে বেণু কথাটাও তিনি পেয়েছেন ।

চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে লিখেছিলাম যে— অভিধানে বেতস মানে বেণু বা বাঁশ নাই। না থাকুক। ইহার পরে যত অভিধান রচিত হইবে তাহাতে বেতস মানে বেণু বা বাঁশ লিখিতে হইবে।'[১]

পত্র ৯২। চারুচন্দ্রের ১২ মে ১৯২৭ এর চিঠি। ময়মনসিংহের রবীন্দ্র সংঘ ২৫ বৈশাখ ১৩২৪ রবিবার রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করেন। এই উৎসবের উদ্যোগ ও ব্যয়ভার গ্রহণ করেন স্থানীয় উকিল প্রফুল্লকুমার বসু ও তাঁর পত্নী নীহারকণা। নীহারকণা 'আর্ট ও আহিতাগ্নি' রচয়িতা যামিনীকান্ত সেনের ভাগ্নেয়ী। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন, চারুচন্দ্র ভাষণ দিয়েছিলেন। চারুচন্দ্র তাঁর পত্রে জানান :

আমি আমার অভিভাষণে জগতেরা সকল কবির চেয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলেছি বলে কেউ কেউ আমার উপর বিরক্ত হয়েছে শুনলাম। কিন্তু এও শুনলাম যে তাঁরা আপনার রচনা হয় একটাও, বা অধিক পড়েন নি। এই রকম মূঢ় লোকেরাই আপনার অপূর্ব দানের মহামূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাদের আপত্তি আমি তুলনায় সমালোচনা করছি । আমি এই কর্ম করে বহুকাল থেকে বহুলোকের বিরক্তিভাজন হয়েছি ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিবাদ প্রথম আমিই প্রবাসীতে তাঁর 'আলেখ্য' সমালোচনা প্রসঙ্গে করি। জীবনের অবশিষ্ট দিন কটাও আপনার মহিমা কীর্তন ও প্রচার করেই কাটবে। আপনার কবিতাগুলি বুদ্ধি ও মনের শৃঙ্খল মোচন করে, আপনার গানগুলি বাঙালীর জীবন-বেদ। শোকে দুঃখে সান্ত্বনা, আনন্দে উৎসাহ, ক্লান্তিতে রসায়ন! আপনার প্রবন্ধগুলি যুক্তির শাণ যন্ত্র। এই সত্য কথাও

---

১ 'রবিরশ্মি— পশ্চিমভাগে' ৫ম সং পৃ ১৭-১৮। 'বেতস' সূত্রে মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ অবশ্য cane এবং reed দুটি অর্থই দিয়েছেন, reed শর বা নল, গ্রাম্য বাঁশি হয় বলেও। reed বলতেও বাঁশি বোঝাতে পারে : a reed made into a rustic musical pipe দ্র *SOD* ১৯৫০ নং পৃ ১৬৮৩।

লোককে বোঝাতে হয় এই আমার দুঃখ।

যতীন্দ্র সিংহ ॥ যতীন্দ্রমোহন সিংহের (১৮৫৮-১৯৩৭) ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে প্রকাশিত 'উড়িষ্যার চিত্র' (১৩০৭-১৩০৯) পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'জানিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে ...যতীন্দ্রবাবুর জানিবার শক্তি এবং জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাওয়া গেছে।' পরে অবশ্য আধুনিক 'কামকলযময়' সাহিত্যের 'স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্‌বিগ্ন হয়ে তিনি সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন, 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' (১৯২২) নামে পুস্তককারে সংকলিত। সে লেখার মুখ্য অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে ।[১]

পত্র ৯৩। 'সমস্যা' ॥ 'সমস্যা' প্রকাশ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৫ পৃ ১৫৩-১৬৩। 'রাজা প্রজা'র (গদ্যগ্রন্থাবলী দশম ভাগ, জুন ১৯০৮) শেষ প্রবন্ধরূপে অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর 'রাজা প্রজা' বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ডে (চৈত্র ১৩৪৮) সংকলিত হয়।

'গদ্যগ্রন্থাবলী লইতে বাছিয়া... বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিয়া লেখার তারিখ অনুসারে' বিন্যাস করে বিশ্বভারতী 'সংকলন' গ্রন্থ (অগস্ট ১৯২৫) প্রকাশ করেন, 'সংকলনে'র নবম প্রবন্ধরূপে 'সমস্যা' গৃহীত হয়। 'সংকলনে'র রচনাসমূহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংক্ষেপিত, 'সমস্যা' প্রবন্ধ বিশেষভাবেই সংক্ষেপকৃত ।

পত্রিকা থেকে গ্রন্থে আহরণকালে 'সমস্যা'র পাঠ ও বিন্যাসের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল । পত্রিকার প্রথম ছয় অনুচ্ছেদ বইয়ে ছোটো হরফে মুদ্রিত হয়।

'সংকলন' গ্রন্থে মূল 'সমস্যা' প্রবন্ধের প্রথম সাঁইত্রিশ অনুচ্ছেদ বাদ

---

১ এর আগে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা এবং চলিত ভাষা ব্যবহার নিয়েও যতীন্দ্রমোহন বিরূপতা করেছিলেন। দ্র. 'ইতিহাসে কবিত্ব': নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; 'একটি মোকর্দমার রায়, চলতি ভাষা বনাম সাধু ভাষা' : নারায়ণী আষাঢ় ১৩২৪।

পড়েছে, মূল 'সমস্যা'র আটত্রিশতম প্যারা থেকে 'সংকলনে'র প্রবন্ধ শুরু। চারুচন্দ্র যে কাব্যটির অসংগতির কথা রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন 'সংকলনে' সেটি 'সমস্যা' প্রবন্ধের চতুর্থ অনুচ্ছেদের বাক্য, মূল প্রবন্ধের বিয়াল্লিশতম অনুচ্ছেদের ।

'সংকলনে'র পাঠ ১৯২৫

কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি; নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত সংশোধন ১৯২৭

আত্মীয়তার সম্বন্ধ কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি।

প্রবাসী পত্রিকার পাঠ, ৪৭তম প্যারা ১৯০৮

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সযোগ এবং কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি না হইলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না।

'রাজা প্রজা'র পাঠ, ৪২ তম প্যারা ১৯০৮

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার অনেক বেশি নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না।

রচনাবলীর পাঠ

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজনসাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে, অনেক বেশি নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না ।

প্রসঙ্গত, প্রচলিত সংশোধনের কালে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'সংকলনে'র প্রবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন, মূল প্রবন্ধটি হাতে পান নি। অপিচ, চারুচন্দ্রকে জানালেও, প্রকাশক বা মুদ্রাকরের কাছে সংশোধনটি সম্ভবত পাঠান নি ।

'সংকলন' নতুন বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের প্রথম পর্বের বই, গ্রন্থের

সম্পাদক বা সংক্ষেপকারী কে ছিলেন জানা যায় না ।[১]

নতুন উপন্যাস ।। 'তিন পুরুষ' । বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশারম্ভ আশ্বিন ১৩৩৪। জলধর সেনের এই নামের উপন্যাস ভারতবর্ষে প্রকাশ শুরু হয়েছে জেনে অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে 'যোগাযোগ' নামে নামান্তরিত। নামান্তরের কৈফিয়ত স্বরূপ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রচনারম্ভে ভূমিকা সংযোজন করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

সর্বসমক্ষে আমার গল্প আজ তার নাম খোয়াতে বসেছে। আমরা তিন সত্যের জোর মানি। 'বিচিত্রা'র পাতায় নাম সম্বন্ধে দুইবার সত্য পাঠ হয়ে গেছে। তিনবারের বেলায় মুখচাপা দেওয়া গেল।... 'তিন পুরুষ' নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল 'যোগাযোগ' ।

দ্র উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : স্মৃতিকথা' ৪র্থ খণ্ড ১৩৭৩ পৃ ১০৩-১০৬ ।[২]

পত্র ৯৪ । 'পঞ্চভূত' ।। 'পঞ্চভূত' সম্বন্ধে চারুচন্দ্রের আলোচনা মৃত্যুর পর তাঁর

---

১ তৃতীয় সংস্করণ 'চয়নিকা'র পূর্বেই 'সংকলন' নামে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়, ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট তারিখে। অনুমান করা যায়, অল্প প্রচারিত মূল রচনার সহিত শিক্ষিত সাধারণের আংহিক পরিচয় সাধন আর গ্রন্থবিক্রয়ের আয়বৃদ্ধি উভয়েই এই পরিকল্পনার মূলে। পূর্বে কোনো গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয় নি এমন রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। গ্রন্থসূচনায় বলা হয় : 'গদ্যগ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোনো বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই । এইবার আমরা গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া "সংকলন' বাহির করিতেছি।. . .' দ্র বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎ বর্ষ-পরিক্রমা ১৯২৩-১৯৭৩ বিশ্বভারতী ১৯৭৮ পৃ ১৭-১৮ ।

২ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : 'তিন পুরুষ' উপন্যাস (পরে 'যোগাযোগ') রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুরোধক্রমে লিখেছিলেন।... 'যোগাযোগ' উপন্যাস 'বিচিত্রা'য় প্রকাশ করবার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথকে তিন সহস্র টাকা দক্ষিণা দিয়াছিলাম। এই দক্ষিণার প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "তোমাদের দেওয়া এ দক্ষিণা আমাদের দেশের পক্ষে সুষ্ঠু (decent)।" আমাদের বেশ মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথার মধ্যে ইংরেজি "decent" কথাটি ব্যবহার করেছিলেন ।" "স্মৃতিকথা" ৪র্থ খণ্ড ১৩৭৩ পৃ ১০৩ ।

৩ প্রসঙ্গত 'ডায়ারী' বা 'পঞ্চভূতের ডায়ারী' নামে সাধনা মাসিকপত্রে মাঘ ১২৯৯-কার্তিক ১৩০২এর মধ্যে প্রকাশিত । 'পঞ্চভূত' নামে গ্রন্থাকারে বৈশাখ ১৩০৪ পৃ ১৯৫ ।

'রবীন্দ্রসাহিত্য পরিচিতি' বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় পৃ ১২৫-১৩২। প্রকাশকের নিবেদন স্থলে লিখিত হয়েছে, বইয়ের এই প্রবন্ধ এবং আরো অনেকগুলি 'প্রবন্ধই অপ্রকাশিত অবস্থায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যাপনার টীকা-টিপ্পনীর অঙ্গীভূত হইয়া ছিল। সেগুলি সংগৃহীত হইয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল।'

'রবীন্দ্রসাহিত্য পরিচিতি'। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বোস মুখার্জী এণ্ড কোং, ২৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা ১৩৪৯ পৃ ১০ + ১৩৪।

'পঞ্চভূত' প্রবন্ধটি অবশ্য ভ্রমক্রমে চারুচন্দ্রের রচনা মধ্যে স্থান পেয়েছে, এটি জয়ন্তী উৎসর্গ সংকলনের কালিদাস রায় প্রণীত রচনা। সম্ভবত চারুচন্দ্রের ক্লাস পড়ানোর উপকরণের মধ্যে রচনাটি লেখকনামহীনভাবে রাখা ছিল।

'চয়নিকা'র ছাপার ভুল॥ এই 'চয়নিকা' সম্ভবত তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণের বই (ফাল্গুন ১৩৩২), পরবর্তী পুনর্মুদ্রণ (মাঘ ১৩৪০ পত্ররচনাকালে প্রকাশিত হয় নি বলে মনে হয়। বিশ্বভারতী সংস্করণের এই 'চয়নিকা' পূর্ববর্তী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের 'চয়নিকা' বইকে বাতিল করে পাঠকের নির্বাচনে প্রস্তুত বই। প্রকাশক শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জী। আর্ট প্রেস, ১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা। কবিতাসংখ্যা ২০৮, সর্বশেষ বই 'পূরবী' থেকে চারটি এবং একটি অপ্রকাশিত কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে।

দেখা যায়, এই সময়ের আরো কোনো কোনো বইয়ের মতো এই বইয়েরও ছাপার ভুল কবির মনঃপীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। দ্র সজনীকান্ত দাস : 'আত্মস্মৃতি' ১৩৮৪ সং পৃ ১৪৩-১৪৫।

পত্র ৯৫॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যসঞ্চয়নে'র কবিতা নির্ধারণ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা। নির্ধারিত কবিতার নামকরণের জন্য চারুচন্দ্র সম্ভবত

কয়েকটি বিকল্প নামও রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির নির্দেশ চারুচন্দ্র পাঠিয়ে দেন প্রকাশকের সমীপে :

44 নীলখেত রোড

রমনা, ঢাকা

২৫শে নভেম্বর ১৯২৭

প্রিয় সুধীরবাবু,

সত্যেন্দ্র-চয়নিকার নাম সম্বন্ধে রবিবাবু লিখেছেন—

"আমার নিজের মনে হয় selection-জাতীয় বইয়ের সাদাসিধে নাম দেওয়া ভালো। এমন দিন গেছে যখন তর্ক-শাস্ত্রেরও কুসুমাঞ্জলি নামে আপত্তি ছিল না— এখন আভরণ ব্যবহারের যুগ চলে গেছে— কুণ্ডল কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণ মেয়েরাও ত্যাগ করতে উদ্যত। সহজ নামটাই দিয়ো, যথা—

"সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সঞ্চয়ন"

অথবা

"কাব্য-সঞ্চয়ন

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা হইতে)"

এখন যা হয় স্থির করবে...

আপনার

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়[১]

সুধীরবাবু, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স কোম্পানী প্রকাশন সংস্থার অধ্যক্ষ সুধীরচন্দ্র সরকার।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যসঞ্চয়নে'র প্রকাশতারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ পৃ ২৬৪ + ৩।[২]

---

১ 'স্মরণিকা'। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটিড ১৯১০-১৯৮৫ পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি সংকলন ১৯৮৭ পৃ ৬৬।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' ১৩৬৪ পৃ ১২।

পত্র ৯৯। 'তোমাদের চয়নিকা'॥ রমনা, ঢাকা থেকে এই চিঠির মাত্র পূর্ব দিনে ১ বৈশাখ ১৩৩৮ (১৪ এপ্রিল ১৯৩১) এর পত্রে চারুচন্দ্র পলগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি'র আদর্শে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখা বাংলা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার একখানি প্রস্তূয়মান 'চয়নিকা'য় রবীন্দ্রনাথের চল্লিশটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করবার অনমতি চেয়ে সেই সঙ্গে ওই 'চয়নিকা'র জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি ভূমিকাও প্রার্থনা করেন। 'চয়নিকা' প্রকাশ হতে ১৯৩৪ সাল হয়ে গিয়েছিল।

'বঙ্গবীণা'। ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ ১৩৩৪ পৃ ৩ + ২২ + ৫৫৮।

গ্রন্থোৎসর্গ রবীন্দ্রনাথকে।

উৎসর্গ

যাঁহার মোহন অঙ্গুলিস্পর্শে

বঙ্গ-বীণার

স্বর্ণতন্ত্রীতে সর্বাপেক্ষা সুমধুর ঝঙ্কার

রণিত হইয়াছে

সেই কবিশ্রেষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের

করকমলে

বইয়ের ২০১ থেকে ২৯২ সংখ্যক কবিতা-পর্যায়ের মধ্যে (পৃ ২০৭ থেকে ৩৬১) রবীন্দ্রনাথের সাঁইত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়, সংখ্যা কবিতানাম প্রথম ছত্র ও পৃষ্ঠাঙ্ক এইভাবে :

২০১ 'জাগরণী' (বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে) পৃ ২৩৭

২০৩ 'বাল্মীকি' (স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে) পৃ ২৩৯

২০৪ 'কুমারসম্ভব গান' (যখন শুনালে দেবী, দেব-দম্পতীরে) পৃ ২৪২

২০৫ 'বৈষ্ণব কবিতা' (সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি) পৃ ২৪৩

২০৭ 'স্বপ্ন' (দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে) পৃ ২৪৫
২০৯ 'গীতি-কবিতা' (আমি নাব্‌ব মহাকাব্য সংরচনে) পৃ ২৪৯
২১২ 'কবি' (আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার) পৃ ২৫২
২১৪ 'ভারত-লক্ষ্মী' (অয়ি ভুবনমোহিনী) পৃ ২৫৪
২১৭ 'শরৎ' (আজি কি তোমার মধুর মূরতি) পৃ ২৫৮
২২০ 'দর্পহরণ' (প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে) পৃ ২৬২
২২২ 'উর্বশী' (নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ . . .) পৃ ২৬৪
২২৩ 'নিবেদিতা' (ধরাতলে দীনতম ঘরে) পৃ ২৬৮
২২৮ 'নারী-প্রতিমা' (শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী) পৃ ২৭৪
২৩০ 'রহস্য-দীপ' (অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে) পৃ ২৭৬
২৩২ 'প্রিয়ার স্মৃতি' (অন্ধকার নিশীথিনী ঘুমাইছে একাকিনী) পৃ ২৭৮
২৩৪ 'সেকাল ও একাল' (মিছে তর্ক, থাক তবে থাক) পল ২৮০
২৩৬ 'কুণ্ঠিতা' (তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে) পৃ ২৮৪
২৩৮ 'অভিসার' (সন্ন্যাসী উপগুপ্ত) পৃ ২৮৭
২৪৪ 'পুটু' (চৈত্রের মধ্যাহ্ন বেলা কাটিতে না চাহে) পৃ ২৯৬
২৪৬ 'তরু সিং' (পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল বন্দী শিখের দল) পৃ ২৯৮
২৪৮ 'শিবাজি' (বসিয়া প্রভাতকালে) পৃ ৩০০
২৫১ 'আশ্রম' (অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে) পৃ ৩০৭
২৫২ 'ইছামতী নদীর প্রতি' (অয়ি তন্বী ইছামতী তব তীরে তীরে) পৃ ৩০৮
২৫৪ 'বর্ষানন্দ' (হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে) পৃ ৩১১
২৫৫ 'শীতরাত্রে' (পৌষ প্রখর শীতে জর্জর) পৃ ৩১৫
২৫৭ 'বৈশাখ' (হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ) পৃ ৩২১
২৫৮ 'চৈত্র-নিশীথ-শশী' (কত নদীতীরে, কত মন্দিরে) পৃ ৩২৪
২৫৯ 'ঝর ঝর বরিষে বারিধারা' (ঝরঝর বরিষে বারিধারা) পৃ ৩২৫

২৬৩ 'মধ্যাহ্ন-ছবি' (বেলা দ্বিপ্রহর) পৃ ৩২৮

২৬৫ 'আবির্ভাব' (শ্রান্তি গ্লানি তন্দ্রাতুর চোখ বন্ধ করি গ্রন্থখানি) পৃ ৩৩০

২৬৮ 'আসন্ন ঝটিকা' (ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে) পৃ ৩৩৪

২৭২ ''সমুদ্রের প্রতি' (এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা) পৃ ৩৩৭

২৭৫ 'সর্বজাতীয়তা' (ইচ্ছা করে মনে মনে) পৃ ৩৪০

২৭৭ 'প্রাচীন ভারত' (দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট) পৃ ৩৪২

২৭৯ 'সোনার তরী' (গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা) পৃ ৩৪৪

২৮৩ 'ঘুম-পাড়ানী' (আয় রে আয় রে সাঁঝের বা) পৃ ৩৫১

২৯১ 'মৃত্যু-রূপান্তর' (শুধু সুখ হতে স্মৃতি) পৃ ৩৬০

বইয়ের কবি পরিচয় স্থানে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই পরিচয় লেখা হয় : রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং ভারতবর্ষ ও সমস্ত পৃথিবীর উচ্চশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও অন্যতম। তাঁহার প্রতিভা বিচিত্র-সৃষ্টিকুশলা, অতুলনীয়া। তাঁহার কাব্য গল্প প্রবন্ধ গান ও নাটক বঙ্গের ঘরে ঘরে পঠিত গীত অভিনীত ও সমাদৃত হয়। তাঁহার কবিতার মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট, কোন্‌টিকে ত্যাগ করিয়া কোন্‌টিকে গ্রহণ করিব, তাহা এক সমস্যা। নমুনা স্বরূপ আমরা কয়েকটি মাত্র কবিতা এই সংগ্রহে সমগ্র ও আংশিক উদ্‌ধৃত করিলাম। তাঁহারি অসংখ্য কবিতা ও গান ও অন্যান্য রচনার রসাস্বাদন করিতে হইলে তাঁহার গ্রন্থাবলীর শরণাপন্ন হইতে হইবে।

ভূমিকায় সম্পাদকেরা উল্লেখ করেন, 'কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকর মহাশয় এই কাব্যসঞ্চয়নের পরিচয় লিখিয়া দিয়া এই পুস্তককে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।'

'পরিচয়'॥ রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গবীণা'র জন্য ভূমিকাটি লিখে পাঠান দার্জিলিঙ থেকে অক্টোবরের শেষ দিকে। ২৭ অক্টোবরে লেখা রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিবের নীচে উদ্‌ধৃত চিঠির সঙ্গে আসে লেখাটি।

Glen Eden
Darjeeling
১০ই কার্ত্তিক ১৩৩৮

সবিনয় নিবেদন,

রবীন্দ্রনাথ আজ এই রচনাটি আপনাদের কবিতা-সঞ্চয়ন বইখানির ভূমিকাস্বরূপে লিখেচেন।

তাঁর শরীর নিরতিশয় ক্লান্ত, বিশ্রাম এবং বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্যে এখানে এসেচেন। মাসখানেক থাকবার কথা আছে।

রচনাটি ঠিকমতো আপনার হাতে পৌঁছল এই সংবাদ পেলে বাধিত হব।

আমার সবহুমান নমস্কার নেবেন।

ভবদীয়

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের শরীর যে তখন নিরতিশয় ক্লান্ত তাঁর নিজের লেখা পূর্বদিনের চিঠিতে তা দেখতে পাওয়া যায়। দার্জিলিঙ ২৬ অক্টোবর ১৯৩১ তারিখে হেমন্তবালা দেবীকে কবি লিখছেন :

কল্যাণীয়াসু,

এখানে এসে অবধি শয্যাগত হয়েই আছি। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার একটা আবর্ত্ত শরীরের মধ্যে ঘুরপাক দিয়ে বেড়াচ্ছে। ...

'বঙ্গবীণার জন্য লেখা রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি এই :

পরিচয়

যখন কবি য়েট্‌স্‌ আমার গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলেছিলেন, 'আপনার এই

যে কাব্য আজ আমাদের গোচর হলো, এ'কে বাংলা-সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্‌ছি, কিন্তু বস্তুত এ তো বিচ্ছিন্ন নয়,— যে একটি বৃহৎ ভূমিকার উপর এই কাব্যের বিশেষ স্থান আছে সেটি না জান্‌তে পারলে এর রস উপলব্ধি হয়তো সম্পূর্ণ হবে না।"

কথাটা অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার মনে লেগে ছিল। কোনো কাব্যের পরিচয় তা'র নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হ'তে পারে না ; যখনি তা'র বিচার করি, তখনি স্বদেশী বিদেশী যে-কোনো সাহিত্য আমাদের জানা আছে নিজের অগোচরেও তা'র সঙ্গে আমরা যাচাই ক'রে থাকি।

কলাসৃষ্টি বা সাহিত্যসৃষ্টিতে রুচি নিয়ে যখন তর্ক ওঠে, তখন তা'র অন্ত থাকে না। সংসারে এক একজন মানুষ থাকে যে সহজ কবি ; তেমনি সহজ রুচিবান্ লোকও রসসৌন্দর্য্যের 'পরে সহজ দরদ নিয়ে দৈবক্রমে জন্মায়। এই কবি এবং রসিক উভয়ে একই জাতের মানুষ, তফাতের মধ্যে এই যে, একজনের কাছে সুরের প্রাণ এবং গলা, আর একজনের আছে সুরে প্রাণ ও কান।

এই শ্রুতিবোধের সহজ শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে না থাক্‌লেও যে-মানুষ বহুশ্রুত সে মূলসৌন্দর্য্যের একটা আদর্শ বাইরে থেকে সংগ্রহ ক'রে অনেক পরিমাণে আত্মসাৎ করতে পারে। এর জন্যে চাই, সাহিত্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা'র সঙ্গে নিরন্তর পরিচয় থাকা। এই পরিচয় বিশুদ্ধ সম্ভোগের, এ তত্ত্ববিশ্লেষণের বা শবব্যবচ্ছেদের মতো অঙ্গবিভাগের চর্চ্চা নয়।

এই সম্ভোগকে খাঁটি করতে হ'লে যা-কিছু আকস্মিক, যা-কিছু সাময়িক উত্তেজনামূলক, যা-কিছু ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তি বা সামাজিক অভ্যাস-লালিত, তা'র থেকে মনকে বিবিক্ত ক'রে নিতে হয়। এ কাজ সহজ নয়, কেননা যা আমাদের কাছের জিনিষ, যা উপস্থিতমতো ঘাটে-বাটে দশের কোলে-কাঁধে আদর পেয়ে ফেরে, তা অচিরস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর হ'লেও তা'র প্রতি অভ্যস্ত স্নেহবশত তা'কে আমরা বেশি দাম দিয়ে ঠকি। এই রকম

প্যাড়ার হাটের রাঙ্‌তা-লাগানো সস্তা সামগ্রীর মোহ থেকে মনকে বাঁচাবার উপায় দূরপ্রসারিত সাহিত্যকে মনের সঞ্চরণক্ষেত্র করা। যে-সমস্ত রসসৃষ্টি ক্ষণকালের প্রশ্রয়ের গণ্ডী পেরিয়ে নিত্যকালের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়েচে, তাদের সঙ্গে সর্ব্বদা চেনাশোনা থাক্‌লে সাহিত্যবিচার কর্‌বার অধিকার জন্মে ও আনন্দ ভোগ কর্‌বার শক্তি খাঁটি হ'য়ে ওঠে।

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌গুলি সঙ্কলনের প্রয়োজন এই কারণেই। সাহিত্য বিজ্ঞানের মতো নয়। তা'র ঝুঁটা-সাঁচ্চা বিচার, যুক্তির দ্বারা সম্ভব হ'লে ভাবনা থাক্‌ত না; রুচি ছাড়া আর কোনো কষ্টিপাথর বা মানদণ্ড তা'র নেই। অথচ রুচি-সম্বন্ধে অতি অযোগ্য লোকেরও আত্মাভিমান আছে। এই রকম অভাজনের অসঙ্কোচ উপদ্রব সাহিত্যকে সহ্য কর্‌তেই হয়; চতুরাননের কাছে নালিশ ক'রেও কোনো ফল নেই। বিধি যেখানে আছে বিধাতার কাছে তা'র দরবার খাটে। এ তো বিধি নয়, এ যে উপলব্ধি। এ ক্ষেত্রে ক'রেও কোনো ফল নেই। নির্ব্বিবেক অত্যাচার ঘট্‌লে তা'র কোনো চরম প্রতিকার আছে ব'লে জানিনে,— একটি মাত্র উপায় হচ্চে, সাহিত্য অনুশীলনের সাহায্যেই সাহিত্যরুচির বিস্তার সাধন করা। এ জিনিষটা সাধুতার মতোই,— স্বাভাবিক সাধুতা যদি দুর্ব্বল হয়, তবে সাধুসঙ্গ হচ্চে পথ। কিন্তু মূলধন অল্প থাকা সত্ত্বেও এ প্রণালী যে সকলের পক্ষে খাট্‌বে তা নয়; তবু যাঁরা উপযুক্ত ভোজের আয়োজন ক'রে সাহিত্যরুচির উদ্বোধন কর্‌তে প্রবৃত্ত, তাঁরা অসাধ্যসাধনে অক্ষম হ'লেও অন্তত কবিদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বঙ্গবীণা'র পাশাপাশি চারুচন্দ্র 'মালিকা' (ঢাকা ১৯৩৪) নামে আরেকখানি কাব্যচয়নিকাও সংকলন করেছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের ৩৪টি কবিতা গৃহীত হয়।

পত্র ১০০। প্রেমোৎপল ও অমিয়ার বিবাহ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

পত্র ১০১। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ। চারুচন্দ্র উত্তরে লেখেন, 'এই আশীর্বাদ আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে...'। দ্র. এই বই পৃ ১৭১।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ প্রকাশিত।

রচনাবলী ১৫শ খণ্ড ২য় সংস্করণে (চৈত্র ১৩৪৯) কাব্যভাগের সংযোজন রূপে, অতঃপর 'পরিশেষ' ২য় সংস্করণের (বৈশাখ ১৩৫০) সংযোজন অংশে গৃহীত। 'পরিশেষে' ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হলে 'এই সংস্করণে বাইশটি কবিতা নূতন সংযোজিত হইল' বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

পত্র ১০২। 'বৈশাখ'॥ রচনা চৈত্র ১৩০৬, প্রকাশ ভারতী, বৈশাখ ১৩০৭ পৃ ১৯৬-১৯৮। 'কল্পনা' (১৩০৭) কাব্যে অন্তর্ভুক্ত।

'বৈশাখ নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতার দু-একটি স্থান একটু অস্পষ্ট হয়ে আছে'— তার ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে চারুচন্দ্র ১১ অক্টোবর ১৯৩২-এ রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন, দ্র. এই বই পৃ ১৭১-১৭২।

দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে।

এই ছায়ামূর্তি অনুচর কাহারা?

পরের এক স্ট্যাঞ্জায় আছে

সকরুণ তব মর্ম সাথে

মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-পরে।

বৈশাখের সকরুণ মর্ম ও শান্তিপাঠ কি? বৃষ্টি বর্ষণ? বৈশাখের দুঃখ কি? তার তপস্যা-লব্ধ মেঘজাল?

এই দুটি স্থানের সংশয় মোচন করলে উপকৃত হবো।

'বৈশাখ' কবিতা চারুচন্দ্রের 'রবি-রশ্মি' প্রথম খণ্ডে ১৯৩৮ পৃ ৪১৮-৪২২ আলোচিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদের 'সোনার তরী' এবং 'দ্বিজু রায়' প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি পূর্ণত চারুচন্দ্র তাঁর বিশ্লেষণে উদ্ধৃত করে দেন।

'সোনার তরী' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।। 'সোনার তরী' রচনা শিলাইদহ বোট, ফাল্গুন ১২৯৮. প্রকাশ সাধনা, আষাঢ় ১৩০০ পৃ ১২৭-১২৮। 'সোনার তরী' (১৩০০) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইংলণ্ডে সিসেস্টার কলেজ থেকে কৃষিবিদ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে এম আর এস এ ই এবং এম আর এ সি ডিপ্লোমা নিয়ে ফেরেন কিন্তু সরকারি কৃষিবিভাগে কাজ না পেয়ে ডেপুটিগিরিতে নিযুক্ত হন। কৃষি-বিদ্যাপাঠের অভিজ্ঞতা কার্যক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করতে পারেন নি।

দ্র. নবকৃষ্ণ ঘোষ : 'দ্বিজেন্দ্রলাল' ১৩২৩ পৃ ২৪, ৪৫-৪৬।

দ্বিজেন্দ্রলাল একসময় শিলাইদহে নিয়মিত অতিথি ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, Perhaps few persons know that D. L. Roy— the poet and dramatist— began his career as a trained agriculturist. In a spurt of enthusiasm the Government sent four students, to Cirencester College in England to study the science of the agriculture. D. L. Roy was one of the four. When the four scholars returned with their specialized knowledge the Government did not know what to do with them as a department for agriculture had yet to be organized. Some official high-up in the ranks had a brain-wave, and all four of them were appointed Deputy Magistrates.

দ্বিজেন্দ্রলালের দেওয়া শিলাইদহে আলুচাষের ব্যবস্থাপত্র অবশ্য অফলপ্রসূ হয়, রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'Father was careful never again to seek agricultural advice from his friend.'

'এগ্রিকালচার বিভাগীয় দ্বিজু রায়...' তাঁর কৃষিবিদ্যায় অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছিলেন 'সোনার তরী'-র ব্যাখ্যায়। অজিতকুমার চক্রবর্তী -লিখিত 'কাব্যের প্রকাশ' (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৩) প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল 'কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধ লেখেন—প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৩,

সেই প্রবন্ধে 'তাঁহার সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান' পাওয়া 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা সূত্রে লেখেন :

কবিতাটির গদ্যার্থ এই :

একজন কৃষক শ্রাবণ মাসে রাশি রাশি ধান কাটিয়া নির্ভরসা হইয়া কূলে বসিয়া আছে। পরে সে দেখিল যে এক 'যেন চিনি' মাঝি পাল তুলিয়া দিয়া নৌকা করিয়া যাইতেছে। সে তাহাকে ডাকিয়া ধানগুলি দিল। পরে নিজেও যাইতে চাহিল। মাঝি তাহাকে লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। কৃষক শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া রহিল।...

পাঠক কবিতাটির গদ্যার্থ দেখিলেন,... এখন দেখুন ইহার বর্ণনা কিরূপ স্বভাবসঙ্গত। কৃষক ধান কাটিতেছেন বর্ষা কালে, শ্রাবণ মাসে। বর্ষাকালে ধান কেহই কাটে না; বর্ষাকালে ধান্য রোপণ করে। ধান তিন প্রকার : (১) হৈমন্তিক তাহাই কৃষকের আসল ধান্য— কাটে হেমন্তকালে, অগ্রহায়ণ মাসে; (২) আশু (নিজে খাইবার জন্যই প্রায় করে) কাটে শরৎকালে, ভাদ্র মাসে; (৩) বোরো (উড়িষ্যা অঞ্চলেই অধিক হয়)

প্রকৃতির পাশ কাটিয়া গিয়াছেন। নহিলে অন্ধকারে ঢিল মারিলেও হয় ত তিনটার মধ্যে একটায় লাগিত। রবিবাবুর এক ভক্ত এক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাহা এতই মনোরম যে আমি তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন— "যদি এ আশুধান্য হয় ও এটা বত্রিশে শ্রাবণ হয়। পরের দিনই ত ভাদ্র।" তিনি ত ইহাও বলিতে পারিতেন, যে, কৃষক ত দেখা যাইতেছে পাগল, যদি ধান না পাকিতেই কাটিয়া থাকে। বলদ যদি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়ে। রবীন্দ্রবাবু যদি জানিতেন যে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দুই এক ভক্ত কি বিপদগ্রস্ত হন! যাক্।— তাহার পরে শ্রাবণ মাসে "এল বরষা" কিরূপ? বঙ্গদেশে আষাঢ় মাসেই বর্ষা আসে। তাহার পরে "একখানি ছোট ক্ষেত" হইতে "রাশি রাশি ভারা ভারা" ধান হইয়াছে! ক্ষেত বড়ই উর্বরা! ক্ষেতের "চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।" ক্ষেতখানি তবে একটি দ্বীপ। তবে

এ চর জমি। এরূপ জমিতে ধান করে না। এসব জমি শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে ডুবিয়া থাকে। শীতকালে নদীগর্ভ হইতে বাহির হয়।

শ্রাবণের ধানের টীকা করে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন :

"এরূপ হইতে পারে যে কোন স্থানে কোন বৎসরে কেহ শ্রাবণ-মাসে আশু ধান কাটিয়াছে। কিন্তু এরূপ exceptional instance উপমায় দেয় না।"

চরজমিতে বোনা জলিধানের কথা রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে দেখতে পাওয়া গেছে :

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকরভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে।...

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ও পারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে।... 'শাস্তি' সাধনা, শ্রাবণ ১৩০০

প্রদোষ।। এই চিঠি পাওয়ার পরে চারুচন্দ্র 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ ও মতকে সমর্থন করেন। মল্লিনাথ, বট্‌লিঙ্ক-রথ ও মনিয়ের উইলিয়মসের সংস্কৃত অভিধান, বরাহমিহির ও রঘুনন্দনের প্রয়োগ, বাচস্পত্য অভিধান ও বিশ্বকোষের দৃষ্টান্ত আহরণ করে চারুচন্দ্র লেখেন :

এই সকল প্রাচীন প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা দেখে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে প্রদোষ শব্দ সমস্ত রাত্রির যে-কোনো অংশ বোঝাতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তা 'নিশাবসান', 'রাত্রিপর' এবং 'অতিক্রান্তরাত্রি' অর্থে ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আর ভাষা সজীব হলে তাতে নব নব শব্দ ও পুরাতন শব্দের নব নব অর্থ সৃষ্টি হয়ে থাকে, এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর মহাশয়ের মতন ভাষা ও সাহিত্যস্রষ্টার কোনো শব্দে নূতন অর্থ সংযোজনা করবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

'প্রদোষ'। বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৯ পৃ ৮৮৫-৮৮৬

'রবিরশ্মি'॥ চারুচন্দ্র তাঁর এই ৩১ অক্টোবর ১৯৩২ এর পত্রেই প্রথম 'রবিরশ্মি' নামের 'চয়নিকা ও সঞ্চয়িতার কবিতাগুলির' একখানি বিশ্লেষণগ্রন্থ লেখার সংকল্পের কথা রবীন্দ্রনাথকে জানান। তিনি লেখেন,

'এর আগে অজিত, আবদুল ওদুদ, কুমুদনাথ দাস প্রভৃতি যাঁরা আপনার কাব্য আলোচনা করেছেন তাঁরা কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত ভাব মাত্র নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন। আমি কবিতাগুলির অন্তর্গূঢ় ভাব ছাড়া শব্দ ও বাক্যের সৌন্দর্য ও বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করবারও চেষ্টা করব।... এ সম্বন্ধে আমি আপনার অনুমতি ও আশীর্বাদ চাই। আমার বইয়ের নাম রাখব মনে করেছি রবি-রশ্মি।'... দ্র. এই বই পৃ ১৭১-১৭২।

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের স্বত্ব॥ আশ্বিন ১৩২৯-এ চিন্তামণি ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

আমার সমস্ত বাংলা বইগুলির স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্বভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লইয়াছি। এক্ষণে এই অধিকারের হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আমার গ্রন্থপ্রকাশের কোনো একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইতে পারিলে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।

এতদনুসারে '১৯২৩ সালের জুলাই মাসে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠা' হয় এবং অতঃপর তাঁরাই রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থস্বত্ব ভোগ করতে থাকেন। দ্র. বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎবর্ষ-পরিক্রমা ১৯২৩-১৯৭৩। বিশ্বভারতী ১৯৭৪ পৃ ৭-৮।

রবীন্দ্ররচনার উদ্ধৃতি-ব্যবহারের জন্য চারুচন্দ্র বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিহিত অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। 'রবিরশ্মি'র ভূমিকায় উল্লেখ আছে :

কবির মনোভাব বুঝিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বহু কবিতার বা প্রবন্ধের

অংশ উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। ইহার জন্য বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আমাকে অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত ও কৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

পত্র ১০৩॥ পূর্বানুবৃত্তি : চারুচন্দ্র 'রবিরশ্মি' বইয়ে উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের ১৫ অক্টোবর ১৯৩২এর চিঠি পেয়ে পুনরায় এই প্রসঙ্গের বিস্তার করে তিনি চিঠি লিখেছিলেন :

এই পত্র পাইয়া আমি কবিকে জানাই যে তিনি বলিতেছেন যে শ্রাবণ মাসের ছবি দেখিয়া সোনার তরী লেখা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে, চয়নিকায়, সঞ্চয়িতায় ও সোনার তরী পুস্তকে সেই কবিতার নিম্নে তাহার রচনার তারিখ দেওয়া আছে 'ফাল্গুন ১২৯৮'। এই অসঙ্গতির কি মীমাংসা?

'রবি-রশ্মি' ১৯৩৮ পৃ ২২৯-২৩০।

পত্র ১০৪॥ 'বসন্তে'র একটি গান, সে সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন ও ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় -কৃত গানটির একটি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাঠিয়েছিলেন চারুচন্দ্র। ললিতমোহন ইতোপূর্বে 'বঙ্গবীণা'র সম্পাদনা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' অনুবাদের উদ্যোগ করেছিলেন।

পত্র ১০৫॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সতীর্থ অধ্যাপকদের মধ্যে মতভেদ হলে 'এবার ফিরাও মোরে', 'সিন্ধুপারে', 'প্রবাসী', 'ভারততীর্থ' ও 'উর্বশী' এই পাঁচটি কবিতা সম্বন্ধে কবির ব্যাখ্যা প্রার্থনা করে চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে চিঠি দেন, দ্র. এই বই পৃ ১৭৫-১৭৭।

পত্র ১১০॥ 'রুদ্ধগৃহ'। বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২ পৃ ৩৩৭। গদ্যগ্রন্থাবলী ১ম ভাগরূপে প্রকাশিত 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র (প্রকাশ বৈশাখ ১৩১৪ পৃ ৩২০) অন্তর্গত।

বালকে প্রকাশিত হওয়ার পর পৌষ পৃ ৪২৭-৪৩০এ এই প্রবন্ধ নিয়ে কবিবন্ধু ও কবির এক পত্রবিনিময় প্রকাশিত হয়েছিল, রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়স্থলে পত্রচ্ছলে সেই 'উত্তর-প্রত্যুত্তর' অসংক্ষেপে

সংকলিত হয়েছে।

কবিবন্ধু লিখেছিলেন, '"রুদ্ধগৃহে"র ভাব ধরিতে পারিলাম না। একজনের মধ্যেই রুদ্ধ হইয়া থাকা, একজনকে লইয়াই চিরদিন শোক করা আপনি গর্হিত বলিয়াছেন। কিন্তু...' তাঁর মতে 'এক দিকে চাহিয়া থাকা, একের চারি দিকে ঘোরাই প্রকৃতির নিয়ম, তাহাই প্রকৃতির বন্ধনের কারণ।... পৃথিবী এক সূর্যের দিকে চাহিয়া ঘোরে বলিয়া কি তাহার কোটি গ্রহনক্ষত্রের সহিত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে? না, সেই সূত্রেই অনন্তের সহিত পৃথিবীর বন্ধন হইয়াছে? তাই পর্বত আকাশের দিকে চাহিয়া সুন্দর, তাই নদী সমুদ্রের দিকে চাহিয়া সুন্দর, রাত্রি দিনের দিকে চাহিয়া সুন্দর, মনুষ্য প্রকৃতির সন্তান, সেও যদি একদিকে চায় সেও সুন্দর হয়।'

রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে লেখেন (সোলাপুর ২৫ আশ্বিন ১৯২৯এর চিঠি) : 'আপনি "রুদ্ধ গৃহ" যেভাবে বুঝিয়াছেন আমি ঠিক সে ভাবে লিখি নাই। আপনি যাহা বলিয়াছেন সে ঠিক কথা। একের চারিদিকেই আমাদিগকে ঘুরিতে হইবে, নহিলে অনেকের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইব। কিন্তু জগতের মধ্যে আমাদের এমন 'এক' নাই যাহা আমাদের চিরদিনের অবলম্বনীয়। প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদিগকে 'এক' হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে— এক কাড়িয়া আর-এক দিতেছে। আমাদের শৈশবের 'এক' যৌবনের 'এক' নহে। যৌবনের 'এক' বার্ধক্যের 'এক' নহে, ইহজন্মের 'এক' পরজন্মের 'এক' নহে। এইরূপ শতসহস্র 'একে'র মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই মহৎ একের দিকে লইয়া যাইতেছে।...

'শূন্যতার ভয় করিবেন না, কিছুই শূন্য থাকিবে না। সমস্ত শূন্য করিয়া দেয় জগতে এমন বিরহ কোথায়! ক্ষুদ্রতর এক বৃহত্তর একের জন্য স্থান রচনা করিয়া দেয়।... যাহাকে আমরা কখনোই চিরদিন ভালোবাসিতে পারিব না তাহাকে আমরা চিরদিনের জন্য চাই— কিন্তু প্রকৃতি-মতো আমাদের এ-সকল মিছে আবদার শুনিবেন কেন... আমাদের হাত হইতে মাটির ঢেলা কাড়িয়া লন, আমরা কাঁদিয়া-কাটিয়া সারা হই;... যে শিশু গোঁ ধরিয়াই

থাকে, কিছুতেই প্রসন্ন হইতে চায় না, তাহার পক্ষে শুভ নহে; সে মায়ের কাছ হইতে মার খায়: সেই রুদ্ধ গৃহ।...

'মৃত্যুকে আমরা যেমন ভয় করি বিস্মৃতিকেও আমরা তেমনি ভয় করি। কিন্তু অনেক সময় সে ভয় অকারণ।... বিস্মৃতি আমাদের জীবনগ্রন্থের ছেদ, দাঁড়ি; মাঝে মাঝে আসিয়া উত্তরোত্তর আমাদের জীবনবিকাশের সহায়তা করে। একটি গ্রন্থের মধ্যে সহস্র দাঁড়ি আছে, তবে তো তাহাতে ভাব ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। একটি জীবনের মধ্যেও শতসহস্র বিস্মৃতি চাই, তবেই জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে। অতএব ব্যাকরণবিরুদ্ধ একটিমাত্র দীর্ঘস্মৃতি লইয়া জীবন শেষ করিলে জীবন শেষই হবে না।'

দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫। ফাল্গুন ১৩৭৩ সং পৃ ৫৬০-৫৬৪

সম্ভবত চারুচন্দ্রকে লেখা এই চিঠির দৃষ্টান্তে 'সঞ্চয়িতা'র গ্রন্থপরিচয়ে 'শা-জাহান' কবিতার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের এই 'প্রত্যুত্তরে'র অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে। দ্র. 'সঞ্চয়িতা' ১৩৭৯ সং পৃ ৮৬১-৮৬২

পত্র ১১১ ॥ চারুচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও লীলার শুভ পরিণয় ৩ মে ১৯৩৬ ২০ বৈশাখ ১৩৪৩।

পত্র ১১২ ॥ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা পুষ্পমালা - অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহের আশীর্বাদপত্রী। বিবাহ ১৫ আষাঢ় ১৩৪৩ ২৯ জুন ১৯৩৬।

পত্র ১১৩॥ কনক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা বিষয়ে কলকাতা ও ঢাকা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., সম্ভবত চাকুরির ইন্টারভিউ দিতে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পেয়ে চারুচন্দ্র ঢাকা থেকে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ তারিখে বিশ্বভারতীর আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লেখেন, দ্র. এই বই পৃ ১৮০-১৮১।

এই চিঠিতে চারুচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসন্ন অবসরের পর

---

১ 'মৃত্যুশোক' পর্যায়ের পত্রমালায় এই চিঠিখানি প্রথম পত্ররূপে মুদ্রিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০ পৃ ১৭৭-১৭৯

২ 'উত্তর-প্রত্যুত্তরে'র শ্রী অঃ স্বাক্ষরকারী কবিবন্ধু শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল এইরূপ অনুমিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও 'বিশ্বভারতী'র সেবা করে শেষ কয়টা দিন অতিবাহিত করবা'রও ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরে এসে কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। নিতে না পারলেও রবীন্দ্রনাথ চাকুরির সুবিধার্থে পরে তাঁকে এই আশংসাপত্র দিয়েছিলেন

Uttarayan.
Santiniketan. Bengal
November 24, 1938

Sriman Kanak Bandyopadhyaya has been known to me for some years past, mainly through his literary work. I was eager to have him as an adhyapaka of Bengali at Santiniketan but he could not join us as he had a more profitable offer from a Calcutta Institute. He is an M.A. in Bengali of both Dacca and Calcutta Universities and I am convinced he has the necessary equipment and interest to teach Bengali language and literature in any of our Colleges.

Rabindranath Tagore

হয়তো এটি তাঁকে ব্যবহার করতে হয় নি।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালে সিটি কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগ দেন, পরের বছর ১৯৪৮ এই স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৯৪৬তে ওই কলেজে বাংলা বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান, অতঃপর ১৯৭৫এ প্রফেসর এমেরিটাস হন। অধ্যাপক ও রবীন্দ্রসাহিত্যালোচক রূপে কনক বন্দ্যোপাধ্যায় যশস্বী হয়েছিলেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবিরশ্মি' গ্রন্থ পরবর্তী সংস্করণ কনক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন।

পত্র ১১৫।। সম্ভবত 'রবি-রশ্মি'র অসম্পন্ন পরের অংশ, 'পশ্চিমভাগে' বলে যে

দ্বিতীয়-ভাগ চারুচন্দ্রের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় তাকেও 'রবিরশ্মি' নামের অন্তর্গত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন প্রার্থনা করেছিলেন চারুচন্দ্র, চিঠি রক্ষিত হয় নি।

চিঠিতে 'রবিরশ্মি'র উৎসর্গপত্রের প্রসঙ্গও ছিল।

পত্র ১১৬॥ 'রবিরশ্মি'র দীর্ঘ উৎসর্গপত্রটির জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন প্রার্থনা করে চারুচন্দ্র চিঠি লিখেছিলেন (আগে উল্লেখ করেছি, সে চিঠি রক্ষিত হয়নি), পরে চিঠিতে, বইয়ের প্রকাশক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন কর্তৃপক্ষের নির্বন্ধে তিনি স্পষ্ট অনুমতি প্রার্থনা করেন।

পত্র ১১৭॥ 'স্বয়ং বিধাতা তাঁর সেকালের সৃষ্টিতে লজ্জিত...' ইত্যাদি।। তুলনীয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য -উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের পত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন' আশ্বিন ১৩৪৬ পৃ ।৶৹ -॥৹ 'ইতিহাসও বহু অবাস্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মানুষের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের দেহে যে একটা লম্বমান প্রত্যঙ্গ ছিল সেটাকে সর্বদা পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয় না, এ কথা মানবসন্তানমাত্রেই স্বীকার করে থাকে।'

' দ্রৌপদীর লজ্জা...' ইত্যাদি॥ দ্র. মহাভারত, সভাপর্ব ৬৬তম অধ্যায়।

'রবিরশ্মি' ও সে সম্বন্ধে কবির মন্তব্য :

'রবি-রশ্মি' : পূর্বভাগে' (কবিত্ব-উন্মেষ হইতে কল্পনা পর্যন্ত)। কলিকাতা ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব উপাধ্যায়, ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক, বিবিধ-গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. কর্ত্তৃক বিশ্লেষিত। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ রয়্যাল পৃ ১৭+ ৪৩৪।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৯-এর একখানি পত্রে চারুচন্দ্র 'রবি-রশ্মি' নামে রবীন্দ্রকাব্যের 'অন্তর্গূঢ় ভাব এবং শব্দ ও বাক্যের সৌন্দর্য ও বিশেষত্ব বিশ্লেষণে'র একখানি পুস্তক রচনার সংকল্প জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ

প্রার্থনা করেছিলেন। ২৯ পৌষ ১৩৩৯-এর পত্রে রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি কবিতার অর্থ জানতে চেয়ে তারপর লেখেন, 'বই লিখতে আরম্ভ করে দিয়েছি।' বিজয়াদশমী ১৩৪০এর পত্রে ব্রত উদ্‌যাপন করার কথা লিখে জানান, ' ''রবি-রশ্মি'' বিশ্লেষণ প্রায়ে শেষ করে এনেছি।' মনে হয় অব্যবহৃতিকালের মধ্যেই বইখানি প্রেসে গিয়েছিল। ১১ মাঘ ১৩৪৪ (২৫ জানুয়ারি ১৯৩৮)এ 'রবি-রশ্মি'র উৎসর্গপত্রের জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন প্রার্থনা করে চারুচন্দ্র চিঠি লেখেন। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮-এ 'রবি-রশ্মি'-র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় চারুচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন, 'সকলের চেষ্টা ও সাহায্য সত্ত্বেও পাঁচ বৎসর মাত্র অর্ধেক বই ছাপা হইল। বাকী অর্ধেক আমার জীবদ্দশায় হইবে কি না বিধাতাই জানেন।' অপর ভাগ প্রকাশিত হবার আগেই লেখকের মৃত্যু হয়।

'রবি-রশ্মি' লিখতে ব্যয় হয়েছে বর্ষ কাল যদিও প্রস্তুতি অনেকদিনের। চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি বারো বৎসরের নিরন্তর চেষ্টায়।'

আমি বারো বৎসর রবীন্দ্র-সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতে করিতে যখন যেখানে আমার মনের অনুকূল যে-সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাইয়াছিলাম তাহা আমার অধ্যাপনার টিপ্পনীর অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলাম, তাহাতে সকল সময়ে লেখকের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় নাই। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের রচনা হইতেও আমি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদের রচনা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া আমার লেখার পরিশ্রম লাঘব করিয়াছি। ইহার জন্য আমি তাঁহাদের নিকটেও ঋণী ও কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট ও ব্যাপক অধ্যাপনা ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আরম্ভ হয়। এই অধ্যাপনায় যাঁহারা ব্রতী ছিলেন বা আছেন সেই-সকল সহকর্ম্মীদের নিকটেও আমার অনেক ঋণ আছে, তাঁহাদের সহিত আলোচনাতেও অনেক জটিলতার মীমাংসা হইয়াছে।

সর্ব্বোপরি আমার অপরিশোধ্য ঋণ স্বয়ং কবিগুরুর কাছে। যখন

যেখানে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার গোচর করিয়াছি, এবং তিনি আমার প্রতি তাঁহার অহেতুক স্নেহাতিশয়তার অনুরোধে সংশয় মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার অনেক কবিতা ও কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও ভাব আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি; এবং আমার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে অনেক স্থানে কবির ভাষাই পরিগৃহীত হইয়াছে। কবিগুরুর কাব্য-সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের জন্য অনেক স্থানে তাঁহারই অন্য রচনার সাহায্য লইয়াছি, একটি কবিতাকে অন্য কবিতার বা প্রবন্ধের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপে আমি অনেক স্থানেই গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সম্পন্ন করিয়াছি।

চারুচন্দ্র নিজেকে 'মাল্যগ্রন্থনকারী' এবং 'মুটেমজুর' আখ্যা দিয়ে বিনয় প্রকাশ করে লিখেছিলেন, 'আমার এই নির্মিতি যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আকার ধারণ করিল, তাহারই সৌন্দর্যের জন্য ইহা রবীন্দ্রকাব্যরসিক সাহিত্যসমাজে সমাদৃত হইবে আশা করি।' তবু, হয়তো প্রবাসীতে ছাপার জন্য কবির মন্তব্য প্রার্থনা/প্রত্যাশা করেছিলেন যে মতামতে আনুকূল্য তত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মতামত পেয়ে চারুচন্দ্র পত্রপাঠ এই চিঠি লেখেন, তখন তিনি ঢাকা থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতার বাড়িতে আছেন। পত্রপ্রাপ্তি মাত্রে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে 'রবিরশ্মি' সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সংবলিত চিঠি প্রবাসীতে ছাপতে বারণ করে লেখেন, ১৬ মে ১৯৩৮ এর চিঠি : রবিরশ্মি বইটা সম্বন্ধে চারুকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে মরেছেন তাঁকে নিন্দাই করেছি। ওটা ছাপাবেন না।...

রামানন্দ এ চিঠির উত্তরে লেখেন,

20 Mullen Street.
Elgin Road. P.O.
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

ভক্তিভাজনেষু,

অনিলবাবুর চিঠির মধ্যে আপনার ২রা জ্যৈষ্ঠের চিঠি পেয়েছি। পেয়েই 'রবিরশ্মি' সম্বন্ধে চারুবাবুকে লেখা আপনার চিঠি না-ছাপতে আমার সহকারীদিগকে লিখে দিয়েছি। চারুবাবুকেও তা জানিয়ে দিলাম। তিনি যদি ছাপতে বলেন, তখন ছাপা হবে। একথাও তাঁকে লিখেছি যে. তিনি শুধু 'আমার আপত্তি নাই' বললেই ছাপব না। তিনি positive ইচ্ছা প্রকাশ করলে ছাপব।...

প্রসঙ্গত প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ কিঞ্চিদধিক দেড়-কলম 'রবিরশ্মি'র আলোচনা ইতিমধ্যেই ছাপা হয়েছিল, তাতে মুখ্যত যা লেখা হয়েছিল তা হল : চারুবাবুর গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজের সমালোচনাদক্ষতা রসগ্রাহিতার ফল পাঠকদিগকে দিয়াছেনই, অধিকন্তু অন্য অনেকের ঐরূপ শক্তিরও ফলভাগ তাঁহাদিগকে করিয়াছেন [Sic], এবং সর্বোপরি বহুস্থলে স্বয়ং কবিরই দ্বারা তাঁহার সৃষ্টির মর্মোদ্‌ঘাটন করাইয়াছেন।...

আমাদের ধারণা, ইহার দ্বারা শ্রদ্ধাবান্ তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথ সুগম হইবে, এবং যে সকল ছাত্রকে রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্য বা কবিতা পড়িতে হয়, ইহার দ্বারা তাঁহাদের রবীন্দ্রসাহিত্যানুশীলন অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

অতঃপর, চারুচন্দ্রের ইচ্ছাক্রমেই রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃ মুদ্রিত হয়।

প্রাগিতিহাসের রবীন্দ্ররচনা ॥ প্রথমবয়সের কবিতা সম্বন্ধে কুণ্ঠা রবীন্দ্রনাথ বহুবার নানাভাবেই ব্যক্ত করেছেন। পঞ্চাশ বছর বয়ঃক্রমকালেই লিখেছেন 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের 'অসংযম' ও 'আতিশয্য', 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র 'উচ্ছৃঙ্খল কবিতা' নিয়ে সংকোচের কথা। 'জীবনস্মৃতি'তে (১৩১৮) দেখি, 'প্রভাত-

সঙ্গীত'ই তাঁর প্রথম নিষ্ক্রমণ, প্রথম শস্যোদ্গম 'কড়ি ও কোমলে'। অতঃপর বিভিন্ন কাব্যসংগ্রহের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবেই আদিরচনার সম্বন্ধে তাঁর অপছন্দ প্রকাশ করেছেন।

ইন্ডিয়ান প্রেসের 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র ভূমিকা (১৩২১) :

সন্ধ্যাসঙ্গীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যাসঙ্গীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিষেরই একটা আরম্ভ তো আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়। সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে শুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'চয়নিকা' নতুন সংস্করণের ভূমিকা [?]

'কড়ি ও কোমল' হইতে আমার কবিতার পূর্বপ্রত্যন্তের আরম্ভ। তার আগের কোনো লেখাকেই আমি কাব্য বলিয়া স্বীকার করি না। কেবলমাত্র গোত্র ধরিয়া আমার কাব্যপংক্তিতে তাহাদিগকে স্থান দেওয়া ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিককে সাজে, কাব্যরসিককে কদাচ নহে।

স্বনির্বাচিত 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকা (১৩৩৮) :

সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই-আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ-দোষ।... ওই তিনটি কবিতাগ্রন্থে আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ— লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশকালে (১৩৪৬) তিনি যে আদিরচনাকে স্থায়ী করে রাখবার বিরুদ্ধতা করেছিলেন, রচনাবলী-সম্পাদক 'নিবেদন' স্থলে রবীন্দ্রনাথের সেই লেখাটি উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'এই প্রসঙ্গে তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

ভূরিপরিমাণ যে সকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলে গণ্য করি আপনাদের সম্মিলিত নির্বন্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবী কালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারব না।

তব রবীন্দ্রনাথের সকল সংগ্রহই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র লেখা নিয়ে শুরু হয়েছে। রচনাবলী সংস্করণের জন্য বিশেষ করে লেখা ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে।'

প্রসঙ্গত চারুচন্দ্র যে 'রবিরশ্মি' বইয়ের গোড়াতে দীর্ঘ স্থান জুড়ে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-পূর্ব আদি অচলিত উন্মেষ-পর্বের রচনার সবিস্তার বিশ্লেষণে ব্যয় করেছেন, রবীন্দ্রনাথের অসন্তোষের সেও বোধ করি এক কারণ।

'কবিকাহিনী পড়ে কালীপ্রসন্ন ঘোষ...' ॥ দ্র. বান্ধব, দশম সংখ্যা ১২৮৫ পৃ ৪৬৪-৪৬৭। 'জীবনস্মৃতি'র গ্রন্থপরিচয়স্থলে উদ্ধৃত, ১৩৬৩ সং পৃ ২০২-২০৩।

'ভগ্নহৃদয় পড়ে ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মাণিক্য...' ইত্যাদি॥ 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য পাঠ করে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য নবীন কবিকে যে অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন তার বিবরণ অধুনালুপ্ত 'রবি' ত্রৈমাসিকপত্রের রবীন্দ্র-সম্মিলন সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩২ পৃ ৩৩৭-৩৩৮, পৃ ৩৪৩-৩৪৫ থেকে 'জীবনস্মৃতি'র গ্রন্থপরিচয় স্থলে উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে।

পত্র ১১৮॥ এই চিঠি 'রবিরশ্মি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগের চিঠির অনুবৃত্তি, এ চিঠিরও নকল তিনি রামানন্দকে পাঠিয়েছিলেন, দ্র. পূর্বোল্লিখিত রামানন্দকে লেখা ১৬ মে ১৯৩৮এর পত্র :

আমার কৈফিয়তে চারুকে যে চিঠি লিখেছি তার নকল পাঠাই। তাঁর বইটা ক্লাস বইয়েরই মতো হয়েছে, ছাত্রাবস্থা ছাড়িয়াছে যারা এটা তাদের উপযোগী নয় অথচ সেই রকম বইয়ের দরকার আছে। অতিশয় বেশি দিতে গেলে

কম দেওয়া হয়। বোধ হয় চারু ক্লাস পড়াবার উপলক্ষ্যেই এটা লিখেছেন সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও থাকলে ভালো হোত। যদি থাকত তা হলে বইটা প্রশংসারই যোগ্য হত।

প্রসঙ্গত, 'রবিরশ্মি'কে 'ক্লাস-বইয়ের' অধিক গুরুত্ব দিয়ে সেই মুহূর্তেই চিঠি লিখেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, তাঁর মতে

It will be as invaluable to serious students of the Poet's work as the Browning Cyclopaedia. It is however a good deal more than a cyclopaedia. It gives, a short sketch of a systematic criticism, and also contains a good deal of most interesting and important personal nots.

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের লেখা ১১ মে ১৯৩৮এর পত্র।

পত্র ১১৯॥ চারুচন্দ্র তাঁর তৃতীয় পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন (দ্র. এই বই পৃ ১৮৪), তার উত্তর।

চারুচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মায়ার শুভবিবাহ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ (২৬ মে ১৯৩৮)।

'কবি রবীন্দ্রনাথ'। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ পৃ ১৮৮-১৯৯। চারুচন্দ্র এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, 'চিরযুবা কবি কর্তব্যে নিরলস, তিনি কেবল lotus-eater নন, তিনি কর্মীশ্রেষ্ঠ।'

পত্র ১২০॥ গল্পের প্লট : নানা সময়ে বহুজনকে রবীন্দ্রনাথ গল্পের প্লট যুগিয়েছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ 'দেবী' (১৩০৬) গল্পের প্লট রবীন্দ্রনাথের দেওয়া, সে গল্পের কোনো কোনো পরিবর্তনও রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে করা হয়েছিল। দ্র. রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রভাতকুমার

মুখোপাধ্যায়ের ৬ আশ্বিন ১৩০৬ ও ২০ আশ্বিন ১৩০৬ এর পত্র।[১] শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম দিকে অধ্যাপকদের কাউকে কাউকে তিনি গল্পের প্লট দিয়ে গল্পলেখাতে প্রবর্তন করেছেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে পাই : 'আপনাদের গল্পগুলি শুনা যাইবে। আমি পণ্ডিত মহাশয় ও সতীশকে গুটি কয়েক গল্পের প্লট দিয়া গল্প লিখাইয়াছি।'[২] সতীশচন্দ্রকে দেওয়া দুটি কাহিনীবীজের সূত্র আছে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা সতীশের সেই সময়কার চিঠিতে :

শুন আমি কি কি লিখেছি : রবিবাবুর অনুদিষ্ট 'আনন্দ ভিক্ষু'র কাহিনীটিকে ছন্দোবদ্ধ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রবিবাবু উহাকে ভাল বলিয়াছেন—তবে তাঁহার ইচ্ছা ওটাকে Drama করি...

তারপর Historical ballad লিখনের পরীক্ষাস্বরূপ (নিজে নিজে অবশ্য পরীক্ষা) শ্রীযুক্ত রবিবাবুর নিকট হইতে 'সংযুক্তার স্বয়ম্বর' বিষয়টি লইয়া একটি ballad লিখিয়াছি। শ্রীযুক্ত রবিবাবু উহার প্রশংসা করিয়াছেন...[৩]

'রবিবাবর অনুদিষ্ট ''আনন্দ ভিক্ষু''র কাহিনী অবলম্বনে সতীশচন্দ্র ''চণ্ডালী'' কবিতা লেখেন, দ্র. বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১০, পরে এই কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লেখেন, 'চণ্ডালিকা' নাটক।

পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প সম্বন্ধে তথ্যপঞ্জী সংকলনস্থলে রবীন্দ্রনাথের নানা জনকে দেওয়া প্লটের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে শরৎকুমারী চৌধুরাণীকে দেওয়া 'যৌতুক' গল্পের, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া 'দেবী' গল্পের এবং বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া

---

১ 'প্রভাত-রবি'। দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ পৃ ১৬৭।

২ শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ পৃ ২৭৬

৩ 'সতীশচন্দ্র রায়ের পত্রাবলী'। বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪ পৃ ১৮৭

'কোনো একটি' গল্পের প্লট উল্লেখযোগ্য।[১] শরৎকুমারীর গল্পটির সূত্রে তাঁর 'রচনাবলী'র সম্পাদকীয় বক্তব্য স্থলে লেখা হয় :

রবীন্দ্রনাথ 'যৌতুক গল্পের প্লটটি শরৎকুমারীকে দেন এবং উহা লইয়া তাঁহাকে একটি গল্প রচনা করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ-মত পাঁচ-

---

১ বনফুল উল্লেখ করেছেন, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একবার বলেছিলেন, 'তোমাকে একটা গল্পের প্লট দেবো। তুমিই ঠিক পারবে। ভেবে দেখলুম আমার পক্ষে ও গল্প লেখা অশোভন হবে। পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে গল্পের প্লটটি পাঠান। পত্রটি এই :

ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
ভাগলপুর

শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সময়টা সেকালের প্রান্তঘেঁষা। মাঠাকরুন বড়োঘরের ঘরণী— স্বামী সহকারে চলেছেন তীর্থ পরিক্রমে। শেমিজ জুতোয় লজ্জা, অশ্বযানে সংকোচ, বাল্যাবধি পাল্‌কিবাহিনী, আধুনিকপন্থায় স্বামীর তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু যে সনাতনী আচার শ্বশুরকুলের বংশানুগত আভিজাত্য আঁকড়ে ছিল তার কোন ব্যত্যয় গৃহিণী সইতে পারতেন না, যদিও পুরুষমানুষের অনাচারে ধৈর্য রক্ষা করতে অগত্যা অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তার ছেলেটি আধুনিক লোরেটোতে শিক্ষিত মেয়েকে বাছাই ক'রে বাপমায়ের অগোচরেই বিয়ে করেছিল, মেয়েটির বয়স গৌরীর কাছাকাছি যায়নি বলে দুঃসহ ক্ষোভ পরিবারে একদা আলোড়িত হয়েছিল। অল্পদিনে প্রমাণ হোলো এমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে হয় না— এমন কি যে সকল আচারে ও পূজার্চনায় তার অভ্যাস ও বিশ্বাস ছিল না তারও খুঁটিনাটি সে মেনে চলত। স্বামী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তেজনায় বৃথা চেষ্টা করেছে। একটা কথা মেয়েটি বুঝতে পারত না কেন স্বামীসহবাস থেকে সে বঞ্চিত। সে সমস্যার ইতিহাস এই, স্বামীর স্বভাবচরিত্র ভালো কিন্তু একবার পদস্খলন হয়ে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে, ভয় নেই, কিছুকাল চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ হবে। সেই আশ্বাসে শ্বশুরের একান্ত ব্যস্ততায় ও সুন্দরীর লোভে সে বিয়ে করলে কিন্তু সংক্রামক স্বল্প বিপত্তি থেকে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে চললে। রোগ উপশমের বাহ্যলক্ষণ যতই আশ্বাসজনক হোক তবু ভয় ছিল রোগটা পাছে সন্তান পরম্পরায় সংক্রামিত হয়। এদিকে স্ত্রীর বিশ্বাস এই সংযম স্বামীর অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক শুচিতার লক্ষণ। তাই জোড় মিলাবার চেষ্টায় নিজের প্রবৃত্তিও দমন করে চলত। অবশেষে হঠাৎ একটা অসংযমের উদ্দীপনার মুখে স্বামীকে অপরাধ স্বীকার করতে হোল। ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া। স্ত্রীর গৃহত্যাগ— অথচ অন্তরের মধ্যে নিরন্তর জ্বলুনি। একবার শাশুড়ির পায়ের ধুলো নেবার প্রলোভনে স্টেশনের নিকটবর্তী গাছতলায় দুর্যোগের অপরাহ্নে যা ঘটল তার আভাস পেয়েছ। ছেলেটার

সাত দিনের মধ্যেই শরৎকুমারী 'যৌতুক' গল্পটি লিখিয়া ফেলেন। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ইহা জানিতেন না; কারণ পরবর্তীকালে তিনি এই প্লটটি আবার চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন এবং তিনি 'চাঁদির জুতা' গল্পটি লেখেন। গল্পটি চারুবাবুর 'বরণডালা' নামক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।[১]

চারুচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ অনেক গল্পের প্লট দিয়েছিলেন। তার দু-একটি, যেমন 'স্রোতের ফুল', 'হেরফের' উপন্যাসের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'এর ['স্রোতের ফুল' উপন্যাসের] পরেও আমি তাঁর কাছে প্লট পেয়েছি।'

রবীন্দ্রনাথের গল্পের কাঠামো নিয়ে তিনি লেখেন 'দুই তার' উপন্যাস। 'এর পরে আমার 'হেরফের' উপন্যাসের প্লট বোলপুরে পেয়েছিলাম। আর 'ধোঁকার টাটি'র প্লট তিনি আমাকে শিলং পাহাড় থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন...'।

'স্রোতের ফুল', 'দুই তার', 'হেরফের' 'ধোঁকার টাটি' ছাড়াও 'দোরোখা' গল্প, 'নষ্টচন্দ্র' উপন্যাসের প্লট চারুচন্দ্রকে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'দুই তারে'র ভূমিকাতে চারুচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন :

এই বইয়ের প্রথম ও শেষ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার আভাস পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মুখে মুখে আমাকে বলিয়াছিলেন;

কলঙ্ক অথচ চরিত্র মাহাত্ম্যের কথা চিন্তা করে দেখো। ইতি ৮ই চৈত্র ১৩৪৫ [মার্চ ২২, ১৯৩৯] স্নেহাকৃষ্ট

বনফুল লিখেছেন, 'আমার ইচ্ছে ছিল এই প্লটটি নিয়ে আলাদা একটা বই লিখব। কিন্তু তা আর পেয়ে উঠিনি। এই প্লটের মুখ্য চরিত্রটিকে আমার 'নির্মোক' উপন্যাসে স্থান দিয়েছিলাম। 'নির্মোকে'র অমর এই প্লট থেকে সৃষ্টি।' দ্র. বনফুল : 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' ১৯৭৮

১ ভূমিকা, 'শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী' ১৩৫৭

সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমি মধ্যের ঘটনাগুলি গাঁথিয়াছি। দোল-পূর্ণিমা ১৩ই চৈত্র ১৩২৪।

'নষ্টচন্দ্রে'র ভূমিকায় উল্লেখ আছে : এই উপন্যাসের প্লটটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহের দান। লেখার সময় অনেক বদল হয়ে গেলেও এর কাঠামোটি কবিগুরুর দত্ত উপহার। রমণা, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩১২।

সম্পাদকের কথা

পত্র-বিবরণ পরের দিকে দুর্ভাগ্যবশত আংশিক বা অসম্পন্ন রয়ে গেল। বই পত্র তথ্যাদি -সূত্রে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র প্রয়াত কোরক বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান প্রেসের শ্রীরবি ঘোষ, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থাগারের শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায় ও শ্রীআশিস হাজরা এবং পাঠভবনের অধ্যাপক আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীঅনাথনাথ দাস, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের শ্রীসুবিমল লাহিড়ী ও স্বরলিপি-শাখার শ্রীসুভাষ চৌধুরী, এবং সর্বোপরি শ্রীশঙ্খ ঘোষ নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

এঁদের আমার সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাই।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়